

সংখ্যা - ১ - ৪

Cek-405225-14- P80671

14

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

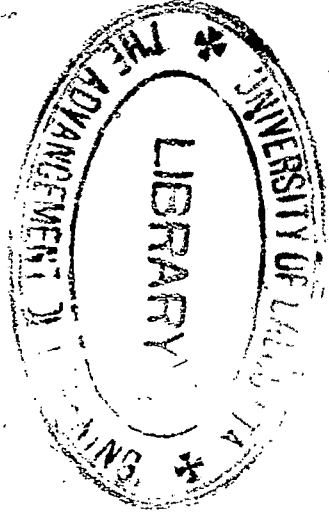
(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চদশ ভাগ

— ০ —

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

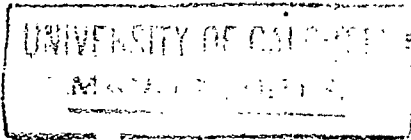


শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

২৪৩১ আপার সাকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে প্রকাশিত

১৩/৭/৬৭



কলিকাতা

২১৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট বাগমন্ডল

“বিশ্বকোষ-প্রেসে”

শ্রীরাধাচন্দ্র মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

১৩১৬

P30671

পঞ্চদশ ভাগের সূচী

14

পৃষ্ঠাঃ

পূর্বদে অস্থিবিজ্ঞা [২] (শ্রীহর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী)	...	...	৫২
পূর্বদে অস্থিবিজ্ঞা প্রবন্ধের মীমাংসা (শ্রীহরমোহন মজুমদার)	...	...	১৯৩
কথানি প্রাচীন চৌতিশা (শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)	...	...	২৩৩
কতিপয় পালরাজের শিলালিপি (শ্রীবিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ)	...	...	৮
বি গঙ্গারাম ও মহারাত্রিপুরাণ (শ্রীকেশবদাস মজুমদার)	...	...	২৪৮
৫ ও রাজবংশীর জাতিতত্ত্ব (এন্স্ বসু)	...	...	২১৮
৫ ও রাজবংশী শব্দসংগ্রহ	...	...	২২৪
৫বিহারের হৈয়ালী (শ্রী প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)	...	...	১৭১
৫বিহারের পরিভাষা (শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এন্স্ এ)	...	...	১২৯
৫বংশীর (শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী)	...	...	১০২
৫বংশীর প্রণেতা মানিকগঙ্গুলী (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এন্স্ এ)	...	...	৪৭
৫বিহার-উন্-নিকাং (শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী)	...	...	২০৬
৫বিহার ও বাঙ্গালা (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এন্স্)	...	...	১
৫বিহার প্রাচীন পদাবলীর পাঠভেদ (শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এন্স্ এ)	...	...	১৭৭
৫বিহার নামতীর গান (শ্রীবিমেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এন্স্)	...	...	৬৫
৫বিহার নামভেদ (শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ এন্স্ এ)	...	...	২৫৪
৫বিহারের গ্রাম্য শব্দ (শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য)	...	...	১০৭
৫বিহারের দুইটি প্রাচীন রাজবংশ (শ্রীশিবচন্দ্র শীল)	...	...	৯৯
৫বিহার উপসর্গ (শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী)	...	...	১৬৫
৫বিহার নাম রহস্য (শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী)	...	...	৪১
৫বিহার উপত্যকার প্রাচীন কবি (শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ)	...	...	২৪৪
৫বিহারচাৰ্য্য (শ্রীঅমল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ)	...	...	১৩৪
৫বিহারগ্রাম (শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ)	...	...	১৫
৫বিহার নাগরী (শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ এন্স্ এ)	...	...	২৩৫
৫বিহারিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র (শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এন্স্ এ)	...	...	২০৪
৫বিহার-ভাষা [অতিরিক্ত সংখ্যা] (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়)	...	...	১-৩৪
৫বিহারবিবরণী	...	...	১-১০৬



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পালি ও বাঙ্গালা

যে মাগধী প্রাকৃতের ক্রমবিকাশ, অপভ্রংশ, পরিবর্তন এবং পরিবর্তনে বঙ্গভাষায় উৎপত্তি, তাহার প্রাচীনতমরূপ ত্রিপিটকে দেখিতে পাই। সেই প্রাচীন প্রাকৃত বা পালির প্রকৃতি যথেষ্ট আলোচিত না হইলে, বঙ্গভাষায় উৎপত্তির ইতিহাস ধরিতে পারা যাইবে না। প্রাচীন পালির কথা দূরে থাকুক, ৫ম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত, সেতুবন্ধ প্রভৃতি কাব্যে সম্পূর্ণ অবলম্বিত, প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধেও আশ্চর্য্য রকমের ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশের অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঐ ভাষাকে পৈশাচী ভাষা বলেন। জানেন না, যে উহাই আমাদের পিতৃপুরুষদিগের নিত্য ব্যবহৃত ভাষা ছিল; পিতৃপুরুষদিগের প্রেত-ক্রিয়া (পরলোক-গমন উপলক্ষ্যের ক্রিয়া) হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রেত বা পিশাচ নহেন। কোন একজন বাঙ্গালী লেখক ঐ ভাষা সম্বন্ধে এই প্রকার অদ্ভুত মন্তব্য লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধেরা আমাদের দেশের সকল প্রকার সর্বনাশ করিয়া ভাষাকেও ঐরূপ বিকৃত করিয়া দিয়াছিল; কেন না বৌদ্ধদের পাপ-জিহ্বায় সাধু উচ্চারণ হইত না। পাঠকেরা এ কথায় আশ্চর্য্য হইবেন না; লেখকটির দৃষ্টান্ত ঠিক এই:—“পাপে জড়জিহ্বা, রাম বলিতে না পারে।” আশা করি, এই দেশবাসী অজ্ঞতা অধিক দিন থাকিবে না।

ভূতস্ববিদের গণনায় বঙ্গদেশের বয়স যতই হটক, আর্য্য-সভ্যতা-প্রসারের গণনায়, বঙ্গদেশ বড় প্রাচীন নহে; তথাপি যে কারণে প্রাচীন মাগধী ভাষা পরিবর্তিত হইয়া বঙ্গভাষা হইয়াছে, তাহা বঙ্গদেশের আর্য্যসভ্যতার উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা না করিলে স্পষ্ট হইবে না। হুংখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত উহার কোন আলোচনা হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় উৎপত্তি ধরিতে যে ঐ আলোচনার বিশেষ আবশ্যক তাহা বলিতে হইবে না। কিন্তু উহার পূর্বে, উপাদানগুলি সংগ্রহের প্রয়োজন।

এ কালের সাহিত্যের ভাষা এবং কথোপকথনের ভাষায় যে প্রভেদ, সংস্কৃত এবং পালিতে সেই প্রভেদ ছিল। সংস্কৃত অপেক্ষা পালিভাষা বৈদিক ভাষার বেশী নিকটবর্তী ছিল; এবং সংস্কৃত হইল, সেই দেশপ্রচলিত পালি বা প্রাকৃতের ঘা-মাজা-সাহিত্যিক সংস্করণ। পালিভাষা বৈদিক ভাষার মতই প্রত্যয়-বহুল বা inflectional ছিল; কিন্তু বঙ্গভাষায় (অন্তান্ত

প্রাদেশিক ভাষার মত) শব্দসংযোগপ্রণালী (agglutination) বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে যখন আর্য্যাসভ্যতা বিস্তৃত হয়, তখন দ্রাবিড় জাতি ও মঙ্গোলিয় জাতিতে দেশ পরিপূর্ণ ছিল। তাই বলিয়া যে দ্রাবিড় ভাষার শব্দসংযোগ রীতি হইতেই নূতন পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। অনেক ভাষাই যে কালবশে প্রত্যয় পরিহার করিয়া শব্দসংযোগে বর্দ্ধিত হয়, ডুএসিঙ্ক কীনের (A. H. Kean's Ethnology) জাতিতত্ত্ব গ্রন্থে তাহার অনেক উদাহরণ আছে। যে সকল অবস্থায় বঙ্গভাষার বিকাশ, তাহার সমালোচনা ভিন্ন যথার্থ তথ্য নির্দিষ্ট হইতে পারে না।

এ সকল তথ্য জানিবার পূর্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অনুসন্ধানের প্রয়োজন। বঙ্গভাষায় যত 'দেশী' কথা আছে, যথাসাধ্য তাহার মূল আবিষ্কার করিতে পারিলে, এ ভাষার উপর অতীত জাতির ভাষার কতটুকু প্রভাব ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। এই একটি ক্ষুদ্র কার্যের উদ্যোগেই যে অনেক পরিশ্রম করিবার আছে। ভবিষ্যৎ গণিতেরা তথ্য আবিষ্কার করিবেন; এ যুগে পথ পরিষ্কারের উদ্যোগ হউক এবং উপকরণ সংগ্রহ চলুক।

প্রাচীন মাগধী প্রাকৃততেও এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলির আমদানি প্রতিবেশী আর্য্যোক্তর ভাষা হইতে। সংস্কৃত রচনায় দেশী শব্দ প্রয়োগ করিলে পাতক হয় বলিয়া ১৪০ খৃষ্টপূর্বের মহাভাষ্যে উল্লেখ আছে। এই বিধি হইতেই মহাভাষ্যের সময়ের পূর্বের সংস্কৃতেও বিধি-বিরোধ ছিল, এইরূপ স্থচিত হয়। “কঃ যুং তীর্ণাঃ?”, “কঃ যুং কৃতবন্তঃ?”, “ক যুং পকবন্তঃ?” প্রভৃতির তীর্ণা, কৃতবন্ত, এবং পকবন্তের স্থলে, যে প্রাকৃত ভাষায় ‘তেরে’, ‘চক্র’, এবং ‘গেচে’ প্রভৃতি অপভ্রংশ ব্যবহৃত হইত, সে প্রাকৃতির কোন নিদর্শন পাই না; কিন্তু বুঝিতে পারি, যে অশোকের সময়ের প্রাকৃত ঐ সময়ে যথেষ্ট পরিবর্তিত হইয়াছিল। অপ-প্রয়োগের দৃষ্টান্তে অনেক প্রাদেশিক অপপ্রয়োগও প্রদর্শিত আছে; যথা—কাম্বোজ এবং সুরাষ্ট্রে ‘রংহতি’র স্থলে ‘হম্মতি’ ব্যবহৃত হইত। আমরা যেমন সাহিত্যের মার্জিত ভাষার প্রভাবে বঙ্গের বিভিন্ন উপ-প্রদেশের অপপ্রয়োগ তিরোহিত করিয়া ভাষার একতা সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছি, সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারাও ঐ কার্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। এ কালের ইংরেজি সাহিত্যের ভাষা, অনেক প্রাদেশিকতা নষ্ট করিয়া, ভাষার গৌরব বাড়াইয়াছে।

সুবিধা অনুসারে ভাষায় যে প্রকারে শব্দসংকোচ করিবার প্রবৃত্তি আছে, তাহা মহাভাষ্যকার দোষযুক্ত মনে করেন নাই। স্তম্ভদ্বার স্থলে ভদ্রা, দেবদত্তের স্থলে দত্ত, স্তপ্রয়োগ না হইলেও অব্যবহার্য্য বলা হয় নাই। প্রাদেশিক উচ্চারণের ফলে যে বর্ণব্যত্যয় ঘটে, তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাতাসাকে বাসাতা বলিলে, আমরাত তাহা সাহিত্যে গ্রহণ করি না। কিন্তু যে সকল বর্ণব্যত্যয় হইতে শব্দের স্বাতন্ত্র্য এবং অর্থব্যত্যয় ঘটিয়াছিল, মহাভাষ্যকার তাহা গ্রহণীয় বলিয়াছেন; যথা—কৃত হইতে তর্ক, হিংসা হইতে সিংহ, ইত্যাদি।

কেবল প্রাদেশিকতা নহে, আলম্ভ প্রভৃতি কারণেও শব্দ-সংকোচ এবং উচ্চারণ-পার্থক্য জন্মিয়া থাকে। উচ্চারণের প্রকৃতি বিচার করিলে যে বাঙ্গালায় উচ্চারণ, পালির উচ্চারণের অনুরূপ, তাহা সহজেই দেখিতে পাই। 'পূর্বে যে সকল অপভ্রংশ ও অপপ্রয়োগের কথা বলিয়াছি, পালি এবং বাঙ্গালা শব্দের তুলনা করিয়া তাহা ধরিতে পারিলে, মাগধী ও বঙ্গভাষায় নৈকট্য বেশি অনুভূত হইবে।

ভূমিকা যথেষ্ট হইয়াছে; এখন শব্দের তালিকার পাঠকেরা ঐ নৈকট্য দেখিতে পাইবেন। পালিতে যে সকল দেশী শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা কোন্ জাতির 'দেশী', ঠিক বলা কঠিন। তবে কোন কোনস্থলে সে বিষয়ে আমার বাহা অনুমান এবং প্রমাণ, তাহা তালিকার পার্শ্বেই মন্তব্য দিয়া লিখিব। আপাততঃ পঞ্চাশটি শব্দের তালিকা উপস্থিত করিতেছি। যে সকল দ্রাবিড় শব্দ আমরা ব্যবহার করি, এবং যে সকল দেশী শব্দ উড়িয়া এবং বাঙ্গালায় তুল্যরূপে ব্যবহৃত, তাহার তালিকা পরে দিব।

শব্দের তালিকা।

- (১) অঙ্গাপ-সঙ্গাপ—আলাপ-সালাপ, কথাবার্তা। জোড়া শব্দের এই প্রকারের ব্যবহার ঠিক বাঙ্গালার রীতি-সিদ্ধ (idiomatic) প্রয়োগের মত। পালির রীতি-সিদ্ধের সহিত যে বাঙ্গালার রীতিসিদ্ধের যথেষ্ট মিলন আছে, তাহা পরে দেখাইব।
- (২) অটুটি—ফলের আঁটি; অথ কোন প্রাদেশিক প্রাকৃতে অট্টি কিম্বা অস্থি-শব্দ-জ অট্টি, বা উহার কোন অপভ্রংশ ফলের আঁটি অর্থে ব্যবহৃত নাই।
- (৩) অপিচ ও অথচ—সংস্কৃতে উহাদের অর্থ—এবং, আরো। কিন্তু পালিতে উহার অর্থ Nevertheless। কেবল বাঙ্গালা ভাষায়ই অথচ শব্দ ঐ Nevertheless অর্থে ব্যবহৃত।
- (৪) আম—এই শব্দটি সম্পূর্ণ দেশী; পালিতে উহার অর্থ—“হাঁ” yes। তামিল ভাষায় ঠিক “আম”, আমাদের “হাঁ” অর্থে ব্যবহৃত। এই দেশী ‘আম’, উচ্চারণের ফলে “হাঁ” হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। (তামিলে “আ” খুব দীর্ঘ উচ্চারিত এবং “ন” প্রায় “না” উচ্চারিত)।
- (৫) অ+ফাস্ক—বাঙ্গালার ‘অস্থখ’ করা বলিলে যাহা বুঝি, সেই অর্থ। ‘ফাস্ক’ সংস্কৃত নহে; স্তূথের অভাব অর্থে অস্থখ (অস্থস্থতা), যেন মনে লাগে না। স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য অর্থে, ‘স্বথ-অস্থথ’, সংস্কৃত কিম্বা কোন প্রাদেশিক ভাষায় নাই।
- (৬) আ—এই উপসর্গটির যোগে পালি ভাষায় অনেকস্থলে কেবল শব্দ বিদ্ধ হয়—যণা, ‘ফলা-ফলম’, ‘মগ্গা-মগ্গ’, ইত্যাদি। এখানে ফল ও অফল, মার্গ ও অমার্গ একরূপ অর্থ নহে; নানা ফল, নানা পথ, প্রায় এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত। আমাদের রীতি-সিদ্ধিতে ভেদাভেদ, মতামত প্রভৃতি উহার অনুরূপ অনেক কথা আছে। আমাদের

রীতি-সিদ্ধির অনেক দ্বিগুণিত পদের সৃষ্টিতে ঐরূপ “আ” যোগ হয়,—যথা—চটাপট্, টপাটপ্, ইত্যাদি।

- (৭) ইঙ্ য—‘এসো’ এই ভাবপ্রকাশক অব্যয় শব্দ। এই দেশী শব্দটি সম্ভবতঃ দ্রবিড়ের। ‘এসো’ বলিয়া ডাকিলেই এখানে ‘এসো’ সূচিত হয়; ঠিক ঐ অর্থেই দ্রবিড়ে প্রয়োগ যথা—তামিল ইঙ্-কে, মার্বাট্টা ইকড়ে এবং তেলেগু অপভ্রংশে ইক্কড়া (দ্রাবিড়ের ‘দেশী’ পালিতে ছিল, এ দৃষ্টান্ত দ্বারা পরে অনেক কথার বিচারের প্রয়োজন হইবে)
- (৮) উগ্ হ—সংস্কৃত উগ্ ; পালির উগ্ হন অর্থ উগ্ করা। কেবল, বঙ্গভাষাতেই উগ্ ক্রিয়ার স্থানের নাম উনন্, চুল্লীর অপভ্রংশই অত্র ব্যবহৃত। আমাদের উগ্ ন্ অর্থে পালিতে উদ্ ধন শব্দ পাই।
- (৯) উপাহন—জুতা; সংস্কৃত উপানহ শব্দের বর্ণব্যাত্যয়ের একটি দৃষ্টান্ত। উড়িয়ার ‘পনাই’ অর্থ জুতা; প্রাচীন বাঙ্গালায় ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া শুনিয়াছি।
- (১০) ওঠ্ ঠ্—বর্ণ-ব্যত্যয়ে বাঙ্গালায় ঠোট্। উপর কিম্বা নীচের ঠোট্ বুঝাইতে হইলে সংস্কৃতের মত পালিতেও উত্তরোট্ এবং অধরোট্ ব্যবহৃত হইত। হালের সংস্কৃতের শুধুই অধর প্রাচীনে নাই। বাঙ্গালার ঠোট্ বলিতে দুটাই বুঝি।
- (১১) ওর..... এই দিকে } ‘ওর’ শব্দ কেবল বাঙ্গালাই পাই; যথা—(প্রাচীন
ওর পার..... উভয় কূলে } প্রয়োগে) ওর নাই=কুল নাই।
- (১২) কক্কার—কাশি-তোলা; ‘থক্’ করে কাশি তোলা, এবং গলার থেকর দেওয়া চলিত আছে। উড়িয়ায় ঠিক ‘থকার’ কথাই আছে।
- (১৩) কুংথ—কুত্র,—কোথায়। বর্দ্ধমানের পশ্চিমভাগে এখনো ঠিক কুংথ প্রচলিত আছে।
- (১৪) কবল—সংস্কৃতও তাই। অর্থ, গ্রাস। কিন্তু উহার অপভ্রংশে বাঙ্গালাই কেবল ‘খাবোল’ আছে।
- (১৫) কসট—সংস্কৃত ‘সকট’ শব্দের বর্ণ-ব্যত্যয়। সংস্কৃত সকট অর্থ মন্দ, কুৎসিৎ; পালি কসট অর্থ মন্দ স্বাদযুক্ত। বাঙ্গালার ‘কসাটে’ ঐ স্বাদের অর্থে। এখানে বলিয়া রাখি যে প্রাচীন সংস্কৃত প্রয়োগে ‘কষায়’ আশ্বাদ বিশেষ অর্থে পাওয়া যায় না। সেই জন্য পালিভাষাবিৎ এণ্ডার্সেন বলেন, যে ‘কষায়’ শব্দটি পরে পালি হইতে সংস্কৃত করিয়া গওয়া। - উহার অনেক দৃষ্টান্ত পরে দেখাইতে পারিব। কাজেই পণ্ডিতের কথা গ্রহণ করিতে পারি। পালি আবুধ (অজ্ঞ) হইতে আধুনিক সংস্কৃতের আয়ুধ, এবং উহা যে বোধ বা বুধ হইতে নহে, তাহাও প্রাচীন ও আধুনিক শব্দ প্রয়োগ হইতে ধরা যায়। আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি;—সংস্কৃত ‘প্রহত’ হইতে পালি পাহট শব্দ; আবার ‘পাহট’ শব্দের বর্ণ-ব্যত্যয়ে ‘পটহ’ শব্দ (ঢাক অর্থে) হইয়াছে। সংস্কৃতের অতি প্রাচীন প্রয়োগে পটহ অজ্ঞাত এবং উহার জন্য কোন ধাতুও পাওয়া যায় না।

(১৬) যত ও যত—আমাদের দেশের জমিদারী সেরেস্তায়, এখনো বেশী গুরু করিয়া লিখিলে ‘যত’ ই লেখে। আমরাই একালে পালি ফেলিয়া সংস্কৃত ধরিয়াছি।

(১৭) চুল্ল—সম্পূর্ণ দেশী,—অর্থ, ছোট। দৃষ্টান্ত—চুল্লবগ্গ, চুল্ল-তাত ইত্যাদি চুল্লতাত অর্থ খুড়া, কাকা; এই চুল্লকেই পরবর্তী সময়ের সংস্কৃতে খুল্ল করিয়া লইয়াছি—সংস্কৃত ধাতুতে উহার মূল নাই। খুল্ল হইতে প্রাদেশিক ‘খুড়া’ কথারও উৎপত্তি; তাত শব্দ উহা করিয়াই ঐ অর্থ চলিয়া গিয়াছে।

(১৮) চাঙ্গোট—বাক্স অথবা ডালা; আমাদের চাঙ্গাড়ি। উড়িয়াতেও চাঙ্গাড়ি আছে।

(১৯) চাটি—প্রাচীণ; উড়িয়ায় ঠিক ঐ অর্থে ব্যবহার আছে। বাঙ্গালায় “চাটি বাটি তুলে চলে গেছে” প্রভৃতি বাক্যে উহার প্রাচীন অস্তিত্বের নিদর্শন পাই।

(২০) ছবি (অস্তাস্থ ব)—উচ্চারণ ছ-ই বা ছোই; উড়িয়াতে ‘ছোই’ ঠিক পালির ‘চর্ম-রোগ’। বাঙ্গালায় ‘ছলি’ ব্যবহৃত আছে।

(২১) জাণ্ড—জাউ; নরম ভাত।

(২২) জহ—পরিত্যক্ত বা অতিরিক্ত জিনিষ বা উদ্ধৃত অংশ। উড়িয়ায় ‘বেশি’ অর্থে ব্যবহৃত—প্রাচীন বাঙ্গালায়ও তাই।

(২৩) দহ—হ্রদ, পুকুর; এই শব্দটির প্রতি একটু লক্ষ্য করা উচিত। সংস্কৃতে হ্রদ, বর্ণ-ব্যত্যয় বা metathesis এ দ্রহ হইয়াছিল; ঐ ‘দ্রহ’ও সংস্কৃত হ্রদ অর্থে পাওয়া যায়। উড়িয়ার দ্রহ (দর-হ) শব্দে নদীতে যেখানে অনেক জল স্থির হইয়া থাকে, তাহাকে বলে। “দহ” অপভ্রংশ ঐ দরহ হইতে। বাঙ্গালায় ‘দহ’ বা ‘দ’ ব্যবহৃত আছে। (পালি শব্দ প্রধানতঃ বাঙ্গালা শব্দে এবং তার নীচে উড়িয়ার বেশি ব্যবহৃত; উভয় ভাষাই প্রাচীন মাগধী হইতে প্রথমতঃ একইস্থলে পরিবর্তিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল।)

(২৪) দি—সংস্কৃত “বি”। উচ্চারণের এই প্রকৃতি বাঙ্গালায়ই কেবল বজায় আছে। ধর্ম-স্থলে ধর্ম দীপস্থলে দিপ, ও এইরূপ।

(২৫) ছম—সংস্কৃত ক্ষম; গাছের ডগা অর্থেও ব্যবহৃত আছে। পূর্ববঙ্গে কাঠের ছোট ছোট টুকরা, অথবা আখের এক এক থানা পাব কাটা হইলে, “ডুমো” বলে।

(২৬) ধী বা ধি বা ধিতা—দ্রুতি; ধ স্থানে বা হওয়ায় অনেক দৃষ্টান্ত আছে—“ধি” হইতে আমাদের ‘বি’।

(২৭) নলাট—ললাট; ন স্থলে ল, ও ল স্থলে ন, বাঙ্গালার সাধারণ ব্যবহারে খুব বেশি।

(২৮) নাহা—মান; অনেক প্রাকৃতেই আছে; (পরবর্তী নাহাপিত দেখ)।

(২৯) নেলা—নির্দোষ; এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ দীঘনিকায়ের টীকায় লিখিয়াছেন,—এলং বৃচ্চতি দোমো; ন অস্মা এলং তি নেলা। নির্দোষ হইলে ভাল মানুষ হয়; ভাল মানুষ অর্থ চিরকালই আহাম্মক; এই শেষ অর্থে সম্বলপুরের উড়িয়ায় ব্যবহার আছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় আছে বলিয়া শুনিয়াছি; পড়ি নাই।

- (৩০) পোরী—সাধু; বুদ্ধঘোষ বলেন,—গুণ পরিপূর্ণতায় পুরে ভবা তি পোরী। এ কালে সাধু পৌঁসাইদের মধ্যে গিরি, পুরী প্রভৃতি উপাধি দেখিতে পাই।
- (৩১) পাচন-যত্রি=ঠিক “পাঁচন-বাড়ি”। এই কথাটি কেবল বাঙ্গালা এবং উড়িয়াতেই আছে।
- (৩২) নিবেশন—সংস্কৃত নি+বেশ্য হইতে। অশিক্ষিত লোকেরা প্রাচীন পালি ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া এখনো “মহাশয়ের নিবেশ?” জিজ্ঞাসা করে। আমরা উহার মূল না পাইয়া অশুদ্ধ ভাবিয়াছি; এবং উহার পরিবর্তে, ‘বাস’ অবলম্বনে ‘নিবাস’ বলি। বেশ্য অর্থ যখন ঘর, তখন ‘নিবেশ’ই আদি।
- (৩৩) পটহ—প্রহত অর্থেই আছে; উহার বর্ণব্যত্যয়ে পরবর্তী সংস্কৃতে পটহ হইয়াছে। পটহ শব্দ, কিসা ঢাক বুঝায় এরূপ কোন ঐ রূপ উচ্চারণের শব্দ, পালিতে পাই নাই।
- (৩৪) মহল্লিক—এই দেশী শব্দের অর্থ বৃদ্ধ; বৃদ্ধ হইতে ‘জ্ঞানবৃদ্ধি’ হওয়া খুব সহজ। উড়িয়ায় প্রাচীনকালে বৃদ্ধ কিসা জ্ঞানবৃদ্ধ একদল লোক লইয়া রাজার মন্ত্রিসভা হইত। তাহাদের উপাধি ছিল মহল্লিক। এখনো ওড়িয়ায় তাহাদের উপাধি বঙ্গদেশের উপাধির মত, মল্লিক। কথাটার সঙ্গে ‘বিদেশের মালিকের’ কোন সম্বন্ধ নাই। আটজন মহল্লিকশাসিত দেশের নাম এখনো ‘আটমল্লিক’ পাই। আটমল্লিকপ্রথা অনেক স্থলে ছিল।
- (৩৫) লঞ্চে—উৎকোচ (উক্কোটনম্); উড়িয়ায় এখনো ঘুষ দেওয়াকে লান্চে দেওয়া বলে। বাঙ্গালায় ব্যবহার আছে কিনা সন্দান করিলে হয়।
- (৩৬) নহাপিত—নাপিত। এ শব্দটির প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য করিতে বলি। নহা অর্থ নাওয়া; নাপিতেরা প্রাচীন কালে স্নান করাইয়া দিত। এখনও বিবাহাদি অমুঠানে নাপিতকে ঐ শ্রেণীর অনেক কাজ করিতে হয়। কাজেই ‘নহা’ হইতে নাপিত শব্দেরই উৎপত্তি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। সংস্কৃত স্নান হইতে কদাপি নাপিত হইতে পারে না। সংস্কৃত স্নান হইতে প্রাকৃতের নাহা; বাহার নহা হইতে উৎপন্ন নহাপিত হইতে নাপিত। সংস্কৃত নাপিত, পালির নহাপিতের একটা সংস্করণ মাত্র। আর একটা কথা আছে; নহাপিত অর্থে প্রাচীন পালিতে ‘বিজাতক’ বা অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাতকেও বলিত। সে অর্থ এখন সংস্কৃতে পাই না। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে নিশ্চয়ই পালির ঐ অর্থ প্রচলিত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত যে নাপিতানীর-গর্ভজাত, তাহা হয়ত নয়; সে কালের নহাপিত কথায় ঐতিহ্যে হয়ত একটা গল্প রচনা হইয়াছে।
- (৩৭) পলিপথ—কর্দমযুক্ত পথ ও কাদা। বাঙ্গালা ছাড়া “পলি” শব্দে কাদা (নদীর জলের কাদায় Sediment বা খিতান অংশ) অল্প কোথাও ব্যবহার নাই।
- (৩৮) পেকখুণ বা পেকখুন;—ময়ূরের পালক। বাঙ্গালায় ‘পেকম’ কথাটার ইচ্ছা হইতেই উৎপত্তি।

- (৩৯) রন্ত এবং রন্তি—রাতি । কিন্তু কোন কোন রীতিসিদ্ধিতে ‘সময়’ অর্থ পাওয়া যায়, যথা—ধনিয়-সুত্তে—“দীঘরন্তং” এখানে দীর্ঘরাতি অর্থ নহে—‘অনেককাল’ এই অর্থ । ঐ সুত্তে যে ‘একরন্তি’ আছে, তাহার ও অর্থ খুব সম্ভব অল্পকাল, কেন না ঐ সুত্তে ক্রমাগত কথায় Contrast চলিয়াছে । তাহা হইলে, বাঙ্গালায় “একরন্তি” অল্প এক টুকু, ইহা হইতে উৎপন্ন মনে হয় । রন্তি (পরিমাণ বিশেষ) হইতে রন্তি হইবে মনে হয় না, কারণ সরল উচ্চারণ হইতে কঠিন উচ্চারণ করা, ভাষায় পাওয়া যায় না ।
- (৪০) লংকার—Anchor বা নোঙ্গর । সংস্কৃতে নাই, কিন্তু পালিতে নৌ-ব্যবসায়ী কথায় আছে । প্রায় সর্ব দেশেই ব্যবহৃত হইলেও প্রয়োজন বিশেষের জন্য এই তালিকায় রাখিলাম ।
- (৪১) কেবট্ট (অন্ত্যস্থ ব)—ইচ্ছাপূর্বক ‘ক’ এর ঘরে না দিয়া এই স্থানে দিলাম । উচ্চারণ কেওট্ট বা কেওট । এ কালের কৈবর্ত্ত কথা উহারি সংস্কৃত রূপ । ওড়িশায় কেওট্ট বলে ; বাঙ্গালাতেও হয়ত তাই বলিত, কিন্তু এখন “কৈবর্ত্ত” আবিষ্কারের পর হয়ত গালাগালি হয় । ‘কেবট্ট সুত্তে’ সমুদ্রযাত্রা, এবং গোষাপাখী নির্দেশে অকুল সাগরে কুল-নির্গয়ের কথা আছে । ‘নৌ’ ব্যবহারের কেবট্টরই চালক ছিল ।
- (৪২) বণ্ট—সং, বৃত্ত ; বোটা ।
- (৪৩) বিচিকিচ্ছা—সন্দেহ ; গোল্‌মেলে । গোল্‌মেলে অর্থ হইতে বাঙ্গালায় বিজিকিচ্ছি হইয়াছে মনে হয় ।
- (৪৪) সিক্‌খাপন—সংস্কৃত শিক্ষাকে ক্রিয়ায় নিজস্ত করিলে সিক্‌খাপতি হয় । সিক্‌খাপন বা শিক্ষাপনে যে “পন” টুকু পাই, উহার প্রয়োগ বাঙ্গালায় আছে ।
- (৪৫) সিকতা-শক্করা—নদীসৈকতের কঁাকয় । শক্করা অর্থ চিনি নয়,—মিশ্রির ডেলা । কাজেই মিশ্রির ডেলার মত উপলের নাম সিকতা-শক্করা । শাক্কর শব্দের Contrast এই কর্কর বা কঁাকরের উৎপত্তি মনে হয় । তাহা হইলে কক্কর আগে, কর্কর নহে ।
- (৪৬) হেট্টা নীচে, অবনত ; এই শব্দ ‘অধস্তাৎ’ হইতে কল্পনা করা একটু শক্ত । কিন্তু আমাদের “হেট্ট” কথাটা এই পালি শব্দ হইতে উৎপন্ন ।
- (৪৭) হোতি—ভবতি হইতে ‘মূল “হইতে” শেষ পর্য্যন্ত’, প্রভৃতি স্থলের “হইতে”, এই ‘হোতি’ কথার নানা অর্থের মধ্যে “ওঠা” অর্থ থেকে উৎপন্ন মনে হয় । ততঃ কিসা অতঃ শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া কঠিন ।
- (৪৮) অঘ ; কিস্ (কি ?) ; কচবর (কচরা—আবর্জনা) ; কঠল (খড়ম), মুণ্ড (ছোটপুকুর, কননমুণ্ড, উড়িয়ামুণ্ড) ; কুণ্ডী (পাত্র), তুণ্‌হি (চুপ করা, তুষী), প্রভৃতি পালিশব্দ উড়িয়ায় দেখিতে পাই । প্রাচীন বাঙ্গালায় আছে কিনা, কেহ অনুসন্ধান করিলে, অল্পগৃহীত হইব ।

- (৪৯) স্মৃশান—স্মৃশান ; এইরূপ ব, ম প্রভৃতি ফলা ত্যাগ করিয়া লওয়া বন্ধেরই বিশেষণ।
 (৫০) হরণী—জল প্রায় শুকাইয়া গেলে নদীর বালির ভিতর দিয়া যে পথে জল যায় ও নৌকা যাইতে পারে, সেই পথের নাম। সম্বলপুরে এই অর্থে “ইরণী” শব্দ ব্যবহার আছে ; গুনিয়াছি বাঁকুড়ার পশ্চিমে ও পুরুলিয়ায় ঐ ব্যবহার আছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কতিপয় পালরাজের শিলালিপি

কলিকাতার যাহ্নবরে নিম্নলিখিত পালরাজাদিগের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।
 হুই একটি ব্যতীত এগুলি প্রায় সমস্তই এক একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনকার সে পাঠোদ্ধারে অনেক গলদ থাকায় গত এপ্রেল ও মে মাসে শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্তী এম এ, সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ ও আমি এই তিনজনে একত্র ইহাদের পুনর্বার পাঠোদ্ধার করি। আমাদের কৃত এই সকল শিলালিপির পাঠোদ্ধার নীলমণি বাবু এই বৎসরের এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জার্নালে বাহির করিয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্ত সেই সমস্ত পাঠোদ্ধার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

১। ধর্মপালের শিলালিপি রাজ্যাক্ষ ২৬।

- (১) ওঁ চম্পশায়তনে রম্যে উজ্জলস্ত্র শিলাভিদঃ ॥ কে-
- (২) শবাথোন পুত্রেন মহাদেবশ্চতুমুখঃ ॥ শ্রেষ্ঠানা
- (৩) মেব মল্লানাং মহাবোধিনিবাসিনাং ॥ স্নাতক +
- (৪) + ৭প্রজয়াস্ত শ্রেয়সে প্রতিষ্ঠাপিতঃ পুষ্করি-
- (৫) তৃত্যগাধা চ পূতা বিষ্ণুপদীসমা ॥ দ্বিতয়ে-
- (৬) ন সহস্রেন দ্রুম্যাণাং খানিতা সত্যং ॥২
- (৭) ষড়্‌বিজ্‌শতীতমে বর্ষে ধর্মপালে মহীভূজি
- (৮) ভাদ্রবহুলপঞ্চম্যাং স্থনোর্ভাস্ক-
- (৯) রস্তাহনি ॥ ওঁ

অনুবাদ

রাজা ধর্মপালের সংবৎ ২৬ ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ শনিবার পঞ্চমী তিথিতে এই রমণীয় চম্পশায়তন নামক স্থানে মহাবোধিনিবাসী শ্রেষ্ঠ মল্লদিগের প্রতিষ্ঠাপিত এই চতুমুখ মহাদেব

যাহা স্থপতি উজ্জ্বলের পুত্র কেশব নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই তিন হাজার দ্রব্মব্যয়ে খানিত গঙ্গাতুল্য পবিত্র অগাধ পুষ্করিণী সাধুদিগের.....মন্ডলের জন্ত হউক।

এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে নীলমণি বাবুর প্রকাশিত অর্থের সহিত আমার এ অর্থ বিভিন্ন হইল। তাঁহার অর্থে তিনি এই মহাদেব ও পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার কর্তা করিয়াছেন কেশবকে। কেশব মন্দিগের কল্যাণের জন্ত মহাদেব ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করাইল। অর্থটা যেন কেমন কেমন ঠেকে। এই শিলালিপিতে মন্দিগকে বলা হইয়াছে শ্রেষ্ঠ, আর কেশবকে বলা হইয়াছে শিলাভিত্ত অর্থাৎ স্থপতি (Sculptor) উজ্জ্বলের পুত্র। একজন স্থপতির পুত্র শ্রেষ্ঠ মন্দিগের কল্যাণের জন্ত মহাদেব ও পুষ্কর প্রতিষ্ঠা করাইল, ইহা যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এ অর্থে মন্দিগের শ্রেষ্ঠ বিশেষণের যেন তাৎপর্য থাকে না। নীলমণি বাবু বোধ হয় “মল্লানাং” এই পদে যষ্টি বিভক্তি দেখিয়া ও “কেশবাথ্যেন পুত্রেন” এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি দেখিয়া প্রতিষ্ঠাপিত ক্রিয়ার কর্তা বুঝিয়াছেন কেশবকে। আমি কিন্তু বিবেচনা করি, প্রতিষ্ঠাপিত ক্রিয়ার কর্তা “মল্লানাং” মন্দিগের প্রতিষ্ঠাপিত অর্থাৎ মল্লগণকর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত। এস্থলে কর্তায় তৃতীয়া না হইয়া যষ্টি হইয়াছে, কারণ প্রতিষ্ঠাপিত ইহা বর্তমান কালে ‘কু’ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং “কেশবাথ্যেন পুত্রেন” এই কর্তৃপদের “নির্মিত” এইরূপ একটা ক্রিয়া উহা করিয়া লইতে হইবে। এই শিলালিপিটি পণ্ডে রচিত। সংস্কৃত পণ্ডে অনেক স্থলে এরূপ উহা করিয়া অর্থ করিবার রীতি আছে। আমি এইরূপ অর্থ সম্ভব বোধ করিলাম, এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন কোনটা সম্ভব?

এই শিলালিপিটি একখানি ২ ফুট লম্বা ৭ ইঞ্চি চওড়া প্রস্তরের একপার্শ্বে খোদিত। ইহার অপর স্থানে তিনটা ছোট ছোট মূর্তি খোদিত আছে। একটা সূর্যের, একটা বিষ্ণুর ও একটা ভৈরবের। ডাক্তার জোন আণ্ডারশনের পুস্তকে (Catalogue and Hand-book of the Archaeological Collection Indian Museum. Part II, P. 48) এ মূর্তি কয়েকটাকে বোধিসত্ত্বের মূর্তি বলা হইয়াছে ও শিলালিপিটিকে যে ‘ধর্ম্মা’ ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের সাধারণ ধর্ম্মলিপি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

এই প্রস্তরখানি খৃষ্টীয় ১৮৭৯ অব্দে ক্যানিংহাম সাহেব মহাবোধিমন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে প্রাপ্ত হন ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে প্রদান করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল ১৮৮০ খৃঃ এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য-বিবরণীতে (Proceedings A. S. B. 1880. p. 80) ইহার প্রতিলিপি প্রকাশিত করেন। তাৎকালিক তাঁহার মে পাঠে ও অর্থে অনেক প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। ক্যানিংহাম সাহেব তাঁহার মহাবোধি নামক পুস্তকে (Cunningham's Mahabodhi, Plate XXVIII.No. 3.) কেবলমাত্র ইহার একটা ছাপ প্রকাশিত করিয়াছেন।

২। গোপালদেব।

(১) ও কুন্ডা মৈত্রীভূজঃ ক্ষুরহুককবণাখড়াগালম্বয়ন যঃ। কুর্জ্জৎকন্দর্পসেনাঃ
প্রলয়জলনিধেদ্বানভীমপ্রঘোষাং। কল্লাস্তাদীপ্তবহ্নিঅলিত্তরবপুংক্রোধজিস্কীক

(২) তত্রঃ । জিগ্যো নিকান্তহেমদ্রুতিঃ ললিতবপুঃ সোমস্ত ভূত্যা জিনো বঃ ॥ যঃ শার-
দেন্দুকিরণোজলকীর্তিগুঞ্জঃ । সমুদ(ক) পাদশতপত্রমনঃষড়জিভুঃ । শ্রীধার্ম্ম সং

(৩) য ইতি চ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং । সিংধুদ্রবো ভবদনল্পকপাদ্ চিত্তঃ(ভঃ) ॥ তেনেয়ং
শক্রসেনেন কারিতা প্রতিমা মুনোঃ কাংকতাহনুত্তরাধোদিং জগতো হুঃখশাস্তয়ে ॥

(৪) শ্রীগোপালদেবরাজো ।

অনুবাদ

যিনি (আপনাকে) মৈত্রীরূপ অঙ্গাবরণে আবৃত করিয়া প্রবলোজ্জ্বল কারণারূপ খড়্গের
সাহায্যে প্রলয়জলনিধির শব্দের মত ভীষণ শব্দকারী এবং প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত বহির
মত উজ্জলশরীর ক্রুদ্ধ মারমৈত্রীগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণবর্ণ সৌম্যমুদ্রিত জিন
আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করুন। জগতের হুঃখশাস্তির জন্ত এবং আপনার অত্যন্তম
জ্ঞানলাভে । আশার দিক্‌দেশোপরি দয়ালু শক্রসেন—যিনি বুদ্ধপাদপদ্মে ভূজায়মানমণাঃ এবং
শ্রীধার্ম্মসং বলিয়া পৃথিবীথ্যাত (অর্থাৎ যিনি বুদ্ধধর্ম্মসংঘ এই ত্রিরত্নের উপাসক) এবং
বাহার যশোরশি শারদেন্দুকিরণের মত সমুজ্জ্বল—ভগবান্ বুদ্ধদেবের এই প্রতিমা নির্মাণ
করাইলেন। শ্রীগোপালদেবের রাজ্যকালে।

নীলমণিবাবুর প্রকাশিত পাঠ হইতে এ পাঠও কিছু বিভিন্ন হইল। যখন আমরা
তিনজনে একত্র ইহা পড়ি, তখন যাহা পড়া হইয়াছিল নীলমণি বাবু তাহাই প্রকাশ
করিয়াছেন। এখন আবার আমি পড়িয়া দেখিতেছি—সে পড়া যেন ঠিক হয় নাই।
তখন পড়া হইয়াছিল “ক্ষুর্জংকন্দপ্সেনা প্রলয়জলনিধেদ্বানভীমপ্রমোষী।” এবং তাহা
জিনের বিশেষণরূপে অর্থ করাও হইয়াছিল। এখন দেখিতে পাইতেছি, “সেনা” পদটির
মাথার উপর একটি অনুস্বার রহিয়াছে। প্রমোষী পদের মো ঘো বলিয়াই মনে হইতেছে,
যেহেতু অত্র মকারের সহিত এ মটি মিলিতেছে না। বী না হইয়া উহা যাং বলিয়াই মনে
হয় এবং “ক্ষুর্জংকন্দপ্সেনাং প্রলয়জলনিধেদ্বানভীমপ্রমোষাং” বলিলেই যেন অর্থও
সুচারু হয়। তাহার পর তখন পড়া হইয়াছিল, “শ্রীধার্ম্মভীম ইতি” এখন কিন্তু বোধ হয়
শ্রীধার্ম্মসংঘ ইতি, কারণ বাহাকে ম পড়া হইয়াছিল সে অক্ষরটি প্রমোষাং পদের ঘ অক্ষরেরই
মত, আর বাহাকে ভী পড়া হইয়াছিল তাহা অস্পষ্ট সং অত্র মকারের সহিত মিলাইয়া
দেখিলেই বুঝা যাইবে। এবং ‘সমুদ্রপাদশতপত্রমনঃষড়জিভুঃ শ্রীধার্ম্মসংঘ’ এই বিশেষণদ্বয়ে
শক্রসেনকে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উপাসক বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই শিলালিপিটিতে হেমদ্রুতিঃ এই পদের বিসর্গটি নিরর্থক।

শক্রসেন যে প্রতিমা নির্মাণ করা হইয়াছিলেন, সে প্রতিমা পাওয়া যায় নাই, তবে
তাহারই পাদপীঠেই উক্ত বিবরণটি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব ইহা গয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত হন এবং তাহার মহাবোধি
নামক পুস্তকে (Mahabodhi, Plate XXVIII, 2.) প্রকাশিত করেন। তবে সে
পাঠোদ্ধারে ও এ পাঠোদ্ধারে অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীমান্ রাখালদাস অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া নীলমণি বাবুকে এই গোপালদেব যে দ্বিতীয় গোপালদেব, তাহা স্থির করাইয়া দিয়াছেন।

৩। গোপালদেব। রাজ্যাক্ষ ১

১। সখ্যং ১ আশ্বিন শুদি চ পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীগোপালরাজলি
শ্রীনালাদায়ঃ।

২। শ্রীবাগীশরীভট্টারিকা স্তবর্ণব্রীহিস্তাঃ।

অনুবাদ

পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীগোপালরাজের সখ্যং ১ আশ্বিন মাসের
শুক্লপক্ষের অষ্টমীতিথিতে নালাদা নগরীতে বাগীশরী ভট্টারিকা স্তবর্ণপত্রে মণ্ডিতা হইলেন।

‘স্তবর্ণব্রীহিস্তাঃ’ কথাটিতে বিসর্গ নিরর্থক। ইহার অর্থ যে স্তবর্ণপত্রে মণ্ডিত করা,
ইহা নীলমণি বাবু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে
পাইয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে রাখালদাস বাবু নাকি
বলেন যে, তিনি জানেন যে আজও পর্যন্ত স্মদুর পূর্বদেশবাসী যাত্রীরা তাঁহাদের দেবতাকে
স্তবর্ণপত্রে মণ্ডিত করিয়া থাকেন।

ইহা একটি উপবিষ্টা দেবীমূর্তির আসনের সম্মুখভাগে উৎকীর্ণ। লিপিপাঠে মনে হয়
মূর্তিটি বুদ্ধদেবীর, দেখিলে কিন্তু ব্রাহ্মণদেবী বগলামুখী বলিয়া বোধ হয়। ‘মাহুঘরে ইহা
ব্রাহ্মণ-দেবদেবীর মূর্তি-সমবায়ের ভিতরেই রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব নালাদায় (আধুনিক বড়গাঁও) উহা প্রাপ্ত হন ও তাঁহার
রিপোর্টে (A. S. R. Vol I. plate XIII. I,) প্রকাশ করেন। তাহার পর আবার
তাঁহার রিপোর্টে (A. S. R. Vol III. p. 120) তিনি ইহার পাঠোদ্ধার করেন।

৪। মহীপাল দেব। রাজ্যাক্ষ ১১

১। ওঁ শ্রীমহীপাল দে

৭। কীর জ্যাবিষ কৌশাধী

২। বরাজ্যে সখ্যং ১১

৮। বিনির্গতস্ত হরদত্তনপু

২। অগ্নিদাহোদ্ধারে

৯। গুরুদত্তস্ত শ্রীবালা

৪। গতে দেয় ধর্মোন্নয় প্রবর

১০। দিতাস্ত। যদন্তপুণ্যং ত-

৫। মা (ম)হাষানযায়িনঃ পর

১১। দত্তবতু সর্কগন্তরাশের-

৬। গোপালক শ্রীমন্তলাচ

১২। স্তব্র জ্ঞানাবাণ্ডয় ইতি

অনুবাদ

মহীপাল দেবের ১১ সংবতে হরদত্তের নাতি গুরুদত্তের পুত্র বালাদিত্যের এই ধর্মার্থে
দান। বালাদিত্য কৌশাধী পরিত্যাগ করিয়া তৈলাচকে আসিয়া বাস করেন এবং
জাতিতে জ্যাবিষ (নীলমণি বাবু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয়ের নিকট
হইতে জ্যাবিষ বলিতে নেপালী জৈন্য জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মিশ্রিত এক প্রকার জাতি

বলিয়া অবগত হইয়াছেন) বাংলাদিত্য মহাযান-মতাবলম্বী ভক্ত গৃহী ছিলেন। যখন এই ধর্মার্থে দান করা হয়, তখন এই স্থান (নালন্দা) অগ্নিদাহ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে (অর্থাৎ বাংলাদিত্য যবে ইহা দান করেন, তখন নালন্দায় কোন একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটয়া গিয়াছে।) এই দানে যে পুণ্য হইবে, তাহার বলে জীব সকল অত্যন্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হউক।

এ প্রস্তরটী একটা প্রস্তরনির্মিত দোর চোকাটের কিয়দংশ। ইহার যে অংশে এই লিপি উৎকীর্ণ, তাহার উপরিভাগে একটা দণ্ডায়মান পুংমূর্তি খোদিত আছে। মূর্তিটার দাঁড়ান'র ভাব যেন নৃত্যকালীন কোন একটা অবস্থা বিশেষের মত। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঞ্চে মার্শাল সাহেব নালন্দায় বাংলাদিত্যের মন্দির খোদন-কালে এখানে প্রথম প্রাপ্ত হন। তাহার পর মিটার ব্রাডলি সাহেব ইহা পুনরাবিস্কার করেন। ক্যানিংহাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টে (A. S. R. Vol III p. 123) ইহার কিছু বিবরণ দেন।

নীলমণি বাবুর প্রবন্ধে ইহা প্রথম মহীপালের রাজ্য সংবৎ ১১ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এ শিলালিপিটার মধ্যে শ্রীমান্ন রাখাল দাস "অগ্নিদাহোদ্ধারে গতে" এই অংশটী পড়িয়া দিয়া ধত্তবাদের পাত্র হইয়াছেন।

৫-৬। শ্রীশূরপালদেব। রাজ্যাক্ষ ২

- ১। ওঁ মহার (জা) ধিরাজা (জ) শ্রীশূরপাল দেবরাজ্য সম্বৎ ২
- ২। ধিরাজা (যা) চ বদি ১১ অগ্নিন্ সম্বৎসর মাস দিব
- ৩। সামুক্রমে শ্রীমহাদ্গুপ্তুরো (রে) ইহ বিহার নৈব।
- ৪। সিক সিদ্ধদেব (দেশ) বিনির্গত পাড়িক্রমণ বিহার বুদ্ধ
- ৫। পরিষদ্য (গুহ) প্রদর্শিন (১) স্থবির পূর্ণদাসেন স্বকারিত চৈত্যে ভট্টারকস্ত
শৈলপ্রতিমা দেবক (দেয় ধ) স্মায় প্রতিষ্ঠ (ষ্ঠা) পিত (১) বৎ পু
- ৬। গ্যং মাতাপিতর (রৌ) উপ (১) দ্য (১) ম (২) পূর্বদমং কৃত্বা অমুত্তর (২)
সকল সম্বরণে (ব্) ইতি

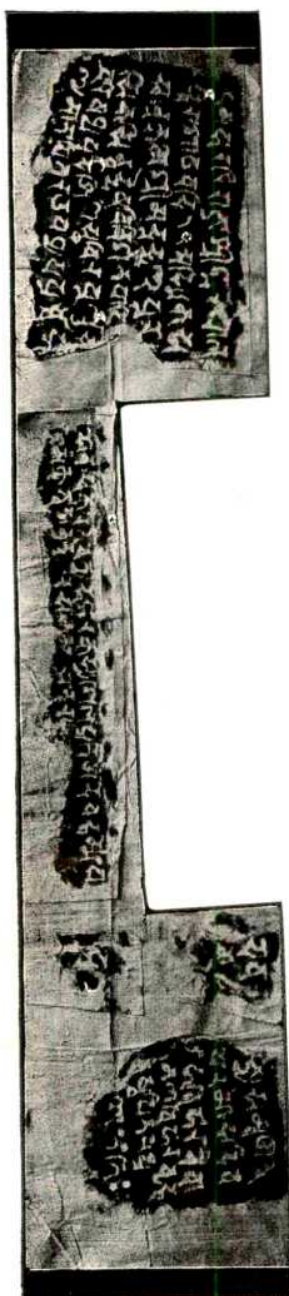
অনুবাদ

মহারাজাধিরাজ শ্রীশূরপাল দেবের দ্বিতীয় রাজ্য বৎসরের আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশ দিনে, এই বৎসর এই মাস এই দিনেই সমৃদ্ধ উদ্গুপ্তস্থিত এই বিহারে নিবাস-কারী স্থবির পূর্ণদাস তাঁহার নিজ কৃত চৈত্যে ভগবান্ বুদ্ধদেবের এই শৈলীপ্রতিমা ধর্মার্থে প্রতিষ্ঠা করিলেন। পূর্ণদাস মহাজ্ঞানী ও সিদ্ধদেশবিনির্গত পাড়িক্রমণ নামক বিহারের স্থবির। ইহাতে যাহা পুণ্য তাহা মাতাপিতা ও উপাধ্যায়প্রমুখ সকল জীবের জ্ঞান লাভের জন্ত হউক।

নীলমণি বাবুর পাঠের সহিত ইহাতেও কিছু পার্থক্য রহিল। তৃতীয় পংক্তিতে তাঁহার পঠিত শ্রীমহাদ্গুপ্তুরো (ডো) ইহার পরিবর্তে শ্রীমহাদ্গুপ্তুরো (রে) পড়িলাম ও সমৃদ্ধ

পালরাজগণের শিলালিপি ।

৫।৬।সংখ্যক



সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা ।

উদগুপ্তের (ওদগুপ্তের) স্থিত এই বিহারনিবাসী বলিয়া অর্থ করিলাম। নীলমণি বাবু শ্রীমহাদেবচন্দ্র নামক ব্যক্তি পূর্ণদাসের হাত দিয়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করাইলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'উদগুপ্তঃ পূর্ণদাসেন শৈলপ্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিতা' এরূপ সংস্কৃত হইতে পারে না।

শ্রীমান রাখালদাস বলেন, এইরূপ পাঠই নাকি তিনি নীলমণি বাবুকে একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

এক প্রকারের এই দুইটা শিলালিপি দুই দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ। একটা বুদ্ধমূর্তি মত্তহস্তী বশ করিতেছেন, অপরটা ইন্দ্র ও ব্রহ্মা কর্তৃক সেবিত হইতেছেন। এই মূর্তি দুইটা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বেহার হইতে আনীত হইয়াছে। এ দুখানির অপর কোন বিবরণ অত্থাপি আর কোথায় প্রকাশিত হয় নাই।

৭। রামপাল দেব। রাজ্যাক্ষ ২

১। ওঁ দেয় ধর্ম্মায়ং পরবর মহাজ সিক ॥ ভট্টনাভোহুতভট্টদৈচ্ছরম
বদত্র পুণ্য তদ্বভবতু মাতা-

২। পিতৃ পূর্ব্বজং সকল মত্ভাজুরানে ... হু রাজ শ্রীরামপালদেব সম্বৎ ২
বৈশাখ দিনে ২৮ সেতাহুত ... মহাবত গঢ়ি তমে (?)

অনুবাদ

রামপাল দেবের ২ সম্বতে বৈশাখের ২৮ দিনে ভট্টনাভের পুত্র ভট্ট দৈচ্ছরের এই ধর্ম্মার্থে দান। ইহাতে মাতা পুণ্য তাহা হইতে মাতাপিতৃপ্রমুখ সকল জীবের উত্তম জ্ঞান লাভ হউক। সর্ব্বশেষের সেতাহুত পদ কর্ত্তী সম্ভবতঃ স্থপতির পরিচায়ক।

এই শিলালিপিটি অতিশয় অশুদ্ধভাবে একটা দণ্ডায়মান বৌদ্ধ তারামূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইহা বেহার হইতে আনীত হয়। কানিংহাম সাহেব তাহার রিপোর্টে (A. S. R. Vol. III.) এই শিলালিপির তারিখটা কেবল উল্লেখ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত শিলালিপিটি নীলমণি বাবুর প্রবন্ধে নাই, ইহা সম্পূর্ণ নুতন, আজ পর্য্যন্ত ইহা কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই।

৮। নারায়ণ পালদেব। রাজ্যাক্ষ ৯

১। ওঁ সম্বৎ ৯ বৈশাখ শুদি পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণপালদেবরাজ্যে আত্রবৈয়য়িকশাকা-
ভিক্রুৎবিরমশ্রমিত্রস্ত

২। বদত্র পুণ্য তদ্বভবতু মাতাপিতৃপূর্ব্বজং কৃত্বা সকলসহর্য্যশেরমুত্তর-
জ্ঞানফলপ্রাপ্তয় ইতি।

অনুবাদ

শ্রীনারায়ণপালদেবের রাজ্যসংবৎ ৯ বৈশাখমাস শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে অন্ধ্রদেশবাণী

বৌদ্ধভিক্ষু স্ববির ধর্মমিত্রের ইচ্ছাতে বাগা পুণা তাহা আচার্য্য উপাধ্যায় মাতা ও পিতা প্রমুখ সকল জীবরাশির অমৃত্তর জানপ্রাপ্তির নিমিত্ত হউক।

এই শিলালিপিটি যে প্রস্তর খানিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা কোন একটা বৌদ্ধমূর্ত্তিক পাদপীঠ বলিয়াই মনে হয়। মূর্ত্তি এখন নাই।

পালরাজগণের বংশাবলী ।*

- ১। দয়িতবিস্মু
- ২। বপ্পট (১মের পুত্র)
- ৩। মহারাজাধিরাজ গোপাল ১ম (২য়ের পুত্র)
- ৪। " ধর্মপাল (৩য়ের পুত্র)
- ৫। " দেবপাল (৪র্থের পুত্র)
- ৬। " বিগ্রহপাল ১ম
(৪র্থের ছোট ভাই বাক্‌পালাস্বয়ং জয়পালের পুত্র)
- ৭। " নারায়ণ পাল (৬র পুত্র)
- ৮। রাজ্যপাল (৭মের পুত্র)
- ৯। গোপাল ২য় (৮মের পুত্র)
- ১০। মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল ২য় (৯মের পুত্র)
- ১১। " মহীপাল ১ম (১০মের পুত্র)
- ১২। " নয়পাল (১১শের পুত্র)
- ১৩। মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল ৩য় (১২শের পুত্র)
- ১৪। মহীপাল ২য় (১৩শের পুত্র)
- ১৫। শূরপাল (১৪শের ছোট ভাই)
- ১৬। মহারাজাধিরাজ রামপাল (১৫শের ভ্রাতা)
- ১৭। কুমারপাল (১৬শের পুত্র)
- ১৮। গোপাল ৩য় (১৭শের পুত্র)
- ১৯। মহারাজাধিরাজ মদনপাল (১৮শের পুত্র)
- ২০। গোবিন্দপাল

শ্রীবিনোদবিহারি বিজ্ঞাবিনোদ ।

* সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫ সাল, ২য় সংখ্যায় মদনপালের ভ্রাতৃশাসন প্রসঙ্গে ১ম গোপাল হইতে মদন-পাল পর্যন্ত পালরাজগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।—সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদক ।

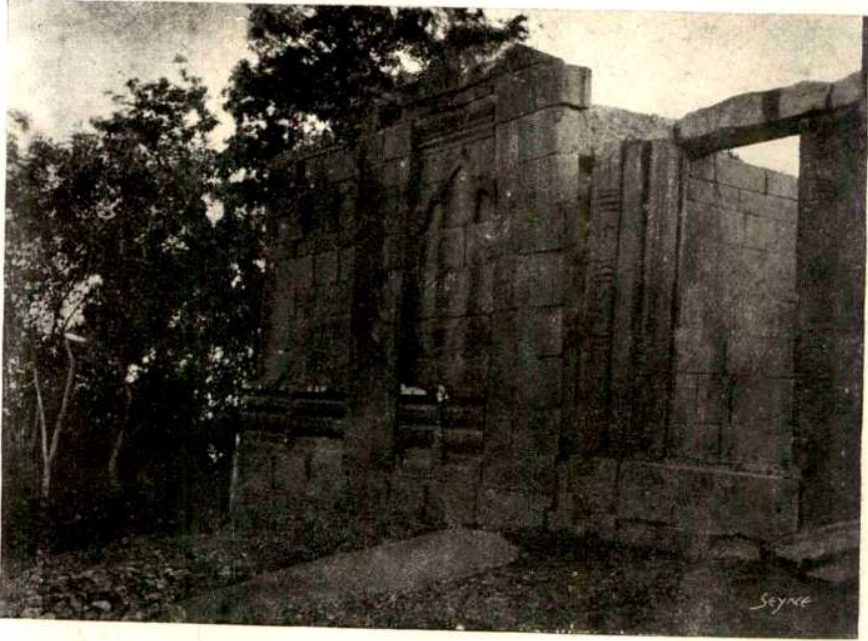
সপ্তগ্রাম

দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্বে রোমক ঐতিহাসিক প্লিনি ভারতবর্ষের বিবরণে সপ্তগ্রামের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, ভারতের সহিত রোমক বাণিজ্যের অভ্যুদয়ের সময়ে সপ্তগ্রাম একটা প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। মুসলমান-বিজয়ের সময়ে বা তাহার পঞ্চাশৎ বর্ষ পর পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মোলানা মিন্‌হাজ্-উদ্-দীনাভিজের তবকাতি নাসিরি-গ্রন্থে সপ্তগ্রামের উল্লেখ নাই। তবকাত-অনুবাদক মেজর রাভাট বলেন যে কেবল এক-স্থানে তবকাতের নূতন পুঁথিতে যে স্থানে বেকানওয়া নামক স্থানের উল্লেখ আছে, পুরাতন পুঁথিতে সেই স্থানে সাতগাঁও নাম দেখা যায়।^১ মিন্‌হাজের পরবর্তী সমস্ত মুসলমান ঐতিহাসিক সপ্তগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে দৃষ্ট হইবে।

কলিকাতা হইতে ৩১ মাইল দূরবর্তী ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলপথে ত্রিশবিধা ষ্টেশন হইতে মগরা ষ্টেশনের নিকটবর্তী সরস্বতী নদীর সেতু পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃতি।

ত্রিশবিধা হইতে পূর্বে বাঁশবেড়িয়া ও উত্তরে মগরাগঞ্জ ও ত্রিবেণী হইতে পশ্চিমে মগরা ও দক্ষিণে বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত যদি একটা চতুরস্র ক্ষেত্র কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রটাই প্রাচীন সপ্তগ্রামের ধ্বংস-বশেষে পরিপূর্ণ; এই ভূখণ্ডের মধ্যে চারি পাঁচটা গ্রাম আছে। সে গুলি প্রাচীন নগরীর এক এক পল্লীর নাম। এই চারি শত বর্ষ পর্য্যন্ত এই গ্রামগুলি সেই সকল নামই বহন করিয়া আসিতেছে। মোগল-সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে সপ্তগ্রামের অবনতি আরম্ভ হয়, আর এক শত বৎসরের মধ্যে বিশাল নগরী অরণ্যে পরিণত হইয়া পড়ে, কিন্তু বড়পাড়া, মালো-পাড়া, কাগজিপাড়া প্রভৃতি গ্রাম অত্মাপি লোকের মনে প্রাচীন সপ্তগ্রামের পল্লীবিভাগের কথা জাগরিত করাইয়া দেয়। ত্রিশবিধা হইতে বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত সমুদয় ভূখণ্ড প্রাচীন পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকায় পরিপূর্ণ। কোন কোন পুষ্করিণীতে এখনও ইষ্টকনির্মিত বাট দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশ পুষ্করিণীর জল অপেক্ষ হইয়া গিয়াছে। সপ্তকোশব্যাপী বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একটা মসজিদ ও একটা মন্দির এখনও উচ্চশীর্ষ চহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অবশিষ্ট সমুদয়ই কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। প্রশস্ত স্তম্ভনির্মিত রাজপথে অবাধে বস্ত্রপণ্ড বিচরণ করিয়া থাকে। অনেকগুলি ইষ্টকনির্মিত বস্ত্র ও গৃহভিত্তি নিবিড় লতাগুজে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। বর্তমান সপ্তগ্রামবাসিগণ সে পথে চলিতে সাহস করে না। সপ্তগ্রামের পশ্চিম প্রান্তে সরস্বতীতীরবর্তী রঘুনাথদাসের পাটে ঘাইতে হইলে, প্রাচীন

অনেকগুলি রাজবস্তু অবলম্বন করিয়া যাইতে হয়। এই সকল পথে সর্প ও শৃগাল নির্ভয়ে বিচরণ করে। বন্যশূকরের বংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নিকটস্থ গ্রামবাসিগণের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। শুনিয়াছি সময়ে সময়ে প্রাচীন সপ্তগ্রামের রাজপথে নির্ভীক শার্দূল-বংশও বিচরণ করিয়া থাকে। বে সরস্বতী অদূর রোমন-সাম্রাজ্যের অর্ণবোপাত সমুদ্র হইতে বক্ষে বহিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত করিত, সেই ক্ষীণকারী সরস্বতীতে এখন পথিকের পদ প্রক্ষালনের উপযোগী জলও নাই, শুনিতে পাওয়া যায়, দক্ষিণে সরস্বতী নদীর গর্ভের চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই। নদীগর্ভে হলকর্ষণকালে কৃষকগণ মুদ্রা বা অর্ণবোপাতের শৃঙ্খল, লোপার ইত্যাদি পাইয়া এখনও স্মৃতিগাঁয়ের কথা স্মরণ করিয়া থাকে। সরস্বতী ও গঙ্গার সঙ্গম স্থানের অতি অল্প দূরে একটি সেতুর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, উহাও প্রাচীন সপ্তগ্রামেরই সেতু। চারি শত বর্ষ পূর্বে বঙ্গের বাদশাহ হোসেন শাহ নিয়োগ করাইয়াছিলেন। ইহার নিকটই বর্ত্তমানরাজের ব্যয়ে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিৰ্ম্মিত নূতন সেতু বিস্তারিত রহিয়াছে। রঘুনাথ দাসের পাটও সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত। এই স্থান হইতে নূতন সেতু পর্য্যন্ত যাইতে হইলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের সেতু অতিক্রম করিতে হয়। কয়েক বর্ষ পূর্বে ভারতীতে এক জন লেখক লিখিয়াছিলেন যে, পূর্বে পাড়ী হইতে সরস্বতী নদীতীরে কৃষ্ণপ্রস্তর নিৰ্ম্মিত একটি গৃহের অবশেষ দেখা যাইত। এখন আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় তৃণশূন্য আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। সপ্তগ্রামের একটি বাগদী বৃদ্ধ বলিল যে, ৩০৩৫ বৎসর পূর্বে ঐ গৃহ দেখা যাইত, কিন্তু এখন উহা দেখিতে গেলে দুই তিন শত হাত জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা না করিলে ঐ স্থানে যাওয়া যায় না। কথিত আছে, উহা এক ধনাঢ্য মুসলমানের গৃহের অবশেষ। রেলওয়ের সেতুর অনতিদূরেই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সেতু। এই সেতুর অনতিদূরে একটি পুরাতন মসজিদ ও কৃষ্ণপ্রস্তরনিৰ্ম্মিত কয়েকটি সমাধি দেখা যায়। মসজিদটি অত্যন্ত কাল হইল সংস্কৃত হইয়াছে। গ্রামের মুসলমান অধিবাসিগণ নিরক্ষর। কেহ কেহ মসজিদকালে কোন কোন সমাধির নিকট এক একটা প্রদীপ দিয়া যায়। তাহারা কেহই নমাজ পড়িতে জানে না বা পড়ে না। শুনিলাম মসজিদের খাদিম বংশ প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষকাল পূর্বে লুপ্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে এক জন বিদেশী মুসলমান আসিয়া কিয়ৎকাল এই মসজিদে অবস্থিতি করিয়াছিল, কিন্তু সে ব্যক্তিও এস্থান ত্যাগ করিয়াছে। ছাদশূন্য মসজিদ একগুণে শৃগাল ও পেচকের বাসস্থান হইয়াছে। মসজিদের কিছু নিকর ভূমি ছিল প্রাতিদ্বন্দ্বীর অবর্ত্তমানে এক জন হিন্দু উহা ভোগ করিতেছে। মসজিদের সম্মুখে নমাজের পূর্বে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনের জন্য একটি কুণ্ড আছে। কুণ্ডের গঠন কালে ইষ্টক ও প্রস্তর উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছিল। মসজিদের গায়ে এক খানি প্রস্তর ফলকে আরবী ভাষায় খোদিত লিপি আছে। সমাধি স্থানের পূর্ব দিকে একটি বৃহদাকার দীর্ঘিকা আছে। এখনও ইহাতে দশ বার হাত জল আছে বোধ হইল। মসজিদের নিকটে বৈষ্ণবদিগের আর একটি পাট আছে। ইহা স্মরণ বশিক জাতীয়



জাহ্নবী থার সমাধি, উত্তর দ্বার—ত্রিবেণী ।

(১০)



মসজিদ (পূর্বদিক)—ত্রিবেণী ।

উদ্ধারণ দত্তের পাট। এই পাটে এখনও মেলা হয় এবং বৎসর বৎসর এখানে বিস্তর যাজীর সমাগম হইয়া থাকে।

গঙ্গা-সঙ্গমের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত গাজীর দরগা বা জাকর খাঁ গাজীর সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরে একটা বৃহদাকার মন্দির আছে। সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এই স্থানটাই সর্বাগ্রেফা প্রাচীন। সাধারণ লোকে ইহাকে গাজীর দরগা বা দক্ষা গাজীর কুড়ুল বলিয়া থাকে। জাকর খাঁর সহিত দক্ষা বা দরাক-খাঁর সম্পর্ক অতি অল্প। গঙ্গাস্রবণপ্রণেতা দরাক্ খাঁ বাকালার উচ্চারণদোষ বা মৃত্তিকার দোষে সপ্তগ্রামবিজয়ী স্বর্গাঙ্ক তুর্কী জাতীর সৈন্যধ্যক্ষ জাকর খাঁতে পরিণত হইয়াছেন। জাকর খাঁর সমাধির পূর্বদ্বারে প্রস্তরখণ্ডে সংসার লৌহখণ্ডকে সাধারণ লোকে গাজীর কুড়ুল আখ্যা দিয়াছে। সচরাচর লোকে বলে “গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না”।

জাকর খাঁর সমাধি দুইভাগে বিভক্ত। ইহার পূর্বভাগে জাকর খাঁ ও তাঁহার স্ত্রী সমাহিত আছেন ও পশ্চিমভাগে তাঁহার জাতা “বড় গাজী” ও তৎপুত্রগণের সমাধি জিবলীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। সমাধির প্রাচীর প্রস্তর নির্মিত কিন্তু কোন অংশেরই বা জাকর খাঁর সমাধি ছাদ নাই। প্রাচীরের উপরিভাগে ইষ্টকনির্মিত ক্ষুদ্রাকার প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষও লক্ষিত হয়। উত্তর সমাধিগৃহের ভিত্তিই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত। কিন্তু সমাধিগৃহ দুইটিরই প্রাচীরের প্রস্তর বিভিন্ন বর্ণের। যে গৃহে জাকর খাঁ সমাহিত আছেন, কেবল সেই গৃহেরই প্রাচীরের প্রস্তর, ভিত্তির প্রস্তরের জ্বর কৃষ্ণবর্ণ। পশ্চিমস্থ সমাধি-গৃহের প্রাচীরের প্রস্তর রক্তাভ। জাকর খাঁর সমাধি-গৃহে চারিটি দ্বার আছে; প্রত্যেক দ্বারেই হিন্দু-প্রস্তরশিল্পের অচূর নিদর্শন আছে। দ্বারের উত্তর পার্শ্বের নিম্নদেশে ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে দেওয়ারমানা দেবীমূর্তি ও তৎপার্শ্বে দুইটি করিয়া বক্ষমূর্তি খোদিত আছে, ইহার উপরিভাগে দ্বার, প্রথম অংশে ও পরে চতুষ্কোণ ও অষ্টকোণ। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, প্রত্যেক পার্শ্বে দুইটি করিয়া বক্ষ একটি অষ্টকোণ ও একটি চতুষ্কোণ পুস্ত পূর্ত ধারণ করিয়া আছে। কৃষ্ণবর্ণ মস্তৃণ প্রস্তরনির্মিত মন্দিরভিত্তি অতি সুদর্শন। ইহা দেখিতে অনেকটা গঙ্গার বিষ্ণুপাদপদ্ম মন্দিরের ভিত্তির জায়। বোধ হয় যে গৃহে জাকর খাঁ সমাহিত আছেন, সেই গৃহই প্রাচীন মন্দিরের অন্তরাল বা গর্ভগৃহ। সপ্তগ্রাম বিজয়-কালে বিজয়কর্তৃক মন্দিরের ধ্বংস সাধিত হয়। পরে জাকর খাঁ ইহলোক ত্যাগ করিলে মন্দিরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। প্রস্তরভাবে সমাধিগৃহের উদ্ধদেশ ইষ্টক নির্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ জাকর খাঁর মৃত্যুর পর বড় গাজীর মৃত্যু হয়। কারণ বড় গাজীর সমাধি, মন্দিরের মণ্ডপের মধ্যভাগে নির্মিত হইয়াছে। পশ্চিমদেগ হইতে আনীত নূতন রক্তাভ প্রস্তরে বড় গাজীর সমাধিগৃহ গঠিত। বড় গাজীর সমাধির অভ্যন্তরে প্রাচীন মন্দিরের উদ্ধদেশে করেকখানি প্রস্তরে প্রাচীন বদাকরে খোদিত গিণি অঙ্কানি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায় যে, এই মন্দির কোন বৈষ্ণবকর্তৃক নির্মিত।

ষষ্টি-বর্ষ পূর্বে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মণি সাহেব (D. Money) এই খোদিত লিপিগুলির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ ও প্রকৃত পাঠ একত্র দর্শিত হইল :—

মণিসাহেবের পাঠ	নবোদ্ধৃত পাঠ
১। শ্রীসীতানিধাসঃ শ্রীরামাভিষেকঃ	১। শ্রীসীতানিধাসঃ শ্রীরামাভিষেকঃ
২। পদ্মিষেক	২। শ্রীভিষেক
৩। শ্রীরামেশ রাবণ বধাঃ	৩। শ্রীরামেশ রাবণবধঃ
৪। শ্রীকৃষ্ণবাণাসুরমোহকঃ	৪। শ্রীকৃষ্ণবাণাসুরমোহ্যাক্ষম্
৫। বৃদ্ধদ্বায় দুঃশাসনা যাত্ত্বদ্বয়	৫। ধৃষ্টদ্বায়-দুঃশাসনমোহ্যাক্ষম্

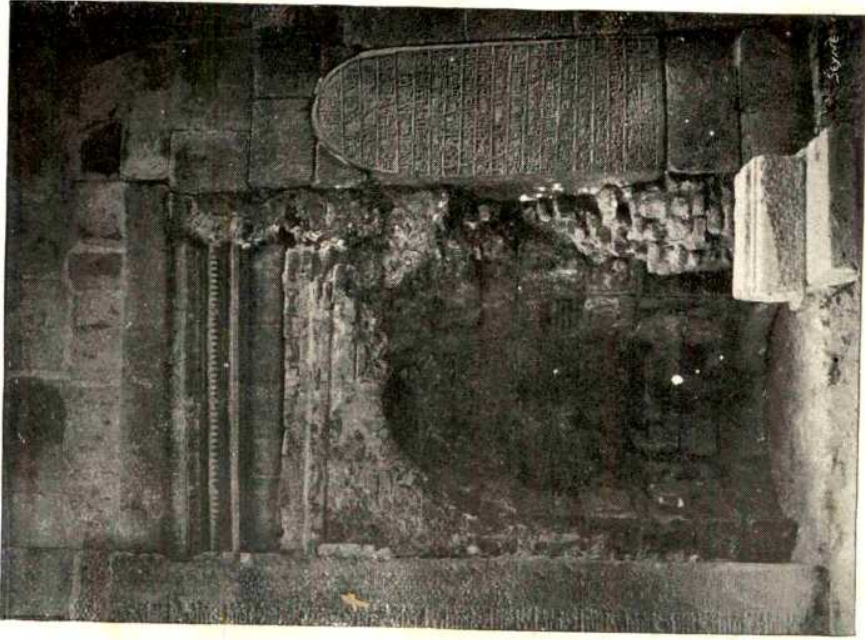
মণি সাহেব তিনটি খোদিত লিপির পাঠোদ্ধারে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন :—১। সীতা-বিবাহঃ ২। কংশবধঃ ৩। চানুরবধঃ।

নিম্নলিখিত দুইটি খোদিত লিপি নূতন :—

১। ঋত্বিশিরসোক্ষঃ..... ২।.....বজ্রহরণঃ

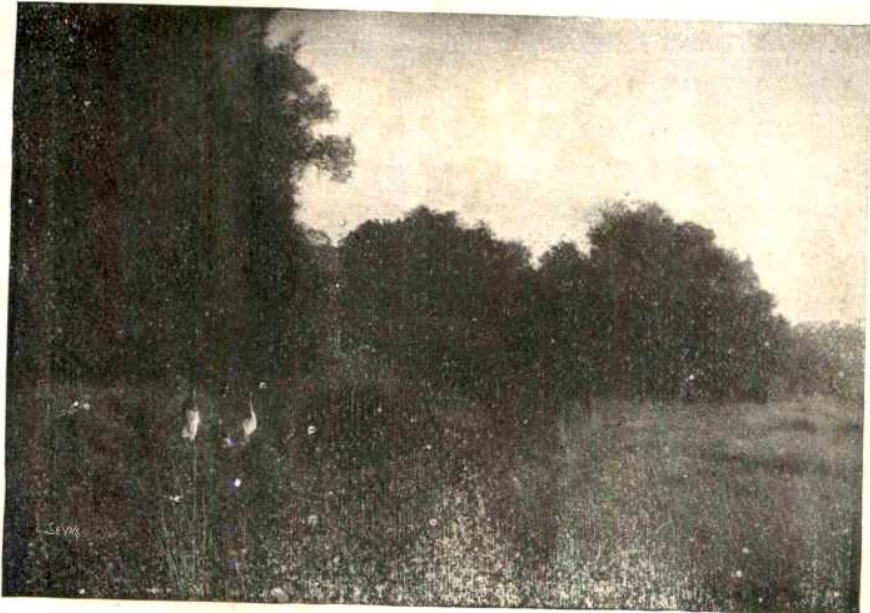
খোদিত লিপিগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দির ছিল। প্রস্তরগুলি জাফর খাঁর সমাধিগাত্রের প্রস্তরসমূহের দ্বারা চিকণ ও কৃষ্ণবর্ণ। ঈষৎ রক্তবর্ণ প্রস্তরসমূহের মধ্যে এ গুলি অত্যন্ত বিশদূষ দেখায়। খোদিত লিপিগুলি হইতে বোধ হয় যে, এই গুলি মন্দিরের উর্দ্ধভাগে সন্নিবিষ্ট প্রস্তরে খোদিত রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্রাবলীর পাদদেশে সংলগ্ন ছিল। মহম্মদীয় ধর্মাদেশে নিষিদ্ধ বলিয়া মনুষ্যাকৃতিকৃতপ্রস্তরগুলি বাদ দিয়া অবশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডগুলি এই সমাধির প্রাচীর নির্মাণকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। মন্দিরের চারিটি দ্বারের মনুষ্য-মূর্তিগুলিও যথাসম্ভব বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু প্রস্তর অত্যন্ত কঠিন বলিয়া সে গুলি এ কাল পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। মণি সাহেবও বলিয়াছেন যে, জাফর খাঁ গাজী ও দরাক্ খাঁ একই ব্যক্তি।* মন্দিরের উত্তর দ্বারের একখণ্ড প্রস্তর, দ্বারের সম্মুখে পতিত রহিয়াছে। মন্দির সংস্কারকালে পরিদর্শন অভাবে ইহা যথাস্থানে বোজিত হয় নাই। বোধ হয় শীঘ্রই হইবে। মন্দিরের পূর্বে রাজপথ, ইহার পর একটি ইষ্টক স্তূপ আছে। প্রবাদ আছে পুরাণোক্ত সপ্তবিগ্গ এই স্থানে বাস করিতেন। জাফর খাঁর সমাধি যে একটি পরিবর্তিত হিন্দুমন্দির তাহার অপর প্রমাণ এই যে, প্রাচীন পুঁথিতে ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থলেই সপ্তর্ষির বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে লোকে যেখানে স্নান করিয়া থাকে তাহা সঙ্গমের উত্তরে। প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গমস্থানে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে স্নান করা উচিত। সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের পূর্বে এই মন্দিরের নিম্নস্থ ঘাটেই স্নানক্রিয়া সম্পন্ন হইত। মুসলমানগণ কর্তৃক মন্দির বিনষ্ট হইলে ব্রাহ্মণগণ

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XVI (1847). PI I.



ত্রিবেণীর মসজিদের মিহরাব, দক্ষিণে দেবমূর্তির পশ্চাদ্ভাগস্থ
আরবীয় অক্ষরে খোদিতলিপি, উপরে পাদপীঠ, বামে
নবগ্রহ মূর্তি—ত্রিবেণী ।

(৮)



সরস্বতীর গর্ভ—সপ্তগ্রাম ।

স্থানভাবে সঙ্গমের উত্তরে স্থানের স্থান নির্দিষ্ট করিতে বাধ্য হন। চারিশত বৎসর পরে ওড়রাজ মুকুন্দদেব বর্তমান ঘাট নির্মাণ করাইয়া দেন। মন্দিরের মণ্ডপ সম্ভবতঃ গৰ্ভগৃহের ছায়া কক্ষ প্রান্তর-নির্মিত স্তম্ভাবলীতে শোভিত ছিল। ইহার কয়েকটি স্তম্ভ এখনও সমাধি ও মসজিদের মধ্যস্থিত ভূখণ্ডে গোপিত আছে। এই স্তম্ভগুলি দেখিতে অনেকটা দিল্লীর কুতুব-মিনারের নিকটবর্তী আলাউদ্দীন খিলজিকর্তৃক নির্মিত মসজিদের অষ্টকোণ স্তম্ভশ্রেণীর ছায়া। মন্দিরের অনতিদূরের মসজিদটি সপ্তগ্রামের একখানি বৃহৎ ইতিহাস বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। মসজিদটি অতি অল্পকাল হইল নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্বে এইস্থানে বহুসংখ্যক মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের খোদিত লিপিগুলি বর্তমান মসজিদে প্রথিত হইয়াছে। এই খোদিত লিপিগুলি হইতে সপ্তগ্রামের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। দুই শ্রেণীর স্তম্ভ ও একটি প্রাচীরের উপর দুই শ্রেণী গম্বুজ নির্মাণ করিয়া বর্তমান মসজিদটি প্রস্তুত হইয়াছে। প্রাচীরগায়ে চারিটি খিলান বা মিহরাব এখনও বিদ্যমান আছে। চারিটি মিহরাব চারি স্ককমের। প্রথমটি ইষ্টক নির্মিত ও ইষ্টক খোদিত নানাবিধ কাককাঠো স্শোভিত। ষাঠার গোড় দেখিয়াছেন, তাহারাই এই খোদিত ইষ্টকের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বঙ্গদেশে প্রস্তরবিহীন বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। অধিকাংশ বঙ্গীয়-ভাস্কর, ইষ্টকেই আপনাদিগের শিল্পশৌর্ভের পরিচয় প্রদান করিতেন। সেই জন্তই বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ মন্দিরের গাত্র অতিমূল্য মনোহর শিল্পকাঠো-শোভিত ইষ্টকে নির্মিত। বঙ্গের মুসলমানরাজগণও এই প্রথা অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদিগের আদেশে নির্মিত কতকগুলি হুর্মা মহার্য ও হুস্ত্রাপ্য প্রস্তরনির্মিত হইলেও অধিকাংশ বঙ্গীয় শিল্পীর নিপুণতা-পরিচায়ক ক্ষুদ্রাকার খোদিত ইষ্টকে নির্মিত। গোড়ে এইরূপ ইষ্টকে মিনার কাজ বা এনামেল দেখা যায়, কিন্তু এই শিল্প এখন এককালীন লোপ পাইয়াছে। বাগেরহাটের খাঁ জাহান আলী কর্তৃক নির্মিত ষাট গম্বুজ মসজিদে এইরূপ মিনা করা খোদিত ইষ্টকের শেষ নিদর্শন দেখা গিয়াছে। বর্তমান কালে খোদাই করা “বাঙ্গালা ইট” ব্যবহার রহিত হইয়া যাইতেছে; বোধ হয় পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে উহা একেবারে লোপ পাইবে। দ্বিতীয় মিহরাবটি প্রস্তরনির্মিত ও দেখিতে বঙ্গদেশীয় কাঠনির্মিত দ্বারের ছায়া। বোধ হয় মন্দিরাজনের দ্বার, পরে মসজিদ-নির্মাণকালে ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বারের তিনদিকে আরবীর ভাবের খোদিতলিপি আছে—

১। উক্ত খোদিত লিপির অনুবাদ।

“এবং আশা করে যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইচ্ছা পূর্ণ হউক ও যেসময় সমাধি হইবে, তখন জৈশ্বর তাহার বিশ্বাস দৃঢ় করিবেন। জৈশ্বর যেন তাহাকে পুরস্কার করেন, কারণ তিনি সত্যই দয়ালু ও দাতা………। স্থাপন করিবায় জন্ত……… এবং বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করা……… নগর মহম্মদ ষাঠাকে বুরহান কাজী (সিংহস্বরূপ) বলিয়া ডাকা হইত।

..... উত্তর জগতের ইচ্ছার..... এই হেতু ঈশ্বর তাঁহার অতি প্রত্যেক বিপদের সময় সন্তুষ্ট হন..... ঈশ্বর ধর্ম প্রচারে..... ধর্ম উচ্চুড় ভিত্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলেও..... দিনে রাজাধিরাজ শ্রেষ্ঠ..... বলা হইয়াছে উৎকৃষ্ট পদে.....

তুর্ক (তুর্ক জাতীয়) সিংহবিক্রম জাকর খাঁ..... বীর সমূহের পরে সর্কাপেক্ষা দয়ালু গৃহনির্মাতা..... রাজজোহী অবিধ্বাসিগণকে থুগ ও ভগ্ন দ্বারা নিহত করিয়া প্রত্যেক..... কোঠাগার হইতে দান করিলেন..... ও সত্যধর্মের শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সন্মান

করা এবং ঈশ্বরের পতাকা উন্নত করিবার জন্য (নির্মিত হইল) হে, থে, সোয়াদ, (৬৯৮ হিঃ)

ভূতীয় মিহরাবুটির গঠন দৃষ্টিমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করে। একখানি প্রস্তরখণ্ডে লুপ্ত প্রায় নবগ্রহ-মূর্তি ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং উণরিভাগে কোন দেবমূর্তির মন্থন কার্যকার্য-শোভিত কুম্ভবর্ণ পাদপীঠ ও বামভাগে কদম্বা ইষ্টকগঠিত মূর্তি দেখা যায়। ইহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুলুঙ্গি (niche) আছে। তাহা খোদিত ইষ্টকে নির্মিত। এই ইষ্টকখণ্ডে পুষ্পহারশোভিত শৃঙ্গলমালার চিহ্ন অদ্যাপি পরিদৃশ্যমান। ইহার পার্শ্বে ইষ্টকনির্মিত আর একটি মিহরাব। ইহার এখন ভগ্নদশা। মন্দিরের সম্মুখভাগ দেখিলে বোধ হয় পূর্বে ইহাতে ছয়টি মিহরার ছিল। মন্দিরের স্তম্ভগুলি দ্বাদশ কোণ খলস্কলাকৃতি, কিন্তু তথাপি ক্ষুদ্র। প্রথমস্তম্ভশ্রেণী ও প্রাচীরের মধ্যদেশে যে দ্বিতীয় স্তম্ভশ্রেণী আছে, তাহার মধ্যভাগের দুইটি স্তম্ভ দ্বাদশ কোণ। অপর চারি স্তম্ভ—চতুর্ভুজ, উত্তর দিক হইতে গণিত

মণ্ড্রানে হইলে দ্বিতীয় স্তম্ভের পারদেপে একশ্রেণী ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাত বৃহমূর্তি

খোদিত আছে। স্তম্ভপীঠের দক্ষিণে চারিটি মূর্তি ও পূর্বে ২টি মূর্তি

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর প্রস্তর ভাস্কর্য গিয়াছে। দ্বিতীয়স্তম্ভশ্রেণী ও প্রাচীরের মধ্যভাগে একটি ইষ্টকনির্মিত খেদীর ভগ্নাবশেষ আছে। মূলমানগণ ইহাকেই মিহার বলিয়া থাকেন। পাণ্ডুর মন্দিরের চিত্রে প্রস্তর নির্মিত এবং দোপানাবলী শোভিত এই-রূপ একটি মিহারের উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয় স্তম্ভশ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয় এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠস্তম্ভের মধ্যদেশে এক একটি নুতন মিহার নির্মিত হইয়াছে। এগুলি দেখিতে অতি কদম্বা, বোধ হয় নীচুই এগুলি ভাস্কর্য দেওয়া হইবে।

বড় গাভীর সমাধির দক্ষিণ দ্বারের পার্শ্বে আরবীয় ভাষায় খোদিত লিপিবদ্ধ একখানি প্রস্তরখণ্ড পতিত আছে। প্রস্তরখণ্ড উল্টাইয়া দেখিলে অপর পার্শ্বে একটি মূর্তির চিহ্ন লক্ষিত হয়। মূর্তিটির পদবর মাত্র বর্তমান আছে। পশ্চাৎভাগে নাগের কুণ্ডলীকৃত দেহ দেখা যায়, উত্তর পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দুইটা দণ্ডায়মানমূর্তি ছিল। এই মূর্তি-

দ্বয়ের চরণাংশ মাত্র বর্তমান। ক্ষুদ্রতর মূর্তিদ্বয়ের পার্শ্বে এক একটি ক্ষুদ্র

মণ্ড্রানে জৈননিদর্শন চতুর্ভুজ ঘট স্থাপিত আছে। প্রত্যেক ঘট হইতে এক একটি লতা

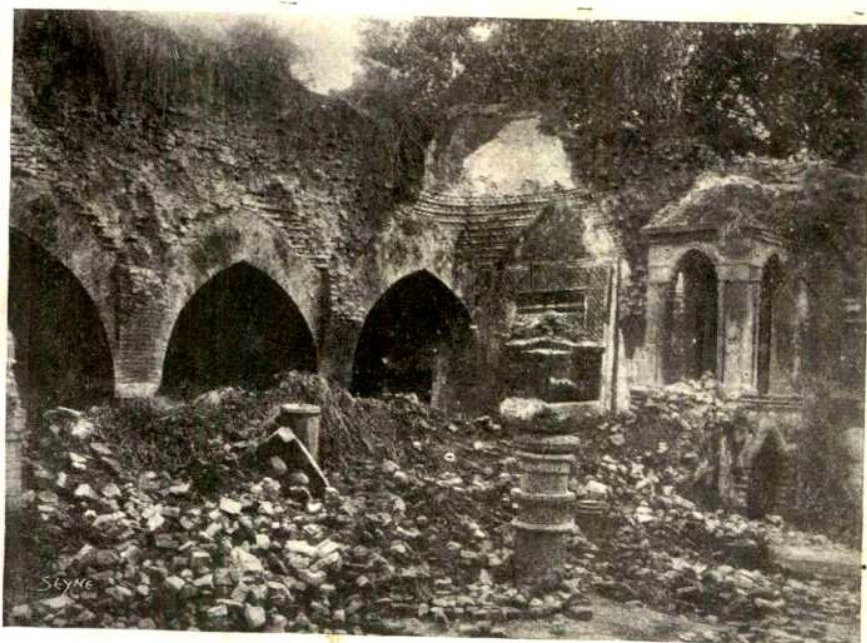
উৎপন্ন হইয়াছে। উর্দ্ধদেশ ভগ্ন হওয়ার মূর্তির বিবর অপর কিছুই জানিবার উপায় নাই।

পাদপীঠে নানা অবস্থায় কুণ্ডলীকৃত বহু সর্প শোভমান। জয়োবিশিষ্ট জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্ব-

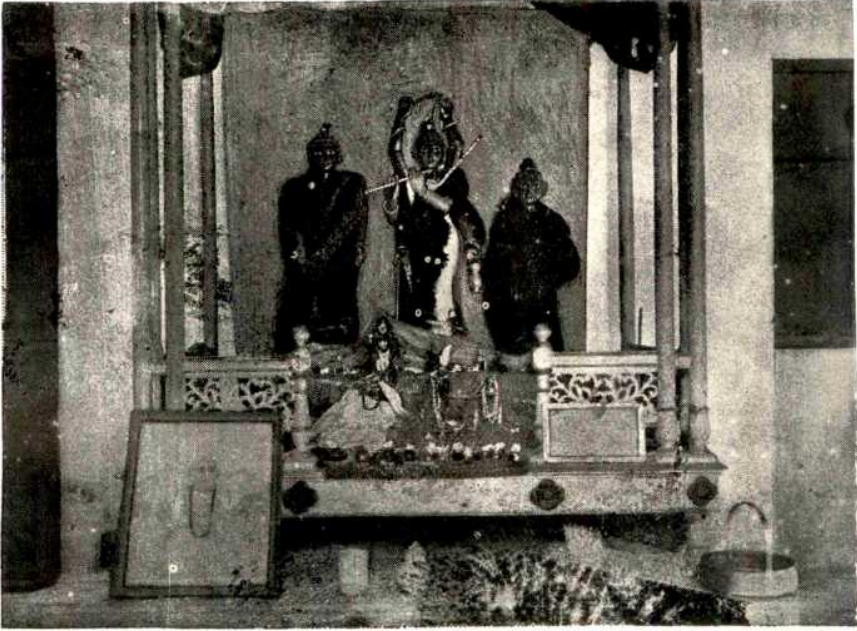


বাইশ দরওয়াজা মসজিদ—পাড়া ।

(১৩)

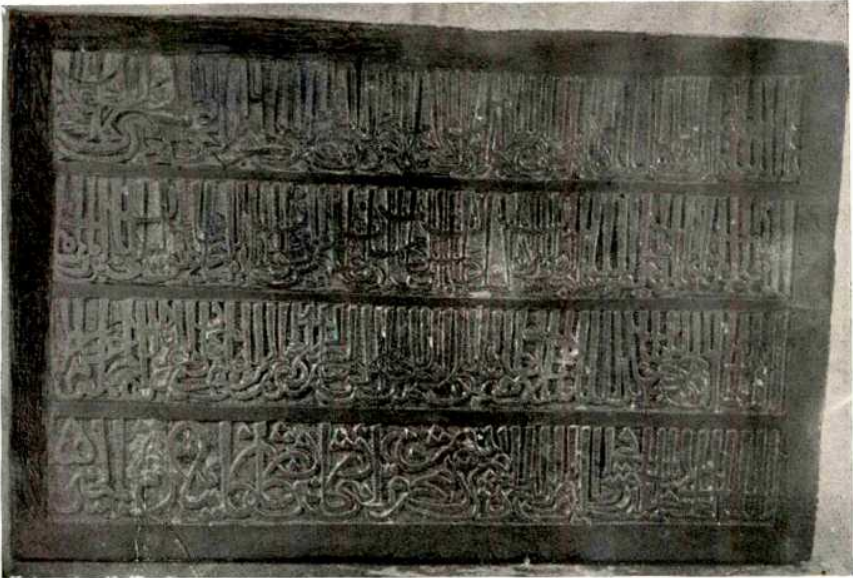


বাইশ দরওয়াজা মসজিদের ভাঙ্গাঅবস্থা মিনার—পাড়া ।



উদ্ধারণ দত্তের মন্দির, ষড়ভূজা মূর্তি ও উদ্ধারণ দত্তের প্রতিকৃতি—সপ্তগ্রাম ।

(১৪)



শমসুন্দর ইউসুফ শাহের খোদিতলিপি—পাটুয়া ।

নাথের মূর্তিতেই নাগগণের অধিক প্রাচুর্য্যব। সপ্তকণাযুক্ত নাগ তাঁহার লাহন। সপ্তগ্রামে জৈনধর্মের প্রাচুর্য্যবের এইমাত্র নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই।

ই-আই রেলওয়ের ত্রিশ-বিঘা টেনেনের এক মাইল উত্তর পশ্চিমে জামালুদ্দিনের সমাধির অনতিদূরে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মন্দির। সুবর্ণবণিক জাতীয় নিত্যানন্দভক্ত উদ্ধারণ দত্তের পরিচয় বোধ হয় কাথাকেও নূতন করিয়া দিতে হইবে না। মুসলমান সমাধিস্থান হইতে একটি প্রাচীন ইষ্টকাচ্ছাদিত রাজবস্ত্র ধারণা পূর্বদিকে কিয়দূর গেলে উদ্ধারণ দত্তের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। উদ্ধারণ দত্তের স্বজাতি-সুবর্ণবণিকগণের চেষ্টায় মন্দিরের নূতন সংস্কার হইয়াছে। বহু অর্থ ব্যয়ে মন্দির, নাটমন্দির, বিগ্রহাধিচারকগণের আবাসস্থান প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু গ্যাসালোকশোভিত হওয়ায় প্রাচীন স্থান মাহাশ্মার

সপ্তগ্রামের সপ্তগ্রামের লাবব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরভিত্তরে কাঠ-বৈকবতীর্থ সিংহাসনোপরি প্রধান বিগ্রহ ষড়্ভুজ গৌরাদেব। চতুর্পার্শ্বে নিত্যানন্দ, গোপাল, মুরলীধর প্রভৃতি মূর্তি, বৃহৎ সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন। মন্দিরাদ্যক শ্রীযুত কালীকুমার দত্ত ভাত্রথও হইতে কণ্ঠিত একখানি মনুষ্যগদাকৃতি দেখাইয়া বলিলেন, "উহা উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পদচিহ্ন।" সিংহাসনের পার্শ্বে একখানি আধুনিক তৈল চিত্র দেখা গেল। শুনিলাম, উহা উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের চিত্র। কালীকুমার বাবুর নিকট বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রস্তরনির্মিত একটি প্রাচীন মূর্তি ছিল। আর চল্লিশ বৎসর পূর্বে ঐ মূর্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ার ভাষা হইতে একখানি তৈলচিত্র গৃহীত হয়। বর্তমান চিত্র উক্ত তৈলচিত্রের প্রতিলিপি। শ্রীযুক্ত নীলেশচন্দ্র সেন মহাশয়, অসম্ভিষ্ট বঙ্গীয় পাঠকের গ্রামের জন্ম উক্ত চিত্র যীশু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে উদ্ধারণ দত্তের চিত্ররূপে প্রকাশিত করিয়াছেন !!! মন্দিরপ্রাঙ্গণে অতি প্রাচীন একটি মাধবীলতা দেখিতে পাইলাম। কথিত আছে, এই মাধবীলতাকুলতলে নিত্যানন্দ বিশ্রাম করিতেন। এই মাধবীলতার কুলটি ব্যতীত, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মন্দিরের প্রাচীনত্বের আর কোন নিদর্শনই দেখা যায় না। মাধবীলতার মূলদেশে একটি নূতন বেদী নির্মিত হইয়াছে। বেদীর উত্তরপার্শ্বে এক একটি নূতন চৈত্য নির্মিত হইয়াছে। চৈত্য ব্যতীত ইহার উপযুক্ত নাম আর কিছুই পাইলাম না। এ জলি ইউরোপীয়গণের সমাধির অন্তরূপে নির্মিত। শুনিলাম একটি উদ্ধারণ দত্তের সমাধি। অপরটি সামন্ত রাধিবার জন্ম নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরাদ্যনের বাহিরে কলিকাতানিবাসী সুবর্ণবণিকগণের আবাসের জন্ম একটি গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

জামালুদ্দিনের সমাধি হইতে গ্রাণ্ট্রোড রোড ধরিয়া উত্তরাভিমুখে কিয়দূর গমন করিলে পশ্চিমাভিমুখগামী একটি প্রাচীন রাজপথ নয়নগোচর হয়। উত্তরপার্শ্বে বিশালকার বৃকসকল পথটিকে সর্বদা ছায়াবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ইষ্টকাচ্ছাদনের রম্যবাসের পাট জন্ম পথের মধ্যে, স্থানে স্থানে খজুরবৃক্ষ ব্যতীত হুঁকাবল মন্দি

জন্মিয়াছে। উভয় পার্শ্বের বনরাজি বেতস্ ও বেত্রলতায় আচ্ছাদিত হইয়া সদাসর্বদা যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আছে। উদ্ধারণ দত্তের মন্দিরের প্রাচীন চৌকীদার বাগদী-জাতীয় এক বৃকসর্দারের মুখে জানা গেল, এই নিবিড় বনमध्ये অত্যন্ত দূরে প্রস্তরনির্মিত এক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে।

রাজপথ বহুদূর গিয়া এক আত্মকাননের ভিতর প্রবেশ করিল। পথে রঘুনাথ দাসের আখড়ার বর্তমান সেবাইতের সহিত সাফাং হইল। আখড়াটি দেখিলে ভক্তির উদ্বেক হয়। ইষ্টকনির্মিত সিংহদ্বার সংস্কারভাবে পতনোন্মুখ। অভ্যন্তরে গোশালা এবং অতিথিশালা প্রভৃতির দ্বিতল গৃহগুলি বৃহদাকার মহীকহের আশ্রয় হইয়াছে। মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্রগৃহে বর্তমান সেবাইত, তাঁহার বৈষ্ণবী ও শিষ্য বাস করিয়া থাকেন। একটি অপেক্ষাকৃত নূতন গৃহে বৈষ্ণবদিগের কয়েকটি মূর্তি স্থাপিত আছে। এই মন্দিরের অপরপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গৃহে তিন ফুট দীর্ঘ দুই ফুট প্রশস্ত শৈবালাচ্ছাদিত একখণ্ড প্রস্তর আছে ও তন্মিমে অতিপ্রাচীন কাঠ-পাছকাষয় পতিত আছে। শুনা গেল, এই প্রস্তরাসনে বসিয়া রঘুনাথ দাস সিকিলাভ করিয়াছিলেন এবং পাছকাষয় তাঁহারই। মন্দিরভ্যন্তরে কতকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি রহিয়াছে। কথোপকথনে বুকিগাম বর্তমান সেবাইত প্রায় নিরক্ষর। তিনি পুঁথি-গুলিতে সচন্দন পুষ্প অর্পণ করিয়াই সন্তুষ্ট। ইহার পশ্চাতেই সরস্বতী নদী। মঠ হইতে নদীগর্ভে অবতরণ করিবার জন্ত সুন্দর ঘাট রহিয়াছে। ঘাটটি দেখিলেই বোধ হয়, যে কালে সরস্বতী নদী দেশবিদেশের বাণিজ্যতরী বক্ষে বহন করিয়া বিদেশীয় ধনরত্ন সপ্তগ্রামের পদপ্রান্তে উপস্থিত করিত, এই ঘাট সেই কালেরই নির্মিত। সুন্দর অতি ক্ষুদ্র ইষ্টক-সুসজ্জিত করিয়া এই বৃহৎ ঘাট নির্মিত। উভয় পার্শ্ব নিবিড় অঙ্গলে আবৃত। মঠবাসিগণ বংশদণ্ড সাহায্যে ক্ষীণনদীবক্ষ পার হইয়া গ্রামান্তরে গমন করিয়া থাকেন। অতি ক্ষীণ নদীর ক্ষীণতর স্রোত ঘাটের প্রান্তদেশে ধৌত করিয়া থাকে। নদীগর্ভের পরিসর প্রায় পঞ্চশত হস্ত। কিন্তু ইহার অধিকাংশই এক্ষণে অরণ্যে আবৃত, স্থানে স্থানে ভূমিরূপে

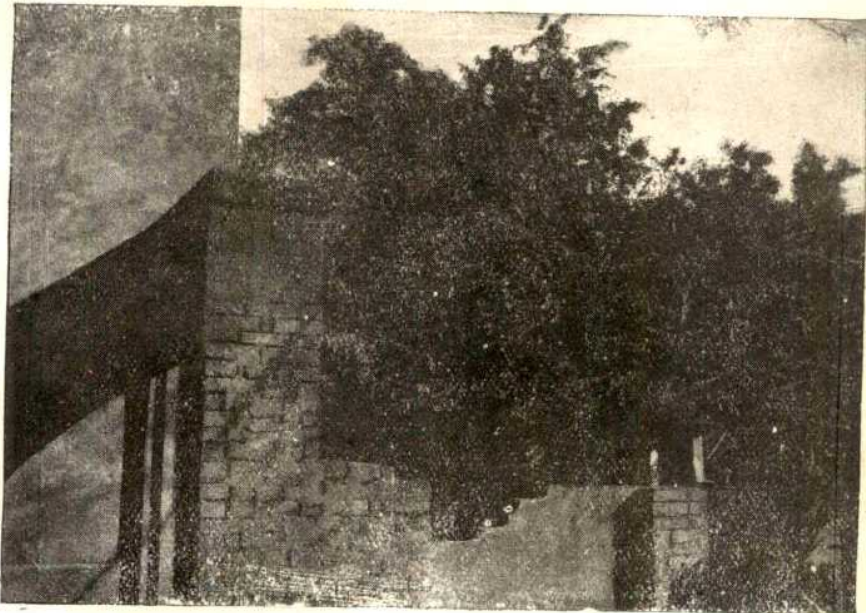
দুর্গ

কর্ষিত হইয়াছে। নদীগর্ভে ত্রিবেণী অভিমুখে কিয়দূরে গমন করিলে সপ্তগ্রামের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রাণ্ডট্রক রোডের সেতু, দুর্গের পশ্চিমোত্তর কোণে নির্মিত। দুর্গের মৃৎস্তূপময় প্রাকারের চিহ্ন এবং পরিখা বাতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। দুর্গের একপার্শ্বে সরস্বতী নদী প্রবাহিতা ছিল, অপর তিন পার্শ্বে গভীর পরিখা শত্রুর আগমন রোধ করিত। এই পরিখার একাংশ এখনও দেখা যায়; ইহা প্রায় বিংশতি হস্ত গভীর এবং বোধ হয় ইহাতে এখনও সর্পদা জল থাকে। ধন বেত্রবনে আচ্ছাদিত পরিখার আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। নদীগর্ভ হইতে অত্যন্ত তৃণ শু দেখিলে এখনও ইহাকে দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। কয়েকখণ্ড প্রাচীন ইষ্টক পাঠান-পরাক্রমের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। সহস্র বৎসর পূর্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতি-

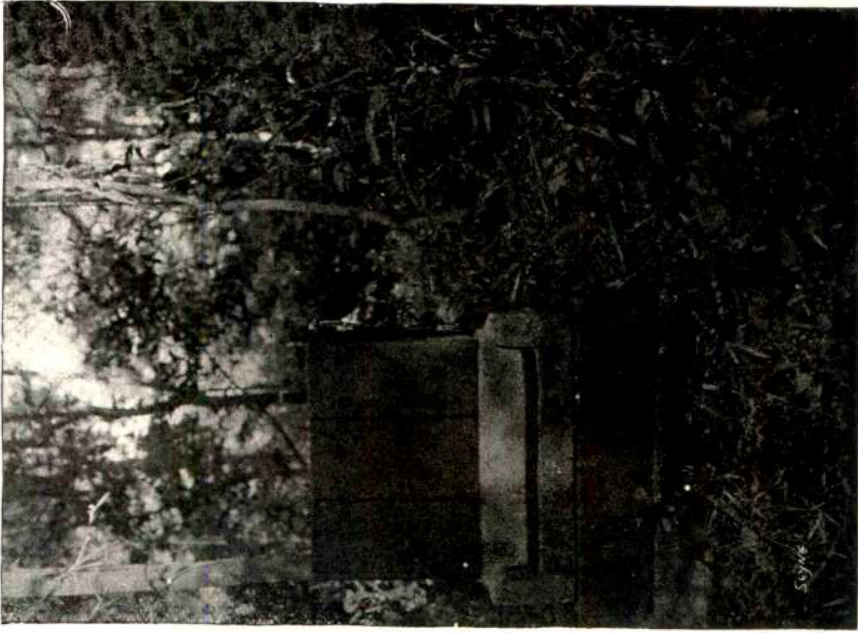


রঘুনাথ দাসের পাট, সরস্বতীর প্রাচীন ঘাট - সপ্তগ্রাম ।

(২)



উদ্ধারণ দত্তের মন্দিরান্তর্গত মাধবীলতা—সপ্তগ্রাম ।

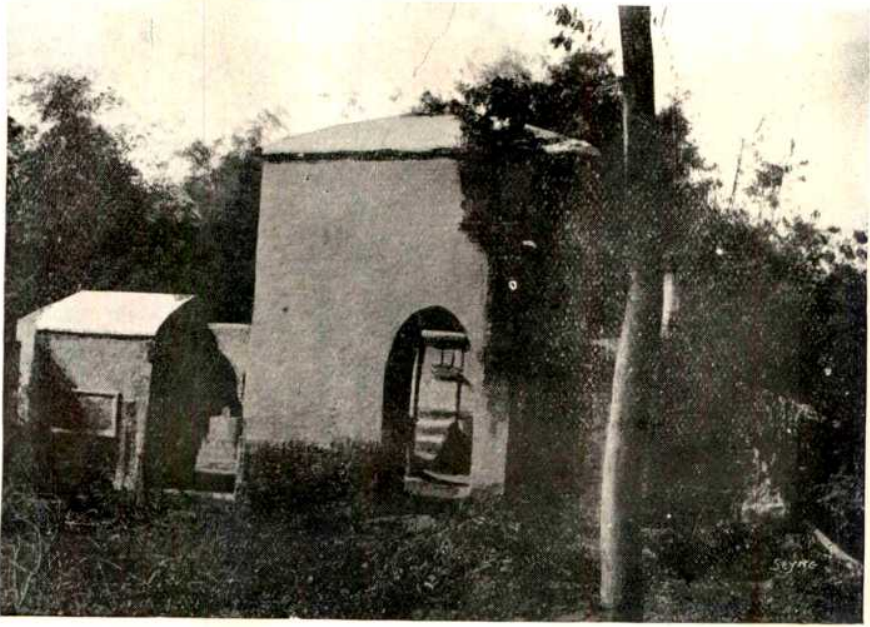


নিবিড় বননধাবর্তী শিলাস্তম্ভের অবশেষ—সপ্তগ্রাম ।

(৬)



ভূগের অবশেষ—সপ্তগ্রাম ।



জমালুদ্দিনের মসজিদের অবশেষ—সপ্তগ্রাম ।

(৪)



জমালুদ্দিন, তাঁহার পত্নী ও দাসের সমাধি সপ্তগ্রাম ।

সমূহের বাণিজ্যতরী, আশ্রমার্থ এই দুর্গপ্রাকারের নিম্নে কালবাণন করিত। সপ্তশত বর্ষ পূর্বে জয়দুপ্ত তুর্কীর বিজয়পতাকা, যে দুর্গশীর্ষে উড্ডীন ছিল, সে দুর্গের আজ এই মাত্র অবশেষ রহিয়াছে। তখনও সুদূর খেতরীপবাসী ইংরাজ-মূর্তি বঙ্গবাসী দেখে নাই কিন্তু মলয়বাসী ও আরবীয় বণিকগণ নির্ভয়ে অর্ণবপোত লইয়া পণ্যসংগ্রহের জন্ত এই বন্দরে আসিত। খাসা সহন ইত্যাদি বস্ত্র ও পীতবর্ণ রেশমের গাত্রবস্ত্র সপ্তগ্রামের বন্দরের প্রধান পণ্য ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, দুর্গপ্রাকারনিম্নে, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বন্দরে চীন, মলয়, যবদ্বীপ, চোড়মণ্ডল, লঙ্কা, মালদ্বীপ, পারস্ত, আরব ও মিশরদেশীয় বণিকগণের পোত আশ্রয় পাইত। এফণে সেইস্থানে গোপাল ও মেঘপালগণ নিশ্চিন্ত হইয়া পণ্ডচারণ করে। সময়ে সময়ে মুসলমানকৃষকগণ অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া 'নবাবী আমলের কেলা ছিল' বলিয়া বনাবৃত মুস্তূপ দেখাইয়া দেয়। এই মৃৎপিণ্ডের উপরে হিন্দু, বৌদ্ধ, তুর্ক, আফগান, মোগল ও পর্তুগীজের রাজত্ব একে একে আসিয়াছে আবার গিয়াছে কিন্তু সকলেই এখানে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বর্তমান রাজার রাজত্বে শৃগাল ও বহুপশু সপ্তগ্রাম দুর্গের কেলাদার হইয়া ইংরাজ-রাজত্বের শাসন রক্ষা করিতেছে।

কোন ঐতিহাসিকযুগে সপ্তগ্রাম প্রথম সমুদ্রের আবাসস্থল হইয়াছিল, কোন সপ্তসংখ্যক গ্রাম একত্র হইয়া প্রথম বাণিজ্য আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই,

ইতিহাস

কখনও যাইবে কিনা সন্দেহ। কোন রাজা সমুদ্রোপকূলবর্তী অরণ্য, সমুদ্রবাসোপযোগী করিয়াছিলেন? গোড়, পোণ্ড বর্দ্ধন, সুবর্ণগ্রাম, স্থাপনিতার নাম যে স্থানে গিয়াছে, সপ্তগ্রাম-স্থাপনিতার নামও সেই স্থানে আছে। কত শত বর্ষপূর্বে সরস্বতীতীরবর্তী নগর পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল, তাহাও কেহ জানে না। বিংশতি শতাব্দী পূর্বে রোমক ঐতিহাসিক ত্রিবেণীর নাম করিয়াছেন; ইহা হইতেই জানা যায় যে, সে সময়েও সপ্তগ্রাম সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং তাহার কত পূর্বে ইহার অভ্যুদয় হয়, তাহা আজ কে বলিয়া দিবে? ইহার পর সহস্রাধিক বর্ষকাল সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। মুসলমানগণকর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ-বিজয়ের শতবর্ষ পরে সপ্তগ্রামের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। শূরবংশীয়, পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে নিশ্চয় সপ্তগ্রামের অস্তিত্ব ছিল, তাহা না হইলে মুসলমান-বিজয়ের শতবর্ষ পরে খোদিত শিলালিপিতে এই স্থানে জেতার গর্বোক্তি দেখিতে পাওয়া যাইত না। পূর্বে যে আরবীয় শিলালিপিটির অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা

সপ্তগ্রামজেতা

জাফর খাঁ

হইতে জানা যায় যে, তুর্কজাতীয় জাফর খাঁ হিজরার ৬৯৮ অব্দে (১২৯৮ খৃঃ) অবিখ্যাসিগণের মৃত্যুক ভল্লবিদ্ধ করিয়া প্রকৃত বিখ্যাসি-

গণকে প্রভূত ধনরাজিদানে ভূট করিয়াছিলেন। অবিখ্যাসিগণের ভল্লবিদ্ধ ছিন্নশিরের উল্লেখ হইতে স্পষ্ট স্মৃত হওয়া যায়, এইদিন দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন বন্দর সুবর্ণগ্রামবাসী সেন-রাজবংশধরের হস্তচ্যুত হইয়া বিজ্ঞেতা মুসলমানের পদনুষ্ঠিত

হইয়াছিল। সেইদিন পূত ত্রিবেণীসঙ্গমের উচ্চ শীর্ষ বিষ্ণুমন্দিরের দেবমূর্তি সকল মুসলমানের অত্যাধাতে ধূলাবলুণ্ণিত হইয়াছিল। সে দিন সপ্তগ্রামে হাণ্ডিকার উঠিয়াছিল; জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি যাকাগীরা লুণ্ঠনলোভে জয়দৃষ্ট বিধর্মীর নির্দম অত্যাধাতে অসহায় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। মুসলমানের শাস্তিময় সমাধিগৃহের ভিত্তিতে মুসলমানের অঙ্গরেই ভাষাকোশে সেই সত্য ঘটনার সাক্ষ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন সুলতান রুক্মুদ্দিন দিল্লীর সম্রাট গিয়াহুদ্দিন বলবনের পৌত্র রুক্মুদ্দিন কৈকায়ুস শাহ, কৈকায়ুস শাহ বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছেন। দিল্লীতে কৈকোবাদ ও কৈয়ুমস নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের অধঃপতনের পর খিলিজীবংশীয় সম্রাটগণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজী তখন দেবগিরির যাদববংশ ও চিতোরের শিশোদীয় বংশ-ধ্বংসে ব্যাপৃত। সেইজন্ত বলবনের বংশধরগণ তখনও নির্কিরোধে বঙ্গসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কৈকায়ুস বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন বগরাশাহের দ্বিতীয় পুত্র। নাসিরুদ্দিন বগরাশাহের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ ময়জুদ্দিন কৈকোবাদ, পিতার জীবিতকালেই সাম্রাজ্য লাভ করেন ও নিহত হন। দ্বিতীয় পুত্র রুক্মুদ্দিন কৈকায়ুস ১২৯২ খৃঃ (হিঃ ৬৯২ অব্দে) বঙ্গদেশে পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। কৈকায়ুসের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ, অল্পমান ১৩০০ খৃঃ (হিঃ ৭০০ অব্দে) বঙ্গরাজ্য লাভ করেন। সপ্তগ্রাম-বিজয়ের এক বৎসর পূর্বে জাফর খাঁ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোটের শাসনকর্তা ছিলেন। দেবকোটের নিকটবর্তী গঙ্গারামপুর গ্রামে আবিষ্কৃত ৬৯৭ হিঃ (১২৯৭ খৃষ্টাব্দে) খোদিত শিলালিপি হইতে জানা যায়, সুলতান রুক্মুদ্দিন কৈকায়ুস শাহের রাজত্বকালে উলগু-ই-আজমু হুমায়ুন জাফর খাঁ বহরাম-ই-গিণ নামক সামন্তের আদেশানুসারে মুলতানের সালাহু জীউ ওয়াল নামক ব্যক্তিবিশেষের তত্ত্বাবধানে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

ত্রিবেণীর খোদিতলিপিতে দৃষ্ট হইরাছে যে, জাফর খাঁ তুরকবংশোদ্ভব। গঙ্গারামপুরের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রকৃত নাম বহরাম-ই-গিন, কারণ ই-গিন তুরক শব্দ এবং হুমায়ুন জাফর খাঁ ইত্যাদি তাঁহার উপাধিমাত্র। নিম্নজাতীয় হিন্দুগণের অনুকরণে এই জাফর খাঁ, এক্ষণে উচ্চজাতীয়া হিন্দু মহিলাদিগেরও পূজ্য এবং কালধর্মবশে গঙ্গাতীর্থে চিরস্মরণীয় দরূফা খাঁ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। জাফর হইতে জাফরা এবং জাফরা হইতে উচ্চারণদোষে দফরা শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে।

ত্রিবেণীর খোদিতলিপিতে জাফর খাঁর একজন অনুচরের নাম পাওয়া যায়। পূর্বে জাফর খাঁর সমাধির পার্শ্বগৃহে বড় গাজীর সমাধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মনি সাহেব বুরহানু কাজি বা বুরখান লিখিয়াছেন,—এখানকার মৃতবল্লী অর্থাৎ জাফর খাঁর সমাধির গাজী বা বড়গাজী সেবাইতগণের কুর্গীনাма বা বংশতালিকায় বড় গাজীর নামান্তর দেখা যায়। কুর্গীনাма অনুসারে বড় গাজীর নাম বুরখান গাজী। অনুমান হয়, খোদিত-

লিপিতে বর্ণিত নাসির মহম্মদ বাহাকে বুরহান কাজি বলিয়া ডাকা হইত, তিনি এবং বুরখান গাজী একই ব্যক্তি। কালক্রমে সেবাইতগণের অবনতির সহিত বুরহান কাজি, বুরখান গাজীতে পরিণত হইয়াছে। বুরহান কাজির সমাধির উত্তর পার্শ্বে একটি খোদিতলিপি প্রথিত আছে। এই খোদিত লিপিটি ছইখণ্ড সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে উৎকীর্ণ। সমাধিনির্মাতার অজ্ঞতাবশতঃ খোদিতলিপির প্রথম খণ্ড পরে ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রথমে স্থাপিত হইয়াছে।

২। উক্ত খোদিত লিপির অনুবাদ।

"যিনি প্রশংসার পাত্র তাঁহার প্রশংসা হউক। দানের কর্তা, মুকুট ও শীলমোহরের অধিকারী, পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়াস্বরূপ, দাতা, সদাশয়, মহাভূতব, সকল জাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, পৃথিবী ও ধর্মের স্বর্ষ্যস্বরূপ (শম্‌শুদ্দিনিয়া ওয়াদ্দিন) জগতের পালনকর্তা, ঈশ্বরের দয়ার বিশেষ পাত্র, সুলেমানের রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজা আবুল মুজফের ফিরোজ শাহ্ সুলতান, ঈশ্বর সর্বদা তাঁহার রাজ্য রক্ষা করুন। তাঁহার রাজত্বকালে দয়ার গৃহ নামক এই বিতালয় মহাভূতব খাঁ, সম্মানিত দাতা, প্রাণসাযোগ্য দানবীর, সদাশয়, ইম্‌লান্দধর্মের ও মানবজাতির সাহায্যকারী, সত্য ও ধর্মের ধুমকেতুস্বরূপ, রাজা ও রাজ্যাধিকারিগণের সহায়স্বরূপ, সত্যবিশ্বাসিগণের অভিভাবকস্বরূপ খাঁ মহম্মদ জাফর খাঁ, ঈশ্বর তাঁহাকে শত্রুগণকর্তৃক জয়ী করিলেন (অর্থাৎ শত্রুগণ পরাভূত হইয়া তাঁহার জয়ের কারণস্বরূপ হইল) ও তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট ফিরাইয়া আনিলেন..... তাঁহার আদেশে নির্মিত হইল।" ৭১৩ হুঃসরের সহিত সম্বন্ধ মহরর নাসের প্রথম দিবস (২৮শে এপ্রিল, ১৩১৩ খৃঃ, ৭২০ বঙ্গাব্দ)।

এই খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, সপ্তগ্রাম জয়ের পর পঞ্চদশবৎসরকাল পর্যন্ত বিজ্ঞতা জাফর খাঁ শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। শম্‌শুদ্দিন ফিরোজশাহের পুত্র শিহাবুদ্দিন বগরাশাহ্ দিল্লীর-অবীনতা স্বীকার করেন; তাঁহার ভ্রাতা বাহাউর শাহ্ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলে সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলকের শরণাপন্ন হন (১৩২০ খৃঃ)। ১৩২১ খৃষ্টাব্দের (৭০৮ বঙ্গাব্দের) পর বাহাউর শাহের ভ্রাতা নাসিরুদ্দিন সম্রাটকর্তৃক লক্ষণাবতীর শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন। পরে শিহাবুদ্দিন ও নাসিরুদ্দিনের প্ররোচনায় সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলক বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। সম্রাট তাঁহার পোষাপুত্র ভাতার খাঁকে বাহাউর শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধের পর বাহাউর শাহ্ বন্দীভাবে দিল্লীতে নীত হন। জিয়াউদ্দিন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, এই সময়ে বঙ্গদেশ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর সম্রাট মহম্মদ তোগলক ইজুদ্দিন-য়া-হিয়া আজম্-উলমুন্ক নামক একব্যক্তিকে সপ্তগ্রাম শাসনের ভার অর্পণ করেন। ইনি ৭২৪* হইতে ৭৪০ (১৩২৩ ১৩৩৯ খৃঃ, ৭৩০-৭৩৬ বঙ্গাব্দ) হিজ্রি

* সম্‌খাব-উৎ-তওয়ারিখ—২২৬৩০ পৃঃ।

পর্যন্ত সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। পরে বঙ্গে নতুন স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সহিত সপ্তগ্রাম ইলিয়াস শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে। মজ্জাট্ মহম্মদ ভোগলকের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামে মুদ্রাধ্বজ (টীকশাল) প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মিউজিয়মে ৭২৯ হিজ্রিতে (১৩২৮ খৃঃ, ৭৩৫ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত সপ্তগ্রামের মুদ্রণশালায় মুদ্রা আছে। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দের (৭৫৪ বঙ্গাব্দ) পর শম্শুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বঙ্গে স্বাধীনতা লাভ করেন। তদীয় পুত্র আবুল মুজাহিদ সিকন্দর শাহ রাজ্যলাভ করেন। সপ্তগ্রামের মুদ্রাধ্বজে ৭৮১ ও ৭৮৩ হিজ্রায় (১৩৭৯ ও ১৩৮১ খৃঃ, ৭৮৬ ও ৭৮৮ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত সিকন্দরশাহী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সিকন্দর শাহের পর তৎপুত্র আজম শাহ সপ্তগ্রামে ৭৯০ হিজ্রায় (১৩৮৮ খৃঃ, ৭৯৫ বঙ্গাব্দ) মুদ্রাধ্বজ করিয়াছিলেন। ভাটুরিয়ার রাজা কংস বা গণেশকর্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত সুলতান বায়াজিদেব সপ্তগ্রাম মুদ্রণশালায় কোন মুদ্রা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কংস বা গণেশের পুত্র স্বধর্ম্যত্যাগী বহু বা জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামের মুদ্রণশালায়, ৮২১ হিজ্রায় (১৪১৮ খৃঃ, ৮২৫ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুলতান ইলিয়াস শাহের বংশের পুনরুত্থানের সময় বোধ হয় সপ্তগ্রামের মুদ্রণশালা কিয়ৎকাল বন্ধ ছিল। ইহার পর সের শাহের সময় পুনরায় সপ্তগ্রামের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। ইলিয়াস শাহের বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদের একটি শিলালিপি সপ্তগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ৮৬১ হিজ্রায় (১৪৫৮ খৃঃ, ৮৬৫ বঙ্গাব্দ) তরবিয়ৎ খাঁ নামক একব্যক্তি সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে সপ্তগ্রামে একটা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপি এক্ষণে ত্রিশবিঘা-গ্রামে জমালুদ্দিনের সমাধির একপ্রান্তে পতিত আছে। চিত্রে জমালুদ্দিনের সমাধির পশ্চাতে যে ছিদ্রময় প্রস্তরখণ্ড দেখা যাইতেছে, উহাই নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহের খোদিতলিপি।†

৩। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে লোক তাঁহাকে শেষ দিনেও বিশ্বাস করে এবং নিরমিতরূপে প্রার্থনা করে ও বিধি অনুসারে দান করে, একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় করে না, সেই লোকই ঈশ্বরের জন্ত মসজিদ নির্মাণ করিবে। এক্ষণ লোক সন্তোষবান্বিত-গণের মধ্যে অন্ততম। এবং যাহার জ্যোতিঃ সর্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়াছে ও যৎকৃত উপকার সর্বসাধারণে ভোগ করিয়া থাকে, তিনি বলিয়াছেন, সকল মসজিদের অধিকারী ঈশ্বর; তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে ডাকিও না। এবং প্রেরিত (পরগম্বর) বলিয়াছেন, ঈশ্বরের আলীর্বাদ তাঁহার, তাঁহার বংশের ও তাঁহার মজিগণের উপরে থাকুক। যে লোক সংসারে মসজিদ নির্মাণ করে, ঈশ্বর তাহার জন্ত স্বর্গে একটা গৃহ নির্মাণ করিবেন।..... তাঁহার দ্বারা যিনি দয়ালু ঈশ্বরের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন.....

† Journal of the Asiatic Society of Bengal 1870, p. and 1873, p. 270.

জমাণ এবং সাক্ষীদ্বারা ইসলামধর্ম ও মুসলমানগণের সাহায্যকারী নাসিরুদ্দীন নীরাওয়াদিন আবুল মোজাফর মহম্মদ শাহ্ সুলতান;—ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন ও তাঁহার অবস্থা উন্নত করুন। মহামুভাব, উন্নত এবং তব্বিত খাঁ এই উপাধিতে পরিচিত, তিনি এই মসজিদ নির্মাণ করিলেন.....ঈশ্বর তাঁহার বিশাল দয়া ও সজ্জনয়তায় তাঁহাকে সংসারের শেষকালজ পাপ হইতে রক্ষা করুন। সন ৮৩১।

এই খোদিতলিপি ব্যতীত তব্বিত খাঁর নাম অপর কোন স্থানে পাওয়া যায় নাই। সুলতান্ নাসিরুদ্দিন মহম্মদের রাজত্বকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মালিক রুকনুদ্দিন বার্বক্ শাহ্ তলীয় অনুচর ইক্‌রার খাঁ কর্তৃক সপ্তগ্রামে এক মসজিদ নির্মাণ করান। ইক্‌রার খাঁর অনুচর আজমল খাঁ মসজিদ নির্মাণের ভার প্রাপ্ত হন।

১। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন, মসজিদসকল ঈশ্বরের সম্পত্তি, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা করিও না। সুবিচারক, দাতা, বিজ্ঞ, হুদাফ, সুলতান-মহম্মদ শাহের পুত্র বার্বক্ শাহের রাজত্বকালে, তারিখ ৮৬০ অব্দের মহরম মাসের প্রথম তারিখে, মহামুভাব খাঁ সম্রাট ওমরাহ্ রাজ্যন্তঃপুররক্ষী সম্রাট ওমরাহ্ ইক্‌রার খাঁ, (সর্বদাই তাঁহার মহত্ব থাকুক), তাঁহার মৈত্রাদ্যক্ষ মাজলা মনখাবাদ জেলার ও লাওলা নগরের উজির ও মৈত্রাদ্যক্ষ উলুগ্ আজমল খাঁ, (ঈশ্বর তাহাকে উত্তম জগতে রক্ষা করুন).....তাঁহার আদেশে এই মসজিদ নির্মিত হইল।

ইক্‌রার খাঁ সপ্তগ্রাম হইতে ৮৬৫ হিজরায় দেবকোট পরগণার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। দিনাজপুরে দুইটি আবিষ্কৃত খোদিত লিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটি হইতে জানা যায় যে, বারবক্ শাহের রাজত্বকালে ইক্‌রার খাঁর আদেশে নির্মিত একটি মসজিদ ও তৎপার্শ্ববর্তী সমাধি ৯৬৫ হিজরায় জোড় ও বরুর পরগণার জঙ্গিদার ও সিক্দার উলুগ্ নসরত খাঁ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল। অল্পমান হয়, সপ্তগ্রামে আসিবার পূর্বেও ইক্‌রার খাঁ দেবকোট পরগণায় ছিলেন; কারণ ৮৬০ হিজরায় ইক্‌রার খাঁ সপ্তগ্রামে ছিলেন, ইহার পর তিনি দেবকোট পরগণায় যে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, ৮৬৫ হিজরায় পূর্বে নিশ্চয়ই তাহার সংস্কার আবশ্যক হয় নাই। ইহা হইতে অল্পমান হয়, সপ্তগ্রামের শাসন-কর্ত্ত-পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বেও ইক্‌রার খাঁ দিনাজপুরে ছিলেন, বরুর পরগণা অত্যাধি ঐ নামেই পরিচিত আছে। জঙ্গিদার ও শিক্দার উপাধি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে ইহাদের প্রকৃত কার্য্য কি ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। দিনাজপুরের অন্তঃপাতী পল্লীতলা থানার নিকটস্থ মাহীগঞ্জ গ্রামে, দ্বিতীয় খোদিত-লিপিটি আবিষ্কৃত হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, বারবক্ শাহের রাজত্বকালে উলুগ্ ইক্‌রার খাঁর আদেশে আশরফ খাঁ কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। (৮৬৫ হিঃ ১৪৬০ খৃঃ অঃ)। সুলতান্ রুকনুদ্দিন বার্বক্ শাহের রাজত্বকাল-স্থির নির্ণয় করা যায় না; তবে রঙ্গপুরের কাঁটাঘর নামক স্থানের শাহ ইস্‌মাইল গাজীর সমাধি রক্ষণগণের নিকটে

বৈপুখি আছে * তাহা হইতে জানা যায় যে, ৮৭৮ হিজরায় (১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে) বারবক্ শাহ জীবিত ছিলেন।

৮৭৯ হিজরায় বারবক্ শাহের পুত্র ইউসুফ্ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেকের নয় বৎসর পরে সমুদ্রাশয়ের উপকণ্ঠবর্তী পাণ্ডুরা নগরীর বিখ্যাত মন্দির-গুলির ধ্বংস হয়। এক্ষণে পাণ্ডুরায় দুইটি মস্জিদ ও একটি অত্যুচ্চ মিনার ব্যতীত আর কিছুই নাই, কিন্তু কালে মস্জিদগুলি ধ্বংস হওয়ায় প্রাচীন হিন্দু-কীর্তির নিদর্শনগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মিনারের প্রবেশদ্বার যে হিন্দু-মন্দির হইতে লুপ্তিত উপকরণের দ্বারা নির্মিত, তাহা আর এখন গোপন রাখিবার উপায় নাই। উক্ত দ্বারের প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটি স্তম্ভ আছে; এই স্তম্ভগুলি মিনারের সম্মুখবর্তী ২২ গজি মস্জিদের অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভগুলির অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত মিনারের অপর সমুদয় অংশই ইষ্টক নির্মিত। মিনারটী সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশে সংস্কৃত হইয়াছে। মস্জিদদ্বয়ের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। মস্জিদদ্বয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার প্রাচীর ইষ্টক নির্মিত, কিন্তু অভ্যন্তরস্থ সজ্জা বহুমূল্য কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত। বাইশ গজি বা বাইশ দরওয়াজা মস্জিদের অভ্যন্তরে তিন পংক্তি-কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্মিত সুন্দর কারুকার্য খচিত স্তম্ভ আছে, কিন্তু চিত্রে দেখিতে পাইবেন যে, স্তম্ভগুলি আকারে এক নহে ও শিল্পকার্য নানারূপ। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নানা স্থান হইতে স্তম্ভগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এই মস্জিদে একটা প্রস্তরময় মিম্বার বা বেদী আছে। উহা দেখিলেই বোধ হয় যে, উহা একটা ক্ষুদ্র হিন্দু মন্দির। মিম্বারে উঠিবার সোপানাবলীও প্রস্তরনির্মিত ও শিল্পকার্যে শোভিত। বাইশ গজি মস্জিদের সম্মুখে সরকারী রাস্তার অপর পার্শ্বে আর একটা মস্জিদ আছে। এই মস্জিদে একখানি খোদিত লিপিবৃত্ত শিলাখণ্ড প্রোথিত ছিল, উহা স্থানান লুপ্ত হইয়াছে, এই মস্জিদের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি এখনও লোকে ইহাতে প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহা আর কিছু কাল অসংস্কৃতাবস্থায় থাকিলে এক কালে ভূমিসাৎ হইবে। খোদিত লিপিবৃত্ত শিলাখণ্ড কয়েক বৎসর পূর্বে স্থানচ্যুত হওয়ায় মস্জিদের সম্মুখস্থ শাহজুফি নামক গীরের সমাধি পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছে। খোদিত লিপিটী যে প্রস্তরখানিতে খোদিত উহার অপর দিকে একটা দণ্ডায়মান সূর্য্যমুখি আছে। ঐ মূর্তির পাদদেশের পশ্চাদ্ভাগে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

*। খোদিত লিপির অনুবাদ।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কহিয়াছেন, মস্জিদসকল ঈশ্বরের সম্পত্তি; সুতরাং ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রার্থনা করিও না এবং ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই সংসারে একটা মস্জিদ নির্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্ত অত্র জগতে ৭০টা গৃহ-নির্মাণ

* ইহা একখানি পার্শি পুথি। ইহা শাহজাহাব রাজদকালে রচিত হইয়াছিল। ইহার নাম রিসালৎ-উস-স্তহান। Journal of the Asiatic Society of Bengal 1874 pt I. p. 215

করিবেন। এই মসজিদ জগৎপতি জৈশের দৈব সাহায্য প্রাপ্ত প্রমাণ ও সাক্ষীদ্বারা দৈবের প্রতিনিধি রাজপুত্র ও রাজপৌত্র জুলতান মহম্মদ শাহের পৌত্র জুলতান বারবক্ শাহের পুত্র সমসুদ্দিন আবুল মুছাফর ইউসুফ্ শাহ; জৈশর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব স্থায়ী করুন.....তাঁহার রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। মজলিস্‌গণের মজলিস্‌ মর্কোচ্চ মর্কসম্মানিত মজলিস্‌ অসি ও লেখনীর প্রভু, সেই সময় ও যুগের বীর, উলুগ্‌ মজলিস্‌ আজম (জৈশর তাঁহাকে উভয় জগতে রক্ষা করুন) মহরম মাসের প্রথম দিবসে বুধবারে ৮৮২ সালে (নির্মিত হইল) সমাপ্ত হইল।

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, সপ্তগ্রাম জায়ের প্রায় ২০০ বৎসর পরে পাণ্ডুরা মুসলমান-গণের পদানত হইয়াছিল। স্বর্গ্যমূর্তির পাদপীঠ অতি সুদর্শন। দেবতার পদদ্বয় অত্যুচ্চ চর্মপাত্রকা সমৃদ্ধ, পাদদ্বয়ের অভ্যন্তরে বলগাহস্তে সারথি অরুণ উপবিষ্ট ও একপার্শ্বে ছায়া ও অপর পার্শ্বে উষা দণ্ডায়মান। কোন কোন মতামুসারে ইহারা স্বর্ষ্যপত্নী। ছায়া ও উষার পার্শ্বে আলীচ ও প্রত্যালীচ পদে ক্রীগণ শরভাগ করিতেছে। ইহারা শরস্বরূপ স্বর্ষ্যরশ্মি দিগ্‌দিগন্তে প্রেরণ করিতেছে। এরূপ কিরণকিকরী মূর্তি অত্র সকল স্বর্গ্যমূর্তিতেও দেখা যায়। সর্বশেষে একপার্শ্বে লেখনী ও মস্তাধার হস্তে দেবগুরু বৃহস্পতি ও অপর পার্শ্বে খজা ও যষ্টিহস্তে শনৈশ্চর দণ্ডায়মান আছেন। মূর্তির উপরিভাগ কিরূপ ছিল, তাহা বলা কঠিন। তবে সাধারণতঃ স্বর্গ্যমূর্তিসমূহ দ্বিহস্ত ও উভয় হস্তেই সনালোৎপল থাকে, এ মূর্তিটিও তক্রূপ ছিল বলিতে পারা যায়। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুরার দেবমন্দিরগুলি বিনষ্ট হয় ও ভগ্নাবশিষ্ট উপকরণ লইয়া মসজিদদ্বয় ও মিনার নির্মিত হয়। পাণ্ডুরা যে পাঠানরাজত্বকালে এবং তৎ পূর্বকালেও অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল, মসজিদদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষেই তাহার প্রচুর প্রমাণ দেখা যাইতেছে। পাণ্ডুরা টেনন হইতে মসজিদ পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও দীর্ঘিকায় পরিপূর্ণ। বহুমূল্য ছলিত কারুকার্য শোভিত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত মন্দিরসমূহে কেবলই যে এই একটি স্বর্গ্যমূর্তি মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল না, এরূপ অনুমান অমূলক নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে মসজিদের সন্মুখস্থ একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে একটি হিন্দুমূর্তির কয়েকটি অঙ্গ পক্ষমণ্ডে পাওয়া গিয়াছিল। শ্রবজীবিগণ রক্ষণার্থ চুল্লী নির্মাণকালে এই অঙ্গগুলি ব্যবহার করিয়াছিল। শাহ্‌ সুফির আস্তানার বর্তমান খাদিম অনুগ্রহপূর্বক সে গুলি আমাদেরকে দান করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের নুতন গৃহ নির্মিত হইলে, এইগুলি প্রদর্শিত ও তথায় রক্ষিত হইবে। খণ্ডগুলি যোজনা করিয়া দেখা গেল যে, এই গুলি একটি বিষ্ণুমূর্তির অঙ্গ। একপার্শ্বে তিনখণ্ড প্রস্তর যোজনা করিয়া সনালগম্বহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি ও তদপেক্ষা বৃহত্তর বিষ্ণুমূর্তির গদা ও শঙ্খধারী হস্তদ্বয় স্পষ্ট হইয়াছে। অপর পার্শ্বে দুইখণ্ড প্রস্তর যোজনা করিয়া বীণাপাণি দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, মৌর ও বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মন্দির ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে শাহ্‌জাদিন্-ইউসুফ্‌ শাহের আদেশে মজলিস্‌

উল্ মজলিস্ উপাধিধারী সেনাপতি কর্তৃক বিনষ্ট হইল। এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম জানিবার কোন উপায় নাই। পূর্বে সপ্তগ্রামবিজেতা জাফরের নাম ও উপাধি দেখিলে বোধ হইবে উহা বিভিন্ন ব্যক্তির নাম। বস্তুতঃ মোগল বিজয়ের পূর্ববর্তী মুসলমান অমাত্যগণের প্রকৃত নাম পাওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। তাহাদিগের অধিকাংশই মজলিস উপাধিধারী। যথা—মজলিস্ উল-মজলিস্, মজলিস্‌মুন্নর ইত্যাদি। শম্‌সুদ্দিন-ইউসুফ শাহের পর তৎপুত্র সিকন্দর শাহ্ সিংহাসন আরোহণ করেন, ইনি উন্মাদ রোগগ্রস্ত ছিলেন। হাবসী ক্রীতদাসগণ অভিষেকের দিবসেই তাহাকে হত্যা করে। ইহার পর সুলতান নাসিরুদ্দিন মহমুদ শাহের পুত্র সুলতান্ জালালুদ্দিন ফতেশাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান্‌মহমুদ বলেন, ইউ-সুফ শাহ্ ফতেশাহের পিতা; কিন্তু খোদিতলিপি ও মুদ্রা হইতে জানা যায়, ফতেশাহ্ মহমুদশাহের পুত্র ও ইউ-সুফ শাহের খুল্লতাত। ফতেশাহের একটা খোদিতলিপি ত্রিশবিধা গ্রামে জমালুদ্দিনের সমাধির পার্শ্বে পতিত আছে। যথা—

৬। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, মসজিদ সকল ঈশ্বরেরই স্মরণার্থে ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও নিকট প্রার্থনা করিও না, ও পরগণার বলিয়াছেন, (তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত হউন) এই পৃথিবীতে যে ঈশ্বরের জন্ত একটি মসজিদ নির্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্ত স্বর্গে একটি গৃহ নির্মাণ করিবেন। এই মসজিদ দাতা ও সুবিচারক রাজা সুলতান মহমুদ শাহের পুত্র জালালুদ্দিন আবুল মুজাফর ফতেশাহের রাজত্বকালে (ঈশ্বর তাহার রাজত্ব রক্ষা করুন) নির্মিত হইল। সেখানী ও অসির প্রভৃ উলুগ মজলিস্ তুর সাজলা মনখাবাদের ও বিখ্যাত নগর সিমলাবাদের সৈন্যধ্যক্ষ ও উজির এবং লাওবালা ও মিহিরবক্ থানার ও হাদিগড় জেলা ও মহালের সৈন্যধ্যক্ষ; (ঈশ্বর তাহাকে উভয় জগতে রক্ষা করুন) কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হইল। তারিখ মহরম মাসের চতুর্থ দিবস সাল ৮৯২ হুর্দল দাস আখন্দ মালিক কর্তৃক লিখিত হইল।

এই খোদিতলিপি অনুসারে মজলিস্‌মুন্নর ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন, ইহার নাম অপর কোন খোদিত লিপিতে পাওয়া যায় নাই। ঐ বৎসরেই সুলতান জালালুদ্দিন ফতেশাহ হাবসী ক্রীতদাস বারবকের হস্তে নিহত হন। এই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান বারবক শাহ্ হাবসী ক্রীতদাসগণকে বিখ্যাসী জ্ঞানে শরীর রক্ষার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে ইহাদিগের সংখ্যাধিক্যবশতঃ ইহারা অত্যন্ত বলবান্ ও দুর্দান্ত হইয়া উঠে। রোমক খ্রিষ্টোনিয়ান সৈন্যদলের ভ্রায় ইহারা উপর্যুপরি কয়েক জন সম্রাটকে নিধন করিয়া পরে আপনাদের দলপতিগণকে সিংহাসনে স্থাপিত করে। সুলতান সিকন্দর শাহ্ ও সুলতান ফতেশাহ্ ইহাদের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। পরে ইহারা স্বীয় দলপতি মালিক বারবক্ মালিক আদিল প্রভৃতি হাবসীগণকে সিংহাসনে স্থাপন করে। সাত বৎসরের মধ্যে চারিজন

দলপতি নিহত হন। নিষ্ঠুর হাবসীগণের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বঙ্গীয় হিন্দুরাজগণ ও মুসলমান অমাত্যগণ একমত হইয়া শেষ হাবসীরাজা মুজফরশাহের মন্ত্রী নৈয়দ হুসেনের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হন। এই সময়ে বাঙ্গালার মুসলমান রাজগণের ক্ষমতা গোড়ের দুর্গ-প্রাকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হুসেনশাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার চারিবৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে মুজাফর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পরে হুসেন শাহ বঙ্গদেশে একাধিপত্য লাভ করেন, হুসেন শাহ সকল অনর্থের মূল। তিনিই হাবসীগণকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। সপ্তগ্রামে হুসেন শাহের রাজ্যকালের তিনটি খোদিতলিপি অবিকৃত হইয়াছে। এই তিনটি ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর মসজিদের প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন আছে—১। এই খোদিতলিপিটি জাফর খাঁর মসজিদের দক্ষিণপ্রান্তের মিহরাবের পাশে সংলগ্ন আছে।

২। খোদিত লিপির অস্থান।

ঈশ্বর দয়ালু.....স্বগমাপ্ত হউক। দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি। ঈশ্বর ধন্য হউন। সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা যেরূপে জন্মদাতা.....তাহাকে ধন্যবাদ, সমগ্র রাজ্য তাঁহার হস্তে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাবান্ তিনি জন্মমূর্ত্তার সৃষ্টিকর্তা, তোমরা তাঁহার আদেশমত সংকার্য্য কর। তাঁহাকে ধন্যবাদ, যিনি নিজের দাসের নিকট জগৎকে ভয় দেখাইবার জন্ত কোরাণ পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ, যিনি ইচ্ছা করিলেই তোমাদের মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ।.....সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা। সপ্ত আকাশ ও তাহার ভিতর বাহা কিছু আছে তৎ সকলের ঈশ্বর। সপ্ত-পৃথিবী ও তাহার মধ্যে যত কিছু আছে তাহার ঈশ্বর.....মহম্মদ ও তাহার পরিজনবর্গের প্রতি ঈশ্বরের দয়া হউক.....স্বর্গে নরক হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন.....তুমি দাতা ও দয়ালু.....স্ববিচারক ও দাতা আলাউদ্দিন আবুল মুজাফর হোসেন শাহ—ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব ও রাজ্য রক্ষা করুন।

সর্বোচ্চ খাঁ ও সর্বশ্রেষ্ঠ খাঁকাণ জগৎ ও কালের বীর উলুগ মসনদ হিন্দু খাঁ সাজলা ও মনখাবাদ হোসেনাবাদের সৈন্যধ্যক্ষ ও উজির এবং লাওবলা ও মনখাবাদ থানার সৈন্যধ্যক্ষকর্তৃক এই সেতু নির্মিত হইল তারিখ ৯১১ হিঃ।

গঙ্গা ও সরস্বতীসঙ্গমের অনতিদূরে এই সেতুর একটি খিলান অষ্টাঙ্গি দণ্ডায়মান আছে। খোদিতলিপিটি সম্ভবতঃ সেতুর ধ্বংস হইলে মসজিদ মধ্যে আনীত হইয়াছিল। সেতুনির্মাতা উলুগ মসনদ হিন্দু খাঁ কালাপাহাড়ের জায় যবনধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীতে সেতুনির্ম্মাণের অষ্টাবিংশবর্ষ পরে মসনদ খাঁ কালনার শাসনকর্তা ছিলেন। হুসেন শাহের পৌত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ৯৩৯ হিজরা (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ৯৪০ বঙ্গাব্দে) উলুগ মসনদ খাঁ কর্তৃক কালনায় একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মসনদ খাঁ সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

২। চিত্রে মসজিদের যে মিহিরাবের আকৃতি দর্শিত হইল, তাহার দক্ষিণপার্শ্বে, একটি দেবমূর্তির পশ্চাত্তাগে দ্বিতীয় খোদিতলিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে পাঠোদ্ধার করিবার আর কিছুই নাট, কালক্রমে প্রায় সমুদয় খোদিত লিপিটাই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। মধ্যভাগে “আবুল মুজফর হুসেনশাহা খলদা-আল্লাহো” বহুকষ্টে পাঠ করা যায়।

৩। হুসেন শাহের তৃতীয় খোদিতলিপিটি পূর্বোক্ত মিহিরাবের উত্তর পার্শ্বে প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৮। খোদিত লিপির অনুবাদ।

হে ঈশ্বর! এ জগতে ও ভবিষ্যৎ লোকে আমাদিগকে মহাশাস্তি প্রদান করুন। ঈশ্বরের নিকট হইতে সাহায্য অগ্রগামী হইতেছে, এই দান প্রকৃত বিশ্বাসীদের নিকট ঘোষণা কর। ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাস করে, যথানিয়মে প্রার্থনা করে, যথাগত ভিক্ষাপ্রদান করে এবং ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহারকেও ভয় না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের জন্ত মসজিদ নির্মাণ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রদর্শিত পদ্মাবলম্বনকারিগণের মধ্যে অন্ততম। ইহার অর্থ—(এই অংশটি পারশ্বভাষায় লিখিত আছে) যে কেহ ঈশ্বরের জন্ত মসজিদ নির্মাণ করে সে নিঃসন্দেহই একজন প্রকৃত বিশ্বাসী এবং ভবিষ্যতে প্রদর্শিত পথ পাইবে। যিনি শাস্তিপ্রাপ্ত হউন (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত) তিনি বলিয়াছেন, চেষ্টা করা এবং আরম্ভ করা আমার কার্য কিন্তু কার্যের সমাপ্তি ঈশ্বরের হস্তে। ঈশ্বর বলিয়াছেন, মসজিদ সকল ঈশ্বরের; ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও পূজা করিও না। এই জামি মসজিদ অসি ও লেখনীর অধীশ্বর কাল ও যুগের বীর উলুগ মজলিস উল মজালিস্ মজলিন্ ইখতিয়ার হুসেনাবাদ বুজুর্গ নগরের এবং সাজলা মনখাবাদ পরগণার সৈন্যধ্যক্ষ এবং উজির, লাওবালা থানা হাদিগড় সহরের সৈন্যধ্যক্ষ সরহটের আলাউদ্দিনের পুত্র রুক্মুদ্দিন রুকন্ থাঁর আদেশে নির্মিত হইল। ঈশ্বর তাহার (রুক্মুদ্দিনের) আয়ু দীর্ঘ এবং অশেষ করুন। ঈশ্বর মানবজাতির উপর তাহার অধিকার চিরস্থায়ী করুন ও তিনি প্রকৃত বিশ্বাসীদের যে উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা চিবস্থায়ী করুন এবং অবিধানিগণের উপরে তাহাকে জরী করিয়া সত্যধর্মের শ্রীবৃদ্ধি করুন। হে বিশ্বাসিগণ! যিনি এই মসজিদ সংস্কার করিবেন (এই অংশ পারশ্বভাষায় খোদিত) তিনি ঈশ্বরের দয়ার পাত্র হইবেন, কিন্তু যদি কেহ এই মসজিদের অবমাননা করে ঈশ্বর তাহাকে হতমান করিবেন।

সরহট বীরভূম জেলার একটি নগর। এই নগর সরহটবাসী আলাউদ্দিনের পুত্র রুক্মুদ্দিন ৯১৮ হিজরায় জাক্রাবাদ নগরের উজির এবং ফিরুজাবাদ নগরের সৈন্যধ্যক্ষ, কোতোয়াল এবং পুস্তকাগারের মুসেফ ছিলেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালে রুক্মুদ্দিনের আদেশে নির্মিত একটি মসজিদের খোদিতলিপি হইতে রুক্মুদ্দিনের কথা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। জিবেরীর খোদিতলিপিও যে হুসেন শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ

তদ্বিষয়ে সম্মত নাই। রুক্মদ্দিন বোধ হয় সপ্তগ্রামের স্বশাসনকালে রাজধানীর শাসনকর্তৃপদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

হুসেন শাহের পর তৎপুত্র নসরৎ শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। নসরৎ শাহের রাজ্যকালের দুইটি খোদিতলিপি সপ্তগ্রামে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুইটির মধ্যে একটি জামালুদ্দিনের মসজিদগাত্রে গবর্ণমেন্টকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, অপরটি জামালুদ্দিনের সমাধিগাত্রে পতিত আছে।

৯। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন, হে প্রকৃত বিশ্বাসিগণ শুক্রবারে যখন আজানের স্বর শ্রুত হইবে তখন ক্রয়বিক্রয় পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনার জন্ত দ্রুতপদে গমন করিও। তোমরা যদি বিশ্বাস কর তবে ইহাই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। দানসমূহ কেহ অপহরণ করিও না। ঈশ্বর প্রেরিত, ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্বাদ করুন, বলিয়াছেন, যখন তুমি স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হও এবং সে দিবস যদি শুক্রবার হয় তবে তুমি একজন মুহাজির হইবে (অর্থাৎ মহম্মদের মদিনা পলায়নকালীন সজ্জিগণের ত্রায় পুণ্যশালী হইবে) এবং পণে যদি তোমার মৃত্যু হয় তবেও তুমি সর্বোচ্চ স্বর্গে উপস্থিত হইবে। ঈশ্বর প্রেরিত আরও বলিয়াছেন যে ব্যক্তি মসজিদের বা দত্তসম্পত্তি অপহরণ করে সে মাতৃহরণ, কন্যাহরণ ও ভগিনীহরণপাপের ভাগী হইবে। মসজিদ সকল দত্তসম্পত্তি.....তাহার মুখের জ্যোতি পুনরুত্থানের দিন পূর্ণ চন্দ্রের ত্রায় উজ্জ্বল হইবে। (পরের অংশটি পারশ্বভাষায় লিখিত) এই জামি মসজিদ সুবিচারক এবং সর্বগুণসম্পন্ন সুলতান হুসেনশাহের পুত্র এবং হুসেনের বংশসম্ভূত সুলতান আবুল মুজফর নসরৎ শাহের, ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন। রাজত্বকালে আমুল-নিবাসী সৈয়দ ফক্কদ্দিনের পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দিন হুসেন-কর্তৃক ৯৩৬ সালের রমজান্ মাসে নির্মিত হইল। মোল্লা এবং জমিদারগণ দত্তাপহরণ করিলে ঈশ্বর কর্তৃক অভিশপ্ত হন এইজন্ত শাসনকর্ত্তা ও বিচারকগণের উচিত এইরূপ অপহরণ নিবারণ করা, তাহা হইলে পুনরুত্থানের দিন তাহারা তাহাদিগের পাপকাঁর্য্যসমূহের জন্ত ধৃত হইবে না।

১০। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্ত মসজিদ নির্মাণ করিবে, তাঁহাকে শেষদিনেও বিশ্বাস করিবে, প্রাত্যহ যথারীতি প্রার্থনা করিবে, যথাশাস্ত্র দান করিবে এবং ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় না করিবে, সেইরূপ ব্যক্তিই বোধ হয় প্রদর্শিত পথানুসরণকারী। ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জগতে ঈশ্বরের জন্ত একটি মসজিদ নির্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্ত স্বর্গে সত্তরটি হুর্গ নির্মাণ করিবেন। এই জামি মসজিদ সুবিচারক রাজা, সুলতান হুসেনশাহের পুত্র ও হুসেনের বংশসম্ভূত আবুল মুজফর নসরৎশাহের রাজত্বকালে আমুল-নিবাসী, সৈয়দগণের আশ্রয়স্বরূপ ও ঈশ্বর প্রেরিতের বংশধরগণের জ্যোতিঃস্বরূপ।

সৈয়দ ফকরুদ্দিনের পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দিন ছমেনকর্তৃক (ঈশ্বর তাহাকে জগতে ও ধর্মে রক্ষা করুন) শুভ রমজানমাসে ৯৩৬ সালে (১৫২৯ খৃষ্টাব্দে) নির্মিত হইল।

কশুপহৃদতীরস্থ আমুলনগর-নিবাসী সৈয়দ ফকরুদ্দিনের পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দিনের বিষয় আর কিছুই জানা যায় না। ত্রিশবিঘাবাসিগণ মসজিদে সপ্তখস্থ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত সমাধিকে এখনও জামালুদ্দিনের সমাধি বলিয়া দেখাইয়া দেয়। সমাধিগাত্রে একটি প্রাচীন আরবী খোদিতলিপি আছে, কিন্তু কালক্রমে অক্ষরগুলি ক্ষয় হওয়ায় ‘ফকরুদ্দিনের পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দিন’ ব্যতীত আর কিছুই পাঠ করা যায় না। নসরৎশাহের পর তাহার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ কয়েক মাসের জন্ত বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন (৯৩৯ হিজরী, ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ), তাহার পর তদীয় খুল্লতাত গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহ বঙ্গসিংহাসনাধিরূঢ় হন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ বাণিজ্যার্থে বঙ্গদেশে প্রথম আগমন করে। ইহারা প্রথমে সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম এই দুই বন্দরে বাণিজ্য করিত। মহম্মদ শাহের রাজ্যের ষষ্ঠবর্ষে বিহারের পরাক্রান্ত জায়গীরদার শেরশাহ গোড়াক্রমণ করিয়া বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজত্ব লোপ করেন। গোড়ে অবরুদ্ধ থাকিয়া মহম্মদ শাহ সাহায্যের জন্ত মোগলসম্রাট হুমায়ুন ও পর্তুগীজ নৌসেনাধ্যক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু পর্তুগীজ নৌবলগণ্য পরবৎসর বঙ্গাক্রমণ করিতে আসিয়া বিপদসমুদ্রে নিমগ্ন হইল, এ জন্য তাঁহাকে অন্ততাপ করিতে হইয়াছিল। পর্তুগীজ নৌসেনা আসিবার বহুপূর্বে মহম্মদশাহের জীবনাবসান হয়। ডুবরো (Du Barros) তাহার Da Asia নামক গ্রন্থে ইহাকে El Rey Mamudedue Bangala অর্থাৎ বঙ্গরাজ মহম্মদ নামে পরিচিত করিয়াছেন। শের শাহ ও তৎপুত্র ইসলাম শাহের রাজত্বকালীন সপ্তগ্রাম-মুন্ডাবস্তুর নৌপ্যমুন্ডা পাওয়া গিয়াছে। পাঠান ও আফগান জাতির অধঃপতনের সহিত সপ্তগ্রামের অধঃপতন আরম্ভ হয়, ইহার প্রথম কারণ, সরস্বতী নদীর ছরবস্থা; দ্বিতীয় কারণ পর্তুগীজ জাতির আবির্ভাব। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সরস্বতী নদীর গভীরতা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম বন্দরে বৃন্দাকার অর্ণবপোত লইয়া বাওয়া এক প্রকার দুঃসাধ্য বাণ্যার হইয়া উঠিয়াছিল। পর্তুগীজ বণিকগণ সক্ষীর্ণ জলপথানুসরণ না করিয়া গঙ্গাতীরে বেতড় (বর্তমান মাটিয়াবুরুজের নিকটে গঙ্গার অপর পারে হাবড়ার পার্শ্ববর্তী) গ্রামের সমুদ্রগামী পোত হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রগামী নৌকায় স্বদেশীয় পণ্য পাঠাইয়া তদ্বিনিময়ে ভারতীয় পণ্য আনাইয়া স্বীয় পোতসমূহ পুনরায় পরিপূর্ণ করিত। এইরূপে প্রতি বৎসর পর্তুগীজদিগের আগমনকালে বেতড়ে একটি হাট বসিত। পর্তুগীজ আবিপোতসমূহ সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলে গ্রামবাসিগণ গ্রামে অগ্নিপ্রদানপূর্বক সপ্তগ্রামে প্রতিগমন করিত। এইরূপে ক্রমে বেতড়ের নিকটস্থ গঙ্গার অপর পারে গোবিন্দপুর গ্রামে সপ্তগ্রামবাণী শেঠ ও বণ্যকগণ আসিয়া জঙ্গল কাটাইয়া মনুষ্যবাস স্থাপন করেন। ইহাই মহানগরী কলিকাতার প্রথম সূত্রপাত। পর্তুগীজগণ অধ্যক্ষচারী

নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপ্রিয় ছিল। দুর্জয় পাঠানজাতির শাসনকালে নবাগত বণিগ্গণ অধিক অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। পাঠানশাসনের অবনতির সময়ে পৰ্তুগীজগণ ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। পৰ্তুগীজগণের অত্যাচারে অস্ত্রাস্ত্র বিদেশীয় বণিগ্গণ, বহুদেশের ব্যবসায়ের আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ভারতীয়বণিগ্গণের পক্ষেও সমুদ্রযাত্রা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। এইরূপে পৰ্তুগীজ জাতির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। বঙ্গদেশে মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে মোগলসম্রাটগণ সপ্তগ্রামের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ সপ্তগ্রাম-মুদ্রাঘস্ট্রের লোপ। সপ্তগ্রামের মোগলফৌজদারগণ অত্যন্ত হীনবল ছিলেন; এই জন্যই শোভাসিংহ কৃষ্ণরামের রাজ্যাপহরণ করিতে পারিয়াছিলেন ও ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজবণিগ্গণ মোগলশাসনকর্ত্তাকে অবমানিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সুরোগীয় পর্যাটক Caesar dei Frederici সপ্তগ্রামকে বৃহদায়তন নগর বলিয়া গিয়াছেন। তখনও সপ্তগ্রামে সর্ববিধ পণ্য স্তলভ ছিল। ইহার পর সপ্তগ্রাম মোগলসাম্রাজ্যের সরকারবিশেষের নামে পরিণত হয়। এই সময় হইতে এই ভগ্নপ্রায় অস্বাস্থ্যকর প্রাচীন নগর পরিত্যাগ করিয়া নূতন রাজপ্রতিনিধি ও নূতন বণিক, নূতন নগর গঠন করিয়া বঙ্গীয় ইতিহাসে মুসলমান রাজত্বের শেষ পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন।

প্রাচীন বঙ্গশাসিত্যে সপ্তগ্রামের বিবরণ।

ভক্তিরত্নাকর ও চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের সপ্তগ্রাম-বিহারের নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়—

“নানাগ্রামে লোকের করিয়া হুঃখ দূর। সপ্তগ্রামে হইল শুভাগমন প্রভুর ॥

উদ্ধারণ দত্তে প্রভু কৈল আশ্রয়। তথা যে বিলাস তাহা জগতে বিখ্যাত ॥

তথাহি তটৈব ॥

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥

কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর ॥

জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ দীক্ষর। জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাহার কিঙ্কর ॥

যতেক বণিক্কুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥

বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকেরে দিল। প্রেমভক্তি অধিকার ॥

সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে। আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহারে ॥

বণিক্ সকল নিত্যানন্দের চরণ। সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥

বণিক্ সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে। মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মহিমা অপার। বণিক্ অধম মুখে যে কৈল উদ্ধারণ ॥

সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ মহামল্লরায়। গণসঙ্গে সংকীৰ্তন করেন জীলায় ॥

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার। শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥

পূর্বে যেন স্নেহ হৈল গোকুলনগরে । সেইমত স্নেহ হৈল সপ্তগ্রামপুরে ॥
 বণিকের সৌভাগ্য জানিবে কুন জন । ঐছে বহু বর্ষিলা ঠাকুর বৃন্দাবন ॥
 উদ্ধারণ দত্ত প্রেমে মত্ত নিরন্তর । করেন প্রভুর সেবা আনন্দ অন্তর ॥
 সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে । দেখে নানা রঙ্গ রহি প্রভুর নিকটে ॥
 যে যে স্থানে প্রভু নিত্যানন্দের বিজয় । সে সকল স্থান হয় সর্বতীর্থময় ॥
 গোড়ুভূমে যত তীর্থ কে করু গণন । প্রভুসঙ্গে সর্বতীর্থে ভ্রমে উদ্ধারণ ॥”
 উদ্ধারণ দত্তের পিতার নাম শ্রীকর ও মাতার নাম ভদ্রাবতী, ইহা মুকুন্দঠাকুর
 বিরচিত একটি পদ হইতে জানা যায় । তৎকালে ত্রিবেণী যে সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল,
 তাহার প্রমাণও এইপদে পাওয়া গিয়াছে—

“শ্রীকরনন্দন, দত্ত উদ্ধারণ,
 ভদ্রাবতী গর্ভজাত ।

ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস,

শ্রীগৌরানন্দের পদাশ্রিত ॥” (পদসমুদ্র ৩০৪১)

এ সম্বন্ধে বিপ্রদাস পিপ্লাই রচিত মনসার গীতেও প্রমাণ আছে । বিপ্রদাস ২৪ পরগণা
 জেলার বটগ্রামনিবাসী ছিলেন । গোড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের রাজত্বকালে ১৪১৭ শকাব্দে
 পদ্মার গীত বা মনসার গীত রচনা করেন । গ্রন্থশেষে কবি নিজের নিম্নলিখিত পরিচয়
 দিয়াছেন—

“মুকুন্দ পণ্ডিতস্বত বিপ্রদাস নাম । চিরকাল বসতি নক্ষত্ৰা বটগ্রাম ॥
 মুকুন্দমণীতিথি বৈসাখ মাসে । সিন্ধুরে বসিয়া পদ্মা কহিলা উগদেশে ॥
 কবিগুরু ধিরজনে করি পরিহার । রচিল পদ্মার গীত সাত্ৰ অহুসার ॥
 সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমাণ । নৃপতি হুসেনমা গোড়ে মুদক্ষণ ॥”

বিপ্রদাস চাঁদসদাগরের সপ্তগ্রাম দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন—

“বুহিঞ চাপায়া কুলে চাঁদ অধিকারি (ব)লে

দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম ।

তথা সপ্ত রিসিহান সর্বদেব অধিষ্ঠান

সোক ছথ সর্বগুণধাম ॥

জ্যোতি হয়া একমুতি রিসিমুনি সব তথি

তপ জপ করে নিরন্তর ।

গঙ্গা আর সরস্বতি জয়না বিসাল তথি

অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরী ॥

দেখিয়া ত্রিবিনি গঙ্গা চাঁদরাজ মনে রঙ্গা

কুলেতে চাপায়া মধুকর ।

আনন্দিত মহারাজ করে নৃপতি তিথি কাজ
 ভক্তিভাবে পুজে মহেশ্বর ।
 তির্থ কার্য সমাপিয়া অস্তরে হরি(য) হয়।
 উঠে রাজা ভূমিয়া নগর ।
 ছত্ৰিষ আশ্রমে লোক নাহি কোন ছঃখ সোক
 আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর ॥
 বৈসে জতো দ্বিজগণ সৰ্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
 তেজময় যেন দিবাকর ।
 সৰ্ব্বতত্ত্ব জানে মর্গে বিসাদ গুরু ধর্মে
 জ্ঞান গুরু দেবের সোসর ॥
 পুরুষ মদন জেনো রমনি সাবিত্রি হেনো
 অভরণ সব স্বর্ণময় ।
 তার রূপ গুণ জতো তাহা বা কহিব কত
 হেরিতে নিমিস বিলয় ॥
 অভিনব সুর পুরি দেখি ঘর সারি সারি
 প্রতিঘরে কনকের ঝাড়া ।
 নানা রত্ন অবিসাল জোতিময় কাচচাল
 রাজমুক্তা প্রলম্বিত ঝাড়া ॥
 সম্ভে দেবে ভক্তি মুক্তি প্রতিঘরে নানা মুক্তি
 রত্নময় সকল প্রসাদে ।
 আনন্দে বাজায় বাদি সঙ্ক ঘণ্টা মৃদঙ্গ আদি
 দিখি রাজা বড়ই প্রমাদে ॥
 নিবশে যবন জতো তাহা বা বলিব কতো
 মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম ।
 ছয়দ মোঙ্গা কাজি কেতাব কোরাণ রাজি
 ছই গুরু করে তছলিম ॥
 মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে
 ফয়তা করয়ে পিত্য লোকে ।
 বন্দিয়া মনসা দেবি দ্বিজ বিপ্র দাস কবি
 উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে ॥”

(এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি—বিপ্রদাস কৃত মনসা-মঙ্গল গ ৩৫৩০)

কৃষ্ণরাম নামক একজন কবি প্রণীত যজ্ঞীমঙ্গল নামক কাব্যে সপ্তগ্রামের কতক

বিবরণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণরামের যজ্ঞীমঙ্গলের একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও খণ্ডিত, এই কৃষ্ণরাম কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে কৃষ্ণরাম সাদ্বিশতাব্দ পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সপ্তগ্রামের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সপ্তগ্রামের সে অবস্থা ছিল না। এই জন্তই অনুমান হয় কৃষ্ণরাম নূন কালে সাদ্বিশতাব্দীর পূর্ববর্তী। কৃষ্ণরাম সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন—

“সপ্তগ্রাম জে ধরগি নহি তুল। চালে চালে বৈসে লোক ভাগিরথির কুল ॥

নিরবধি জন্ত দান পুথবান লোক। অকাল মরণ নহি নহি দুখ সোক ॥

যজ্ঞজিত রাজার নাম তার অধিকারী। বিবরিএ জতগুণ বলিতে ন(১)হি পারি ॥

নিমল জসের সবি প্রেতপ্ত তপন। জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন ॥”

(এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি কৃষ্ণরাম কৃত যজ্ঞীমঙ্গল। গ ৫৬৭৪।)

সপ্তগ্রামের আরবীয় খোদিত লিপি সমূহে নিম্নলিখিত স্থান সমূহের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে :—

(ক) সাজলা মনখাবাদ—এই আরসা বা পরগণার নাম বারবক শাহ, ফতেশাহ ও হুসেন শাহের খোদিত লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। এই তিনটি খোদিত লিপিতেই ইহার উল্লেখ থাকায় অনুমান হয় মোগল শাসনকালে সরকার সাতগাঁও বর্তমান বিস্তৃত ছিল এই আরসাও ততদূর ছিল। আইন-ই-আকবরীতে সাতগাঁওএর বিবরণ পাওয়া যায়। তদনুসারে হুগলী ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ও কপোতাক্ষ নদের তীর পর্যন্ত বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার সম্পূর্ণ ভূখণ্ড বর্তমান নদীয়া জেলার পশ্চিমাংশ ও মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমুদ্রতীরবর্তী হাতিয়াগড় নগর ইহার দক্ষিণ সীমা। কিন্তু এই সম্পূর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে অতীতে বা বর্তমানে সাজলা বা মনখাবাদের নাম পাওয়া যায় নাই। আইন-ই-আকবরীতে সরকার সরিফাবাদের বিবরণ মধ্যে দৃষ্ট হয় যে উক্ত সরকারভুক্ত আকবরশাহী পরগণার অপর নাম সান্দল। প্রাচীন আকবরশাহী পরগণা এক্ষণে তিনটি পরগণায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে যথা—

১ আকবরশাহী, ২ হাবেলী, ৩ বর্দ্ধমান। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি যে মাঁচোল নামে বর্দ্ধমানের একটি পরগণা ছিল। অনুমান হয় লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ সাজৌল বা সাতৌল, সানৌল বা মাঁদৌল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ পারস্য ভাষায় ‘চ’ ও জ এর প্রভেদ অত্যন্ত অল্প, পারস্য “দাল” অক্ষরটি বক্রভাবে লিখিত হইলে ‘জিম’ বা ‘চে’ এর স্থান দেখায়। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গত বৎসর নেপাল হইতে একখানি পুঁথি আনিয়াছেন; ইহা শাস্ত্রিদেব রচিত বোধিচর্যাবতার। ইহার শেষ পত্রে দেখা যায়—“যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুস্তবাস্থথাগতোহবদত তেবাক্ষ-রাধ এবং বাদী মহাশ্রমণ ॥ দেয়ধর্ম্মোহয়ং প্রবরমহাবানানিহুবাযিনঃ।

হিষ্করী গ্রামাবস্থিত কুটুম্বিক কোচ্ছ উচ্ছ মহত্তম শ্রীমাধব মিত্র স্তুত শ্রীরামদেবস্বার্থপরার্থ-
হেতবে বোধিচর্যাবতারপুস্তিকা লিখ্যাপিতা। সম্বোধকরণকায়স্থ ঠকুর শ্রী অমিতাভেন
লিখিতমিদং বেণুগ্রামে। বিক্রমাদিত্য দেব সং ১৪৯১ ফাল্গুন স্রদি ৪। কুজে। শুভমস্ত
সর্বজগতঃ পরহিত নিরতাঃ ভবন্ত সন্তঃ”।

অপর অপর মহাবাহনীর গ্রন্থের গ্রন্থ এই গ্রন্থের ভাবাও অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃত; ইহার
ভাবার্থ এই :—

“সোহিষ্করী গ্রামনিবাসী জমিদার মাধব মিত্রের পুত্র রামদেবের কলাগ কামনার
কায়স্থ ঠকুরশ্রী অমিতাভ বেণুগ্রামে বিক্রমাদিত্য দেবের ১৪৯২ সংবৎসরে ফাল্গুন মাসের চতুর্থ
দিবসে গুরুপক্ষে শুক্রবারে এই বোধিচর্যাবতার পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।” সোহিষ্করী বা
সাঁচোল গ্রাম যে সাজলা মনথাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া
দিতে হইবে না, বেণুগ্রাম বর্তমান বেড়ুগ্রাম বা বেড়ুগাঁ হাবেলী পরগণার অন্তর্গত। পূর্বে
দেখাইয়াছি, আকবরশাহী পরগণাও সাজলা মনথাবাদের অন্তর্গত ছিল। এই সমুদয়
হইতে অনুমান হয় যে মোগল শাসন কালের সরকার সাতগাঁও সরকার সুরিকাবাদ এবং
সরকার সুলেমানাবাদ আরসা সাজলা মনথাবাদের অন্তর্গত ছিল।

(খ) লাওবলা—যে কয়েকটা খোদিত লিপিতে সাজলা মনথাবাদের উল্লেখ আছে
সেই কয়টিতেই লাওবলার নাম পাওয়া যায়। বারবক শাহের খোদিত লিপিতে লাওবলা
নগর বলিয়া পরিচিত। অপর খোদিত লিপিতে ইহা থানা অর্থাৎ সেনানিবাস নামে
অভিহিত হইয়াছে। সপ্তগ্রামের পর পারে যমুনাতীরে ‘নাওপালা’ নামক একটি ক্ষুদ্র-
গওগ্রাম অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। আরবীয় বর্ণমালায় ‘প’ এর অন্তিত্ব না থাকায় খোদিত
লিপিতে ‘প’ স্থানে ‘ব’ লিখিত হইয়াছে। মোগল-শাসনকালেও ভাগীরথীর পশ্চিম তট যখন
সাতগাঁও সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন পাঠান শাসনকালে ভাগীরথীর অপর পারে সপ্ত-
গ্রামের অধীন সেনানিবাস থাকা আশ্চর্য্য নহে। সপ্তগ্রাম এক্ষণে আর্য্য পরগণায় অবস্থিত।
অনুমান হয়, আরসা সাজলা মনথাবাদ সর্বজন বিদিত হওয়ার ক্রমে ক্ষুদ্রাকার হইয়া আর-
সায় পরিণত হইয়াছে। ক্রমে লোকে এই আরসা অর্থাৎ পরগণার প্রকৃত নাম বিস্তৃত হইয়া
গিয়াছে। আর্ষজ্ঞাভিমানীরা হয়ত বলিবেন যে সপ্তগ্রাম, সপ্তধির আবাস স্থান, এইজন্ত
ইহার নাম আর্ষ পরে অপভ্রংশ হইয়া আরসায় পরিণত হইয়াছে। স্বর্গীয় হারাদন দত্ত জন্মভূমি
পত্রিকায় (১৩০২।১১ সংখ্যা) উদ্ধারণ দত্ত সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিয়া-
ছেন—“ইতিবৃত্তে কথিত আছে কাশ্মকুজের প্রিয়বস্ত নামক রাজার সপ্ত মহর্ষি সন্তান
(১) অগ্নিত্র (২) রমণক (৩) ভণিস্তূত (৪) স্বরবান (৫) বরাট (৬) সুনবও (৭) দ্যুতিমন্ত্র।
সপ্তগ্রামে তপস্তা করিয়া শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইত্যাদি। হারাদন দত্ত
মহাশয় দুই একটি হস্তরসোদ্ধীপক কথা গম্ভীর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয় গিয়াছেন—

(১) পূর্বে “এসিয়া যুরোপের মধ্যবর্তী কাসপিয়ান” নামক অতি বৃহৎ হ্রদের তটস্থিত

“আমুল নামক নগরী হইতে “গাইদ কাফরুদ্দি” নামে জনৈক পাঠান সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয় আমুল শব্দের অপভ্রংশে অম্বুয়া মূলক নামকরণ হইয়াছিল। এক্ষণে উহা হুগলী জেলার অন্তর্গত।

কিন্তু হুগলী জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর নগরের পরপারস্থিত ভূখণ্ড যে পরগণাভূক্ত তাহার নাম অধিকারায়পুর, সূতরাং অধিকা বা অম্বুয়া “আমুল” হইতে উৎপন্ন ইহা সম্ভবপর নহে।

(২) “পরিশেষে দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি গোড়ের নবাব হুসেন শাহ সপ্তগ্রামে ‘গড়’ এবং অট্টালিকাদি যাহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার ভিত্তিচিহ্ন আছে। পূর্বে শ্রীমৎ রূপ সনাতন কিছুদিন ঐ স্থানে পারশুবিভা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর পিতা কামতুল্লোদ্ভব বদান্তবর শ্রীগোবর্দ্ধন ও জ্যেষ্ঠতাত শ্রীহিরণ্য সপ্তগ্রাম নবাবের নিকট পত্নি লইয়াছিলেন। “দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি গোড়ের নবাব হুসেন শাহ” বর্তমান সময়ে বড়ই বিসদৃশ দেখায়।

(গ) হাদিগড় মহর—ইহা নিশ্চয়ই ২৪ পরগণার বর্তমান হাতিয়াগড়। আরবীতে ‘ত’ স্থানে ‘দ’ লিখিত হইয়াছে, কারণ উক্ত ভাষায় ‘ত’ অক্ষরটি নাই।

(ঘ) হুসেনাবাদ—২৪ পরগণার হুসেনাবাদ পরগণা হইবে।

(ঙ) হুসেনাবাদ বুজুর্গ—মুরশিদাবাদের গোঁকর্ণগ্রাম জনপ্রবাদ অনুসারে হুসেন শাহের জন্মস্থান। বোধ হয় হুসেন শাহ সিংহাসনপ্রাপ্তির পর জন্মস্থানের নাম পরিবর্তন করিয়া স্বনামানুসারে হুসেনাবাদ রাখিয়াছিলেন। এই সময় অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম হুসেনাবাদ “হুসেনাবাদ বুজুর্গ” অর্থাৎ পুরাতন হুসেনাবাদ নামে আখ্যাত হয়। পারশুভাষায় “বুজুর্গ” শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। এই জন্মই উল্লংগ মসনদ হিন খাঁ ইহার নূতন নাম ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে ইহার নাম ছিল “হুসেনাবাদ”।

(চ) মিহরবক্ } এই দুইটি নামের কিছু জানা যায় নাই।
(জ) সিমলাবাদ }

পর্তুগীজ লেখকগণের বিবরণ এদেশে সহজে পাওয়া যায় না। Barros এর Da Asia ভিন্ন অন্য কোন পর্তুগীজ ভ্রমণবৃত্তান্ত এমিয়াটিক সোসাইটিতে নাই। অত্যাশ্চর্য্যরূপীয় লেখকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহারা কেহই সপ্তগ্রামের পূর্ণ সমৃদ্ধির অবস্থা দেখেন নাই। প্রাচীন মন্দিরের শেষ অবস্থা দেখিয়া কেহ বলিয়াছেন, “এখনও এখানে সর্বপ্রকার পণ্য বিক্রীত হইয়া থাকে” (All commodities are still available here Caesar die Frederici) কেহ বা বলিয়াছেন, মুসলমানের নগর হইলেও ইহা সুন্দর (It is a fair city for a of Moores.—Purchas his Pilgrimage.) সপ্তগ্রামে আসিয়া ওলন্দাজ বণিক লিনসোটেন পর্তুগীজ অধিকার দেখিয়া গিয়াছেন। পর্তুগীজ জাতিই সপ্তগ্রামের অবনতির প্রধান

কারণ। লিনমোটেন পৰ্তুগীজগণের অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পৰ্তুগীজগণ অতিশয় নিষ্ঠুর আচরণ করিত। সততা কি আয়বিচার পৰ্তুগীজ সংস্পর্শে আসিত না। প্রতিদ্বন্দী বণিকগণের সহিত তাহারা পশুর আচরণ করিত। তাহা-
দিগের অৰ্ণবপোত সকল স্তবিধা পাইলেই লুণ্ঠন করিত। পণ্য বিনিময়ের জন্য বণিকগণকে আহ্বান করিয়া বলপ্রকাশপূর্বক তাড়াইয়া দিত। দেশীয় বণিকগণের পণ্য ক্রয় করিয়া অতি সামান্য মূল্য দিত। এইরূপে অত্যাচারে অজ্ঞরিত হইয়া দেশীয় ও বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায় ক্রমে সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সপ্তগ্রাম ক্রমে পৰ্তুগীজ বণিকের নিজস্ব হইয়া পড়ে। ইহার পৰ্তুগীজ নাম Porto Pequero = ক্ষুদ্র বন্দর। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন পাটনায় ইংরাজ বণিকের কুঠি সংস্থাপিত হয়, তখন সপ্তগ্রামের শেষ দশা। ইংরাজ বণিক লিখিয়া গিয়াছেন, তখনও সপ্তগ্রাম হইতে দলে দলে পৰ্তুগীজগণ বৈকুণ্ঠ-
পুরের বস্ত্র ক্রয় করিতে ভাগীরথী বহিয়া পাটনায় আসিত। ইংরাজ বণিক প্রথমে পৰ্তু-
গীজগণের প্রতিদ্বন্দিতায় পরাজিত হইয়াছিল। পণ্যের অভাবে ইংরাজ বণিক স্মার্টের কুঠিতে স্তবীৰ্য অভিযানের তালিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামবাসী পৰ্তুগীজগণ জলে স্থলে সমুদয় দ্রব্যই হস্তগত করিয়া কেলিয়াছিল। সপ্তগ্রামের শেষ উল্লেখ ইংরাজ বণিকের পত্রে। ১৬২১ খৃষ্টাব্দেও সপ্তগ্রামের বাসিন্দা রঙ্গের রেশম নির্মিত লেপ বিলাতে বড় আদরের সামগ্রী ছিল। ইংরাজবণিক শতাধিক লেপ সংগ্রহ করিয়া মহাফ্লাদে কর্তৃপক্ষ-
গণকে আনিয়া দিতেন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গলা নাম রহস্য

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের নামে যে কত রহস্য আছে, হিন্দী, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উড়িয়া, বাঙ্গলা প্রভৃতি কত ভাষার শব্দ লইয়া আমাদের এই ব্যক্তিগত নাম গুলি রাখা হয়, কত প্রকারে ঐ সকল শব্দের বিকৃত সংযোগে আমাদের নূতন নূতন নাম কল্পনা করা হয়, তাহার একটা বিবরণ আমি আমার ১ম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। সে প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় ত্রয়োদশ ভাগের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এবার এই প্রবন্ধে বাঙ্গালীর নামের উপাধি রহস্য ও সম্বোধন রহস্য দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(ক) উপাধি-রহস্য।

বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণভেদে নানাবিধ উপাধি আছে। বংশভেদেও নানা-
বিধ উপাধি আছে। বংশ-বিশেষের আদি বাসস্থানের নামানুসারে উপাধি আছে। বংশ

বিশেষের কোন না কোন চিহ্নস্থাপনের জন্ত পণ্ড, পক্ষী গাছপালার নামানুসারেও উপাধি আছে। বর্ণগত জাতিগত বা বংশগত কার্যভেদে উপাধি আছে। ব্যবসায় বিশেষের বিশেষ বিশেষ দ্রব্য নামে উপাধি আছে। এতদ্বিিন্ন রাজ-সরকারে সম্মান বা চাকুরীবোধক উপাধি আছে এবং বিজ্ঞানব্রহ্মণ্যের পরিচায়ক উপাধি আছে।

সকলেই জানেন, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও পশ্চিমা ব্রাহ্মণের শ্রেণী ভেদে নানারূপ উপাধি আছে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও তদানুসঙ্গিক সপ্তশতী ব্রাহ্মণের উপাধি বাসগ্রামমূলক। রাঢ়ীয়ের ছাপ্পান বা উনষাট গাঁঞী বারেন্দ্রের এক শত গাঁঞী এবং সপ্তশতীর অষ্টাশ্রু ত্রিশটি গাঁঞীর নাম আপনারা সকলেই জানেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণ ও পশ্চিমাব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গাঁঞীসূচক কোনও উপাধি নাই। ইহাদের মধ্যে যে সকল উপাধি প্রচলিত, তাহার অধিকাংশই বিজ্ঞানব্রহ্মণ্যের উপাধি, রাজসম্মান-সূচক উপাধি এবং পদবীসূচক উপাধি।

ব্রাহ্মণের বর্ণের মধ্যে গাঁঞীসূচক উপাধি বাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা গাঁঞী নামে আর এখন কথিত হয় না। সে গুলি এখন সকল উপাধির দ্বারা বংশগত উপাধি মাত্র। অনেকগুলি গ্রাম নাম হইতে উৎপন্ন, এ স্থিতিটুকু হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। বর্ণভেদে এই সকল উপাধির তালিকা এবং তাহা হইতে উপাধি সকলের শ্রেণীভেদে তালিকা নিম্নে করিয়া দিলাম।

(১) বর্ণভেদে উপাধি তালিকা।

(২) শ্রেণীভেদে উপাধি তালিকা।

এই শ্রেণীতে ভাষাভেদ উপাধির শ্রেণীভেদ করা যাইতে পারে। ষাটটি সংস্কৃত শব্দজ উপাধি ; আরবী ও পারস্যী শব্দজ উপাধি এবং বাঙ্গালা শব্দজ উপাধিগুলি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অষ্টাশ্রু উপাধি এই শ্রেণীতে ধরা যাইতেছে।

(ক) পদবীসূচক উপাধি।

বিশ্বাস, মণ্ডল, নায়ক, মহাপাত্র, তলাপাত্র, সেনাপতি, শতপতি, অধিকারী, নিয়োগী, সামন্ত, বিষয়ী, গ্রামাধিক।

হাজরা, হাবলদার (হালদার), পাটোয়ারি, মজুমদার (মজুমদার), সান্না, দফাদার, সরকার, মল্লিক, হাজারী, মতিলাল, দালাল, শেখদার (শিকদার), তরফদার, জমাদার, কাজী, মুন্সী, মুস্তফী, পেঙ্গাস, বক্শী, মীরদা, লস্কর, চোদ্দার, মহালনবীশ (মহল্লানবীশ), দেহানবীশ, দেওয়ান।

(খ) সম্মানসূচক উপাধি।

চক্রবর্তী, চতুর্থীন্দ্র (চৌধুরী), ভট্ট, আচার্য, ভট্টাচার্য, (সমাদ্দার) সমাজদার বা সমজদার, সাধু, সমাজপতি, (বিজ্ঞানব্রহ্মণ্যের উপাধি) তর্কচূড়ামণি, তর্কালঙ্কার, তর্কভূষণ,

তর্কবাচস্পতি, তর্কবাগীশ, তর্কবিশারদ, তর্কসরস্বতী, তর্করত্ন, তর্কশিরোমণি, তর্কনিধি, তর্কভীষ্ম, ভ্রামপঞ্চানন, ভ্রামবাচস্পতি, পদরত্ন, ভ্রামরত্ন, কবিরত্ন, ভ্রামবাগীশ, ভ্রামভূষণ, ভ্রামচূড়, তর্কচূড়, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যানিধি, বিদ্যাশুধি, বিদ্যাসাগর, বিদ্যার্ণব, বিদ্যানিবাস, সিদ্ধান্তশিরোমণি, সিদ্ধান্তশেখর, সর্কাধিকারী, বাকপতি, গীপতি, সার্ক-ভৌম, আগমবাগীশ, অলঙ্কারবাগীশ, বিদ্যাবাগীশ, তত্ত্ববাগীশ, সভাপতি, গোস্বামী, দিবেদী (দোবে), ত্রিবেদী (তেওয়ারি) চতুর্বেদী (চোবে), উপাধ্যায় (ওঝা), মিশ্র, পণ্ডিত, শাস্ত্রী, গুরু (গুরুল), পাণ্ডেয় (পাঁড়ে), ত্রিপাঠী, মহামহোপাধ্যায়।

মৌলবী, মওলানা, মুন্সী, মির্জা।

(গ) কৃতকর্ম জনিত উপাধি

বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী, আবসথী (অবস্তী), অধ্বর্যু, ঠাকুর, দীক্ষিত, অধিকারী।

(ঘ) ব্যবসায় জনিত উপাধি।

ব্যবহর্তা, ঘটক, পাঠক।

(ঙ) বংশ নামে উপাধি।

অগস্তি—মধুনাপিত।

সিংহ—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, চণ্ডাল, গন্ধবণিক, স্তবর্ণবণিক, তাঁতি, তাম্বলী।

(চ) জীব নামে উপাধি।

নাগ—কায়স্থ, বাকুই, গন্ধবণিক, ময়রা, শাঁথারী।

হাতী—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত, (ছগলী)

ঘোড়ল—উগ্র, জেলে।

বাঘ—নাপিত, বাগ্‌দী, চণ্ডাল, জেলে, ময়রা।

পাঁঠা—ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত। ট্যাংরা—চণ্ডাল। খল্‌সে—জেলে। ধেড়ে—জেলে।

ডাউক—চণ্ডাল। ফলুইয়া—চণ্ডাল। ঘড়ুই—কৈবর্ত। গণ্ডক—কায়স্থ। রুই (মৎস্ত

অথবা তুলা)—কায়স্থ, তাঁতি। হাঁস—শাঁথারী। হাঁদী—তাঁতি। ছাগলী—তাঁতি।

যেঁষা—তাঁতি। মাকড়—তাঁতি। পিপি—কায়স্থ। বরাট (কড়ি)—বৈজ্ঞ, ময়রা।

শিয়াল—ব্রাহ্মণ।

(ছ) বৃক্ষনামে উপাধি।

রুই (তুলা)—তাঁতি। শিউলী—চণ্ডাল। কচু—কায়স্থ। মান—কায়স্থ। মূলা—বাকুই। মোধু—কায়স্থ। লঙ্কা—চাষা। শাল—কায়স্থ। শোন—কায়স্থ। কাঁঠাল—ব্রাহ্মণ। প্রচণ্ড—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ফণী—ব্রাহ্মণ।

এতদ্ভিন্ন বর্গগত উপাধির মধ্যে এমনতর কতকগুলি উপাধি আছে, যাহা তৎতৎজাতিগত

ব্যবসায়ের পরিচায়ক বা চিহ্নজ্ঞাপক। যথা—ভুলে বা ভুলে, (ভুলিবাহক, চণ্ডাল ও বাগ্‌দী); পুঁটুলী (গন্ধবণিক); হলধর (চাষী কৈবর্ত); চাক (কুস্তকার); মোদক, লাড়ু (ময়রা); মেছুয়া (মাগো); ক্ষোরকর, নরসুন্দর, (নাপিত); নাপিতের নরসুন্দর উপাধি যেমন সুখকর করনাপ্রসূত, সেইরূপ ধোপার উপাধি সভাসুন্দর বেশ কবিত্বপূর্ণ। গঙ্গাপুত্র, ঘাট-মাঝি, মাঝি, (পাটনী)। আচা (সুবর্ণবণিক)।

পূর্বোক্ত উপাধিগুলি যেমন ব্যবসায়ের চ্যোতক, সেইরূপ নিম্নলিখিত উপাধিগুলি অতি বীভৎস ভাবোদ্ভেদকারী;—মুলা (বারুই); বারুইজাতি পানের লতার ডগার পাতায় কাজ করে, কোনও প্রকার মূল বা মুলার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ঢালী—(গোয়াল) ঢালী শব্দের লকারে যদি হ্রস্ব ইকার দেওয়া যায় তাহা হইলে ছদ্মঢালা ঢালি হইতে একটা গোপস্বচ্ছোতক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। আর লএ দীর্ঘ ইকার দেওয়া হইলে ঢালী গোপের বীরত্ব বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু গোপস্ব কিছুই থাকে না। গাছু—(কামার), ভূত, দানা, বিদ, হেম, হোড়, লুই, পিল, ঘিল, ঢোল, পই—(কায়স্থ), বেহারী, মাঝি (কুস্তকার), ক্ষুর শানাই, (তামিল)।

বর্ণগত উপাধির মধ্যে এমনতর কতকগুলি উপাধি আছে, যাহা একাধিক বর্ণের উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইগুলি হয় পদবীহচক, নয় গ্রামহচক উপাধি। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

শুণ্ড	বৈজ্ঞ	কায়স্থ				
মেন	"	"	কৈবর্ত	শাঁখারী		
দস্ত	"	"	বারুই	গন্ধবণিক	ময়রা	শাঁখারী সুবর্ণবণিক
দে	"	"	"	"	"	"
ধর	"	"	"	"	"	"
কর	"	"	"	"	"	"
চন্দ্র	"	"	নাপিত	শাঁখারী	সুবর্ণ-বণিক	ছুতার
কুণ্ডু	"	"	বারুই	জেলে	শাঁখারী	
নন্দী	"	"	ময়রা	নাপিত	"	সুবর্ণবণিক
সোম	"	"	"	"	"	"
ধাড়া	বাগ্‌দী	কৈবর্ত				
ভদ্র	বৈজ্ঞ	কায়স্থ		শাঁখারী		
গুহ	বারুই	"				

১। বর্ণভেদে উপাধি।

আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয়—কেশ, রায়, পাই, পাল, সামন্ত, শ্রাম।

বাগদী, বাগতীত—বাগ, খাড়া, খাঁ, মাঝি, মশালচি, মুদি, পালনখাই, প্রামাণিক, ফেরকা, পুইলা, সাতরা, রায়, সর্দার।

বৈদ্য—গুপ্ত, দাস, সেন, দত্ত, দেব, ধর, কর, চন্দ্র, কুণ্ড, নন্দী, রাজ, রক্ষিত, সোম, বরাট।

বাইতি—ভুইঞা, রায়, সেন।

বারুই—আয়ন, আশ, বাওয়াল, ভদ্র, ভৌমিক, ভাওয়াল, বিশ্বাস, চাঁদ, চৌধুরী, দাম, দাস, দেও, দত্ত, ধর, গুই, গুহ, হালদার, হোড়, কর, খান, খোর, কুণ্ড, লাহা, মজুমদার, মল্লিক, মণ্ডল, মঞ্জিনি, মান্না, মারিক, মিত্র, নাহা, নাগ, নন্দন, নন্দি, পাল, রক্ষিত, রুদ্র, সরকার, সেন, মুলা, শীল।

বাওরী—দিঘা, মণ্ডল, মাঝি, মৌলকী, প্রামাণিক।

চণ্ডাল—বাগ, ভাল, বিশ্বাস, দাস, ডাউক, ঢালী, ছলে (ডুলে=ডুলী হইতে), হাইত, হাজরা, হালদার, হাতী, হাওইকর, থা, লঙ্কর, মহরা, মজুমদার, মণ্ডল, মাঝি, ধীরদাদা, মিজী, নামধানী, প্রধান, পণ্ডিত, প্রামাণিক, সুরমাদার, পাত্র, ফলিয়া (মৎ), রায়, সাতরা, সেনা, সিউলী, সিংহ, টেক্সরা।

চাষা—লঙ্কা, মুছলী, সাঁই, প্রধান, নায়ক, সায়ল, মহাস্ত্র।

চাষাধোপা—রায়, পুইক, হলধর, বলভ, সাঁ, সমাদার, বিশ্বাস, হালদার, হাজরা, মিজী।

ধোপা—দাস, মিজী, রজক, সভাস্ত্র, সাকল্য।

গন্ধবণিক—লাহা, সাধু, লাহা, খান, দত্ত, দে, ধর, কর, নাগ, পাল, সিংহ, সেন, দাস, রুদ্র, কুণ্ড, ভদ্র, দাঁ, ছেঁচকি, পুটুলী।

গোয়াল—বারিক, চোয়াড়, ঢালী, ঘোষ, জানা, মণ্ডল, প্রামাণিক।

যুগী—অধিকারী, বিশ্বাস, দালাল, গোস্বামী, বাচনদার, মহাস্ত্র, মজুমদার, নাথজী, পণ্ডিত, রায়, সরকার।

কৈবর্ত (চাষী)—আদক, আরান, বাগ, বর্দ্ধন, বারিক, বেরা, বিশ্বাস, বড়াল, চৌধুরী, দাস, ঘড়ুই, গিরি, হলধর, হালদার, মান্না, কুণ্ড, লাহা, মাইতি, মল্লিক, মণ্ডল, মাঝি, মান্না, মেটে, লঙ্কর, পড়েল, পাটনায়ক, পাত্র, প্রধান, রোজা, সরকার, সেন, সাতরা, শস্মল।

কামার—অড়ি, দাস, দে, তেওয়ারী, দত্ত, মাথুর, লাহা, শীল, বাঘ, সেন, কুচনে, দেব, গাছ।

কায়স্থ (দক্ষিণরাষ্ট্রীয়)—বহু, ঘোষ, মিত্র, দাস, দত্ত, দে, গুহ, কর, পালিত, সেন, সিংহ, আদিভা, আইচ, অঙ্কর, অর্ণব, আশ, ওঝা, বৈতস, বল, বাণ, বন্ধ, বর্দ্ধন, বর্ধী, ভদ্র, ভগ্ন, ভুই, ভূত, বিদ, বিন্দু, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, চন্দ্র, দাহা, দানা, ধর, ধরনী, গণ, গণ্ড, .

গুহ, গুই, গুণ, গুপ্ত, হেম, হেশ, হোড়, হই, ইন্দ্র, যশ, ধিল, কীৰ্ত্তি, ফাম, ফেম, ফোম, কুণ্ড, লোধ, মানা, নাগ, নন্দী, নাথ, ওম, পাল, পিল, রাহা, রাউত, রাজা, রক্ষিত, রাণা, রঙ্গ, রুদ্র, সাঁই, শক্তি, শাল, শ্যাম, শান, শর্মা, শীল, সোম, শূর, স্বর, তেজ, উপমান।

বঙ্গ কায়স্থ—বহু, ঘোষ, মিত্র, গুহ, দাস, দত্ত, দেব, কর, পালিত, সিংহ; আদিভা, আইচ, অজুর, অর্ণব, বৈতন, বল, বাণ, বন্ধু, বর্দ্ধন, বর্ম্মা, ভদ্র, ভঞ্জ, ভুঁই, ভূত, বিন্দু, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, চন্দ্র, চাহা, দানা, ধনু, ধর, ধরনী, গণ, গণ্ডক, গুণ, গুপ্ত, হেম, হেশ, হোড়, পুই, ইন্দ্র, যশ, ধিল, কীৰ্ত্তি, ফাম, ফেম, ফোম, কুণ্ড, লোধ, মানা, নাগ, নন্দী, নাথ, পাল, পিল, রাহা, রাহুত, রাজা, রক্ষিত, রাণা, রঙ্গ, রুদ্র, সাঁই, শ্যাম, শর্মা, শীল, সোম, স্বর, তেজ, আচা, নন্দন, অবশক্তি, অপ, বেদ, ভূমিক, চাই, চাকী, দাম, দাঁড়ী, ঢোল, ধুম, দূত, ঘনিয়া, ঘাড়, হাতী, হোম, কচু, কড়েরা, মাগুরি, মানা, নাদ, নাহা, নলু, পই, পিপি, পুঁই, রীতি, রুই, সাঙা, স্মন, শন।

উত্তররাষ্ট্রীয় কায়স্থ—ঘোষ, মিত্র, দাস, দত্ত, কর, সিংহ।

বারেন্দ্র কায়স্থ—সিদ্ধ—চাকী, দাস, নন্দী। মাধা—দত্ত, দেব, নাগ, সিংহ। হেজ—দাম, ধর, গুণ, কর।

কোচ-রাজবংশী—ভৌমিক, চৌধুরী, দাস, মহৎ, মাঝি, তাঁতি, বাঁশরাড়, মগুণ উড়ে (শকুন উড়ে)।

কাওরা-খয়রা—মুদী, রায়।

কোটাল—প্রধান।

কুম্ভকার—বেহারা, বিশ্বাস, দাস, দেউড়ী, কুনকাল, মাঝি, মারিক, পাল, রাণা।

মোদক—মোদক, লাড়ু, রাণা, নন্দী, দাস, বিশ্বাস, আশ, চন্দ্র, দত্ত, বরাট, দে, দান, গুই, ইন্দ্র, লাহা, নাগ, নন্দী, রাজ, রক্ষিত, চাকী, মানা, ধাড়া, আশপতি, বাঘ, মালিক, গাবী।

মাল—হালদার, খামিদ, মেছুয়া, মাঝি।

মালী—মালাকার, মানা, শেঠ, মালিক, দত্ত, কর, দাস, পাল।

মালো—বেপারী, মাঝি, পাত্র।

জেলে, মালা—আড়শ, বাগ, বর্দ্ধন, বারিক, বেরা, বিছান্ত, বিষরী, বিশ্বাস, বড়াল, চৌধুরী, দাস, গলগুড়িয়া, হালদার, কুণ্ড, লাহা, মগুণ, মাঝি, মৌলা, পাঁকড়ে, পালদে, পাড়ই, পাত্র, প্রধান, রোজা, সাঁতরা, সরকার, সমুদল, সেন।

মুচি—মুচি, মুচিরামদাস, পাত্রদাস, রুইদাস।

নাপিত—বারিক, ভাণ্ডারী, বৈজ্ঞ, চন্দ্রবৈজ্ঞ, দাস, ক্ষৌরকর, খান, নরসুন্দর, নন্দী, প্রামাণিক, শীল, বিশ্বাস, মজুমদার, মগুণ, লাহা, সরকার, শিকদার, জোয়ারদার, ধাড়া, খটেল, বাঘ, রাণা, চন্দ্র, মানা, লাহা, বেজ।

পাটনী—গঙ্গাপুত্র, ষাটমারি, মারি, প্রধান।

পোদ—বৈভ, বিশ্বাস, হালদার, কয়াল, লঙ্কর, মণ্ডল, মিত্রী, পাইক, পাত্র, পুণ্ডরীকাক্ষ।

সদোপ—বালাগী, বিশ্বাস, দাস, ঘোষ, কোঁয়ার, নিয়োগী, পাল, সরকার, শূর, পীজা, পুরকাইত, রুড়মল, পান (পাইন), কলে, সঁতির, সামন্ত, সাঁপুই, পড়িয়াল, মালিক।

সাঁথারী—বন্ধু, ভদ্র, চন্দ্র, দাস, দত্ত, ধর, কর, কুণ্ড, নাগ, নন্দী, সেন, শূর, হাঁস, বন্ধু।

স্ববর্ণবণিক—আঢ্য, বড়াল, বর্দ্ধন, চন্দ্র, দান, দাস, দত্ত, দে, ধর, লাহা, মল্লিক, মণ্ডল, নন্দী, নাথ, পাল, পোদ্দার, রায়, সেন, শীল, সিংহ, পাইন (পাণি), দাঁ।

শূদ্র (গোলায়কায়স্থ)—ভাণ্ডারী, শিকদার।

শুঁড়ী—ভক্ত, ভূঞা, চৌধুরী, দাস, দেউড়ী, ছোঁধোঁধন, কীর্তন, মজুমদার, মণ্ডল, নির্ভয়, পোদ্দার, প্রধান, রায়, সাহা।

ছুতার—দত্ত, দে, কর, কুণ্ড, পাল, মিত্রী, রায়, চন্দ্র।

তান্বুলী—চৌধুরী, চৈল, দত্ত, দে, দুর, পাল, পাতি, রক্ষিত, সেন, সিংহ, আশ, গুহ, কুণ্ড, কর, নন্দী, সানাই, কোচ।

তাঁতী—বড়াশ, বসাক, বিট, ভড়, চাঁদ, দালাল, দাস, দত্ত, দে, গুঁই, যাচনদার, কর, লু, মণ্ডল, মুকিম, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, সাধু, সর্দার, সরকার, শীল, সেন, সিংহ, শেঠ, তোষ, গুজুরি, মান্না, কুণ্ড, ভদ্র, লাহা, বীর, রুই, ভদ্রবউ, ছাগলী, হাঁসী, মেঘা, রক্ষিত, আকুলি, মাকর, বড়ভাগিয়া, বা ঝাঁপানিয়া, ছোটভাগিয়া বা কায়ের তাঁতী।

তেলী—চৌধুরী, দে, ধবল, কুণ্ড, কোলমান, মণ্ডল, মশাস্ত, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, পরিহার, সাধবাঁ, সাহা, লীট, বারিক, মান্না, ছিলিমিলি (শ্রীমানী), আশ।

তিওর—চৌধুরী, ছড়িদার, মল্ল।

কাঁসারী—দত্ত, গুই, দেব, নন্দী, দাস, নন্দন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী

সন ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। সেই ভূমিকা পড়িয়া বুঝি, মাণিকরাম রাঢ়ের (মধ্য-রাঢ়ের) গ্রাম্য কবি ছিলেন, এবং তিনি ১৪৬৯ শকে ধর্ম-মঙ্গল রচনা করিয়াছেন।

সন ১৩১২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীব্রজমুন্দের সার্যাল ঐ ধর্ম-মঙ্গলের রচনা কাল ১৪৭০ শক অনুমান করিয়াছিলেন। উভয় কাল এক বলিতে পারা যায়। সাহিত্য-পরিষৎ ধর্মমঙ্গল খানি ছাপাইয়াছেন।

আমি রাঢ়ের চলিত শব্দের পুরাতনরূপ খুঁজিতেছিলাম। এই ধর্মমঙ্গলে পুরাতনরূপ পাইব আশা করিয়া উহার আত্মোপাস্ত পড়িয়াছিলাম। গ্রন্থের শব্দ দেখিয়া এবং পরে মাণিকরাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, সাহিত্য-পরিষদের বিদিতার্থে তাহা লিখিতেছি।

ছাপা মাণিকরাম পড়িতে পড়িতে অনেক কথা মনে হইয়াছিল। ইহার বি শেষ কারণ, শব্দ দেখিয়া মাণিকরামকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী মনে হয় নাই। অনেকের মতে কবিকঙ্কণ তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার চণ্ডী লিখিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম ও মাণিকরামের নিবাস নিকটে নিকটে ছিল বলিতে পারা যায়। অতএব উভয়ের ভাষায় শব্দ মিলাইবার সুযোগ আছে। এইরূপ তুলনা এবং শব্দের আকার স্মরণ করিয়া মনে হইতে লাগিল, দীনেশ বাবু তুল করিয়াছেন, মাণিকরাম কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী ছিলেন না, সম-সাময়িকও ছিলেন না, বরং আধুনিক ছিলেন। সন ১২৭৫ সালে কলিকাতার আহিরীটোলায় ছাপা কবিকঙ্কণ আমার লক্ষ্য ছিল।

মাণিকরামের ভাষায় কি দেখিয়া সন্দেহ জন্মে, তাহা লিখিতেছি।

(১) ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ের বহু ধর্ম-ঠাকুরের নাম আছে; যে যে গ্রামে তাঁহাদের মণ্ডপ আছে, সে সকল গ্রামেরও নাম আছে। অধিকাংশ নাম সংস্কৃত নহে, স্মৃতিরাজ্যে কালে কালে এইরূপ নামের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। আশ্চর্য্য, মাণিকরামের লিখিত নামগুলি অস্ত্রাপি পরিবর্তিত হয় নাই! কবিকঙ্কণও কয়েকটি গ্রামের নাম করিয়া গিয়াছেন। অনেক নাম এখন হঠাৎ ঠিক করিতে পারা যায় না। (এখানে বলিয়া রাখি, আমি মাণিকরামের লিখিত সকল গ্রাম ও ধর্ম-ঠাকুরের নাম শুনি নাই। উপস্থিত প্রবাসে কাহাকেও জিজ্ঞাসিবার সুযোগ পাই নাই। যে নামগুলি শুনিয়াছিলাম, সেইগুলি মিলাইয়া উক্ত মন্তব্য করিলাম।)

(২) বস্তুর বাঙ্গলা নামও অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হয়। জীবজন্তু, গাছপালা, বসন-ভূষণ প্রভৃতির যে নাম মাণিকরাম দিয়াছেন, সে সকলই প্রায় এখন চলিত আছে। যে নাম কবিকঙ্কণ দিয়াছেন, তাহার অনেক এখন পরিবর্তিত হইয়াছে।

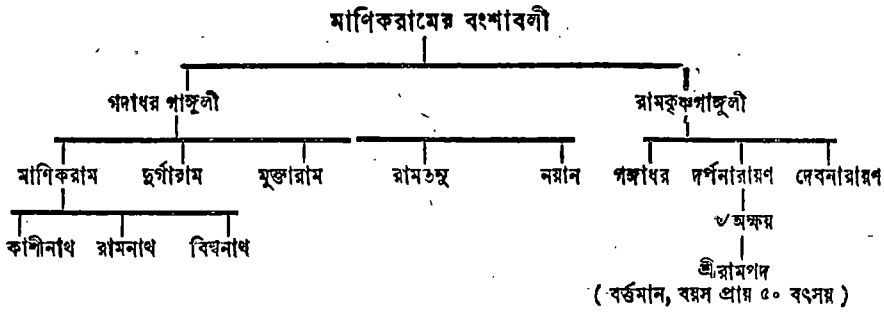
(৩) বিশেষতঃ, কালক্রমে ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত হয়। লেখককে চলিত ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিতেই হয়; বস্তুর নাম সংস্কৃত রাখিতে পারিলেও ক্রিয়াপদে কালের ধর্ম পরিবর্তন জানিতে হয়। মাণিকরামের ক্রিয়াপদ বর্তমানের তুল্য, কবিকঙ্কণের পুরাতন।

(৪) কবিকঙ্কণে আরবী, ফারসী শব্দ অল্প পাই, মাণিকরামে অধিক পাই; কবিকঙ্কণ সংস্কৃত জানিতেন; মাণিকরাম একবারে জানিতেন না এমন নয়। হয়ত

কবিকঙ্কণ সংস্কৃত শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন, হয়ত মাণিকরাম ছিলেন না। কিংবা হয়ত মাণিকরাম কবিকঙ্কণের পরে ছিলেন। আজ কাল আমাদের কথাবার্তার ভাষায় বহু মুসলমানী শব্দ আছে, বহুপূর্বে তত ছিল না। লেখক সাবধান না হইলে তাঁহার ভাষায় তাঁহার সময়ের প্রচলিত মুসলমানী শব্দ নিশ্চয় প্রবেশ করে। কবিকঙ্কণ ও মাণিকরাম চলিত ভাষা ত্যাগ করেন নাই।

একথাও মনে রাখিতে হইবে, কবিকঙ্কণ ও মাণিকরামে হাতের লেখা পুথি ছাড়া হয় নাই। তাঁহাদের পুথী দুই সময়ের দুই অমূল্যিকর গুহ্য করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যাবতীয় শব্দ, যাবতীয় ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব সাবধানে শব্দ বিচার করিলে লেখার কালের পৌরোপাখ্য ধরা পড়িতে পারে। এখানে প্রমাণ স্বরূপ শব্দের উল্লেখ না করিয়া অমূল্যজ্ঞান-ফল জানাইতেছি।

মাণিকরামের নিবাস বেলুড়িহা, চলিত কথায় বেলুড়ি গ্রামে ছিল। জাহানাবাদ হইতে এই গ্রাম পাঁচ সাত ক্রোশ পশ্চিমে হইবে। বেলুড়িহার পার্শ্ববর্তী গ্রামের কোন পরিচিত ভদ্রলোককে মাণিকরামের পুথির ও বর্তমান বংশধর সম্বন্ধে সংবাদ দিতে অমুরোধ করি। তিনি নিম্নলিখিত বংশাবলী দিয়া লিখিয়াছিলেন, “প্রায় ১৫০ বৎসর হইল মাণিকরামের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ৬০৬২ বৎসর আনন্দের হইয়াছিল। কবি মাণিকরাম যে একজন খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন তাহা নহে, তবে তিনি ধার্মিক লোক ছিলেন।”



কোথায় দীনেশ বাবুর অমুখ্যানে ৩৬০ বৎসর, আর কোথায় ১৫০ বৎসর! এই হেতু এই বংশাবলীতেও প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। ধর্মমঙ্গলে দেখিতে পাই, মাণিকরামের আর এক ভাই (ছকুরাম) ছিল। এই কারণে ঐরামপদ গাঙ্গুলী মহাশয়কে পত্র লিখি। তিনি উত্তরে লিখিলেন, “মাণিকরাম গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১০০ এক শত বর্ষ আত্মমানিক বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। * * * ৫৭ বৎসর কম হইতে পারে। * * * তাঁহার হাতের লেখা পুথির নকলের মধ্যে এই শ্লোকটি লেখা আছে। যেমন আছে ঠিক তদমুরূপ লিখিলাম—

“সাকে রীতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে ।
সিদ্ধি সহ জোগ দক্ষে জোগ তার সনে ॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত ।
সর্বরি সরাগি দণ্ডে যাজ হল্য গীত ॥”

উক্ত শ্লোকটি নকলের নকল বলিয়া ওরূপ অপ্রাকৃত ভাবে লেখা আছে । তাঁহার নিজের হাতের পুঁথি পাওয়া যায় না, যাঁহা পাইলাস তাঁহা লিখিয়া জানাইলাম ।

সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত ধর্মমঙ্গল শ্লোকটি আছে,—

সাকেরি ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে ।
সিদ্ধি সহ যুগ দক্ষে যোগ তার সনে ॥
বারে হল মহিপুত্র তিথি অব্যাহিত ।
সর্বরি সরাগি দণ্ডে সাজ হল্য গীত ॥

দীনেশবাবু উপরিউক্ত শ্লোকটি পড়িয়াছেন,—

শাকেরি ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে ।
সিদ্ধি সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে ॥

এবং ঐ অঙ্কের দক্ষিণা গতি ধরিয়া $৬৪৭ + ৮২২ = ১৪৬৯$ শকে গিয়াছেন । তিনি সিদ্ধি ৮, যুগ—২, পক্ষ—২ ধরিয়াছেন ।

বোধ হয়, শ্লোকটার অর্থ ঠিক হয় নাই । কারণ উপরে প্রদত্ত বংশাবলী দৃষ্টে এক শত কি দেড় শত বৎসর মাত্র পাই । সিদ্ধি—৮ বটে, কিন্তু সিদ্ধি—২৪ । যুগ—৪, পক্ষ—২ । অতএব এমনও হইতে পারে, $৬৪৭ + ২৪২৪ = ৩০৭১$ । এই অঙ্ক বামদিকে পড়িয়া গেলে ১৭০৩ শক পাই অর্থাৎ এক শত সাতাইশ বৎসর পূর্বে মাণিকরাম ধর্মমঙ্গল গান রচনা করিয়াছিলেন ।

এত বৎসর পূর্বে রাঢ়ে (মধ্যরাঢ়ে) নিরক্ষর লোকেরা যে ভাষার কথা কহিত, মাণিক-গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে তাহার আভাস পাইতেছি । ছই একটা শব্দ বুঝিতে পারিতেছি না ; কোন কোনটার লিপিকর ও মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটয়াছে । দেখা যায়, গত শত বৎসরের মধ্যে রাঢ় হইতে গুয়া, কাতি, সন্দেশ (নিদ্রাসমাবেশ), ডেড়ি (ফের, বিপদ), ফলা (সং ফলক-চাল), জোহার, নিকলা, ওলানা, ভেজানা, পেঁধা, লঘু ঘি করা (প্রস্রাব করা), এবং ঘোড়ার ও সৈন্তের সন্ধান ও কয়েক প্রকার রণযন্ত্রের নাম উঠিয়া গিয়াছে । আগস ও নিরাগেস শব্দদ্বয় শুনিতে পাই না, অর্থও বুঝি না । হয়ত মাণিকরামের সময়ে কয়েকটি শব্দ চলিত ছিল না ; তিনি প্রাচীন কবিগণের এবং তাঁহার আদর্শ ময়ূরভট্ট ও আদি রূপরামের গ্রন্থ হইতে লইয়াছিলেন । মাণিকরামের ‘গোপূর’ (গোপুরের স্বরূপ নারায়ণ) এখন গো-ঘাট, ‘তারামুনি’ এখন তারাজুনী (খাল) হইয়াছে । তাঁহার গ্রন্থের নায়ক লাউসেন ময়নাগড়ের রাজা ছিলেন । এই ময়নাগড় মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত । মাণিকরাম ময়নাগড় হইতে গোড়

যাইবার পথ অনেকবার বলিয়াছেন। কিন্তু সে পথ মেদিনীপুরের ময়নাগড়ঃবলিয়া বোধ হয় না; বোধ হয় ঝাঁকুড়া জেলার (এবং মাণিকরামের বাসগ্রামের কিছু দূরের) ময়নাপুর হইতে বর্ধমান দিয়া পথ। হাকঙ নামক স্থানে লাউসেন নিজের দেহের নব খণ্ড কাটিয়া ধর্মের উদ্দেশে বলি দিয়াছিলেন। ইহাতেও ধর্মরাজ সদয় না হওয়াতে শেষে লাউসেন নিজের মাথা কাটিয়া দিয়াছিলেন। এই বিষয় তপস্বী হইতে ‘হাকঙ করা’ অর্থে রাঢ়ে তুল্য আয়োজন বুঝাইয়া থাকে। শুনিয়াছি, কলিকাতায় ধর্মপুরাণ ছাপা হইয়াছে। তাহার অধ্যায় বিশেষের নাম হাকন্দপুরাণ আছে। দীনেশবাবু মনে করেন, সপ্তকাণ্ড শব্দের অপভ্রংশ হাকঙ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু গত বৎসরে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শূত্রপুরাণের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, হাকন্দ নামে এক গ্রাম আছে, এবং সে গ্রাম ময়নাপুরের কাছে। কিন্তু মাণিকরামের হাকন্দ ভারতবর্ষের পশ্চিমতীরের কোন স্থান মনে হয়। মনে হয়, অন্তকাণ্ড হৃষ্যের অন্তগিরির নামান্তর। হৃষ্যকে পশ্চিমে উদয় করাইবার নিমিত্ত লাউসেনের নিদারুণ তপশ্চর্যা। ‘চারিযুগে পশ্চিমে উদয় নাই শুনি’ ‘পশ্চিমে উদয় দিতে পারে নাই কেউ।’ লাউসেন নিরঞ্জন পূজা করিয়া শনিবার অমাবস্তার অর্ধরাত্রে অন্তাচলে হৃষ্যোদয় করাইয়াছিলেন। এই ব্যপারটার মূলে কি ছিল?

দীনেশ বাবু ধর্মমঙ্গলে মুসলমানী প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন, কেন না ধর্মঠাকুরের দ্বাদশ অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গে ‘দ্বাদশ আমিনীর কল্পনাও’ এই পুস্তকে আছে। দীনেশ বাবুর লিখিত ভূমিকা পড়িয়া মনে হয়, তিনি ধর্মঠাকুর এবং তাঁহার কামিনী বা কামিতা দেখেন নাই। আমিনী ও আমিতা, কামিনী ও কামিতার রূপান্তর, এবং ইহারা ধর্মঠাকুরের ব্রতভাতা। শূত্রপুরাণে মুসলমানী ভাবের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। উহাতে ষোল আনা আমিনী বা ধর্মকন্ডার উল্লেখ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ত্রীনগেন্দ্র নাথ বহু বলেন, লাউসেন প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে ছিলেন এবং লাউসেনের সময়েই ধর্মপুরাণের আদিকর্তা রামাই পণ্ডিত ছিলেন, সে সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে মুসলমানী প্রভাবের সম্ভাবনা ছিল না। পরে যেমন সত্যপীর হিন্দু দেবতা হইয়াছিলেন, ধর্মপুত্রার সঙ্গে মুসলমানীভাব আসিবার তেমন সম্ভাবনা ছিল না। শূত্রপুরাণের শেষে ‘নিরঞ্জন রুদ্ৰা’ পর্যায়ে ‘ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি।’ আমার বোধ হয়, জবনরূপ স্থান বিশেষের মাহাত্ম্য, ধর্মপুত্রার অঙ্গ নহে। লেখকের বাসগ্রামে তিন জাগ্রত ধর্ম-ঠাকুর—পঞ্চানন্দ, দল-মাদল, যাত্রাসিদ্ধি—আছেন। বাল্যকাল হইতে বহুবার নিরঞ্জন ধর্মের পূজা দেখিয়াছি, কিন্তু মুসলমানীভাব দেখি নাই। লোকে বরং শিব শালগ্রামকে উপেক্ষা করিবে, ধর্ম-ঠাকুরকে অনগ্রান করিয়া কেহ কখনও নিস্তার পায় নাই। ধর্ম-ঠাকুর নামেই প্রকাশ, তিনি নিরঞ্জন ধর্ম-ঠাকুর, এবং ধর্মমঙ্গলে তাঁহার মহিমা কীর্তন। ছুংথের বিষয়, ধর্মের গান অঙ্গে অঙ্গে উঠিয়া বাইতেছে। মাণিক-রাম গ্রাম্য কবি ছিলেন এবং গ্রাম্য লোকের মনে ধর্ম-ঠাকুরের প্রতি ভক্তি দৃঢ় করাইতে ধর্মমঙ্গলগান রচনা করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি তাঁহার গানের বিষয় এবং হয়ভ

কোন কোন পদও ময়ূরভট্ট ও আদি রূপরামের গ্রন্থ হইতে লইয়াছিলেন। ইহাদের মর্ম মঙ্গলের সহিত তুলনা না করিলে মাণিকরামের কৃতিত্ব বোধ্য যাইবে না। কৃতিত্ব যাহা হউক, মাণিকরামের গ্রন্থ সাবধানে মুদ্রিত হইলে রাতের গ্রাম্যশব্দের ভাণ্ডার হইতে পারিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

আয়ুর্বেদে অস্থিবিজ্ঞা

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

অস্থিসন্ধিগুলি ছই প্রকার, যথা—চেট্টাবান্ ও স্থির। চেট্টাবান্ অস্থিসন্ধিগুলি প্রয়োজন মত নস্ত ও উন্নত হইয়া থাকে। স্থির অস্থিসন্ধিগুলিতে সেইরূপ কোনও কার্য হয় না।

শাখাচতুষ্টয়, হস্ত ও কটাদেশস্থ সন্ধিগুলি চেট্টাবন্ত ইহা সূক্ষ্মভেদে মত। প্রত্যক্ষতঃ কশেরুকা সন্ধিসমূহেরও চেট্টা দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং সেইগুলিও চেট্টাবান্ সন্ধির উদাহরণ স্থানীয়। এতদ্ব্যতীত ত্রিকস্থ, করোটস্থ, উরঃস্থ এবং পঙ্কজ সন্ধিগুলি স্থির।

সন্ধিসংখ্যা

সর্ব সমষ্টিতে অস্থিসন্ধি ২১০। এতন্মধ্যে—শাখাচতুষ্টয়ে ৬৮, কোষ্ঠসমূহে, ৫৯, গ্রীবার উর্দ্ধে ৮৩, মোট—২১০।

শাখা	কোষ্ঠসমূহে	(উত্তমূঙ্গ) গ্রীবার উর্দ্ধে
অঙ্গুষ্ঠ	কটিকপালে	গ্রীবা
অঙ্গুলি	পৃষ্ঠবংশ	কণ্ঠ
প্রঃ ৩টা X ৪ = ১২	পার্শ্ববংশ	দন্তমূল
জাম্ব (কুর্পর)	বক্ষঃ	কাকলক
গুল্ফ (মণিবন্ধ)		(কণ্ঠমণি)
বক্ষণ (কক্ষা)		নাসা
প্রঃ ১৭	হৃদয় ক্লোমনিবন্ধ	বর্তমণ্ডলজ
৪	নাড়ীতে	নেত্রাশ্রিত
৬৮		গণ্ড
		কর্ণ
		শঙ্খ
		জ্বর উপরে
		শঙ্খের উপরে
		হস্ত
		কপাল
		মূর্ধা
		৬৫

এই সন্ধিসংখ্যা গণনায় নানা প্রকার সন্দেহের সঞ্চার হয়।

প্রথমতঃ=পূর্বে বলা হইল, “শাখাষষ্ঠ্যষ্টিঃ, একোনষষ্টিঃ কোষ্ঠে, গ্রীবাং প্রত্যুর্দ্ধং ত্র্যশীতিঃ।”

গণনানুসারে শাখাতে ৬৮টি ঠিক হইল।

এখন কথা হইতেছে, কোষ্ঠ লইয়া কোষ্ঠ=কুক্ষেমধ্যে (মেদিনী ঠিককং)

অন্তর্জঠরং (অমর নানার্থ)

মহাশ্রোতঃ (অরুণদত্ত পাণ্ডুনিদানে)

“স্থানাত্মান্নিপকানাং মুত্রস্ত রুধিরস্ত চ।

হৃৎকুক্ষ ফুস্ফুসচ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে ॥”

অর্থাৎ আমাশয়, পিত্তাশয়, পকাশয়, মূত্রাশয় (বা বৃক-?), রক্তাশয়, হৃদয়, উত্তুক ও ফুস্ফুস ইহাদের সাধারণ নাম কোষ্ঠ।

সুতরাং কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় হইতে অগ্নি বায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় অংশটিকে বুঝাইতেছে।

সুশ্রুত কটীকপাল, পৃষ্ঠবংশ, পার্শ্ববয় ও বক্ষঃ এই কয়টি স্থান গণনা করিয়া যে ৫৯টি অস্থিসন্ধি নির্দেশ করিয়াছেন, তদ্বারা পূর্বোক্ত কোষ্ঠস্থিত ৫৯টি অস্থিসন্ধিরই যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহারপরই “গ্রীবাং প্রত্যুর্দ্ধং ত্র্যশীতি” বলিয়া “গ্রীবায়াং ভাবস্ত এষ (অষ্টৌ)” আরম্ভ করিয়া উত্তরাদেশের যে সন্ধি গণনা করিয়াছেন তদ্বারা ৬৫টি মাত্র পাওয়া যায়।

অবশিষ্ট ১৮টি সন্ধি কোথা আছে? ইহার উত্তরে সুশ্রুত বলিতেছেন—

“নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমনিবন্ধান্স অষ্টাদশ”

হৃদয় ও ক্লোমনিবন্ধ নাড়ীতে ১৮টি অস্থিসন্ধি আছে।

এই পাঠানুসারে কয়েকটি আপত্তি হয় যথা—

১। হৃদয় ও ক্লোমনিবন্ধ নাড়ীতে অস্থিসন্ধি থাকিলে তাহার গণনা কোষ্ঠসন্ধির সহিত করা হইল না কেন?

২। গ্রীবার উর্ধ্বে হৃদয়ক্লোমনিবন্ধ নাড়ী আছে কি না?

৩। নাড়ীষু এই বহুবচন পাঠের সার্থকতা কি?

৪। কণ্ঠনাড়ীতে যে চারিখানা অস্থিগণনা করা হইয়াছে এবং বাহাদের তিনটি সন্ধির কথাও বর্ণিত হইয়াছে, সেই কণ্ঠনাড়ীর সন্ধিভ হইাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

৫। অস্থিসংখ্যা নির্দেশে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই কেন?

৬। “কণ্ঠহৃদয়নৈত্রক্লোমনাড়ীষু যশ্চালা” এই পরবর্তী পাঠে হৃদয় ও ক্লোমের মধ্যে নৈত্র শব্দের উল্লেখ থাকাতো বুঝা যায় যে, কতকগুলি হৃদয়নিবন্ধ নাড়ীতে, কতকগুলি ক্লোমনিবন্ধ নাড়ীতে।

৭। হৃদয়ক্লোমনিবন্ধ নাড়ী কোনটী ? হৃদয় ও ক্লোম কি ?

এই আপত্তিগুলির সহজতর আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কেহ যদি করিতে পারেন বাধিত হইব। তবে ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে মনে করিয়া যাহারা বুঝা জ্ঞানা বা তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন আমি তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিতেছি।

সুশ্রুত ১৪টী অস্থিসংঘাতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

যে সন্ধিতে তিন বা ততোধিক অস্থি মিলিত হইয়াছে তাহার নাম অস্থিসংঘাত ॥

অস্থিসংঘাত ১৪টী। তন্মধ্যে—

গুল্ফ বা পাদমূল	১
মণিবন্ধ বা করমূল	১
জাহ্নু	১
কুর্পর	১
বৎসপ	১
কক্ষা	১
প্রঃ	৬
২ সন্ধি ২ বাহু	২
	১২
জিক	১
শিয়ঃ	১
সমষ্টি	১৪

অস্থিসন্ধির আকৃতি

অস্থিসন্ধির আকৃতি নানাবিধ হইলেও এই গুলিকে শ্রেণীভেদে ভাগ করা যাইতে পারে। এইজন্ত সুশ্রুতে ৮ প্রকার ভেদের উল্লেখ আছে।

১। কোর সন্ধি=কোর=গর্ত, গর্তাকার সন্ধি।

২। উদুখল সন্ধি=উদুখলে, বিস্তৃত মুখে বেক্রপ ভাবে মূল্যটা থাকে উদুখল সন্ধির অস্থিও সেই ভাবে থাকে।

৩। সামুদগ সন্ধি=সামুদগ=সম্পূট, এক থানা খোলা দিয়া আর একথানা খোলা ঢাকিয়া রাখা। কোন অস্থি অপর অস্থিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া যদি সন্ধির উৎপন্ন করে সেই সন্ধির নাম সামুদগক সন্ধি।

৪। প্রতর=যে সন্ধির অস্থি দুই একটীর উপর আর একটী বিস্তৃত ভাবে থাকিয়া বেশ খেলিয়া থাকে সেই সন্ধির নাম প্রতর সন্ধি।

৫। তুলসেবনী—তুলসের সেলাইয়ের মত। ছইটী জিনিসের ছইমুখে সেলাই করা। অথচ একটীর উপরে আর একটী নহে।

৬। বায়সতুণ্ড—কাকের মুখ সদৃশ।

৭। মণ্ডল—গোলাকার।

৮। শাখাবর্ত—শাখার আবর্তবৎ।

অস্থিসন্ধির স্থান নির্দেশ

১। কোর ৬৪	{	১। অঙ্গুলি ৫৬, ২। মণিবন্ধ ২, ৩। অঙ্গুলক ২,
		৪। ভ্রূ ২
		৫। কূর্ণর ২
২ উদুখল ৩৬	{	১ কক্ষা ২
		২ বংকণ ২
		৩ দশন ৩২
৩ সামুদ্র ৬	{	১। অংসপীঠ ২
		২। শুদ ১
		৩। ভগ ১
		৪। নিভষ ২
৪ প্রতর ৩২	{	১। গ্রীবা ৮
		২। পৃষ্ঠবংশ ২৪
৫ তুমসেবনী ৮	{	১। শিরঃকপাল ৫
		২। কটীকপাল ৩
৬ বায়সতুণ্ড ২—		১। হস্থ ২
৭ মণ্ডল ২৩	{	১। কণ্ঠনাড়ী ৩, ২। হৃদয়নাড়ী
		৩। ক্রোমনাড়ী ১৮, ৪। নেত্রনাড়ী ২
৮ শাখাবর্ত ৪	{	১। শ্রোত্র ২
১৬৯		২। শৃঙ্গাটক ২

আমরা এখানেও নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। এই গণনানুসারে ৪১টা সন্ধির
অস্থিসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। যথা—

পার্শ্বদ্বয়	২৪
কক্ষঃ	৮
কাকলক	১
নাসা	১
গণ্ড	২
ক্রুর উপরিস্থ	২
শাখার উপরিস্থ	২
মূৰ্দ্ধা	১

এতদ্ব্যতীত পার্শ্বদ্বয়ের হিসাবে অংশীদার ২ খানার ও নিতম্বাঙ্গির ২ খানা অঙ্গির সন্ধি ৪টি বাদ দিলে যে ৩৭টি অঙ্গিসন্ধি বাকী থাকে, তাহারা কোনশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবেক।

আর সামুদ্রগ শ্রেণীতে যে ৩৭ ও ভগাঙ্গি সন্ধির উল্লেখ আছে, সন্ধিগণনাকালে ইহাদের নামকরণ হয় নাই কেন ?

উপরি উক্ত নানা কারণে আয়ুর্বেদের অঙ্গিসন্ধির অঙ্গসন্ধানে আমাদের নানা প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যাইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের মজ্জাগত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্র পাঠে “পাঠ লাগান” বই অথ কোন কার্য্য আমাদের ঘারা হইবে না।

এই ক্ষণে ভগবান্ ধনুস্তরি বলিয়াছেন—

“প্রত্যক্ষভো হি যদৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যন্তবেৎ।

সমানন্তরভূতয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্জনম্ ॥”

অঙ্গিসন্ধি গণনা ও অঙ্গিসন্ধির প্রকৃতি স্থির করিতে হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আবশ্যক। এখন প্রত্যক্ষমূলক কয়েকটি কথা বলিয়া আমি উপসংহার করিব।

প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ দর্শনে অঙ্গিগুলির আকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিলে পরে অঙ্গিসন্ধির জ্ঞানটা সহজ হইয়া আইসে।

উক্ত অঙ্গি খানার আকৃতি দুই দিকে ঠিক এক প্রকার নহে। এক প্রান্তে একটা-গ্রীবা-যুক্ত মস্তক রহিয়াছে। অথ প্রান্তে দুইটা গর্ভের মত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, এই মস্তকটা যেখানে সংযুক্ত হইয়াছে সেই স্থানটীতে একটা গোলাকার গর্ভ বিদ্যমান আছে এবং অপর প্রান্তের গর্ভে অঙ্গ অঙ্গির প্রান্ত আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং অঙ্গিসন্ধির বিষয় বুঝিবার পূর্বে অঙ্গিগুলির আকৃতি বিষয়ে সুন্দর জ্ঞানের আবশ্যক হয়।

অঙ্গি-সন্ধির বিবরণ

নাম	অঙ্গিধর্ম ও বিবরণ।	জাতি	শ্রেণী
কটী কপাল	ইহার অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। কটী বা নিতম্বের গঠনে নিতম্বাঙ্গি ও ত্রিক অঙ্গিই প্রধান। কটীকপালে যে তিনটি সন্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই তিন খানা অঙ্গির কোন কোন অঙ্গির মিলনে প্রাপ্ত ? কপাল শব্দের সঙ্গতি অনুসারে, কটীকপাল অর্থে, শ্রোণীফলক বুঝা যায়। অপর এই তিনটি সন্ধি তুরসেবনী শ্রেণীর এবং স্থির জাতীয়। পক্ষান্তরে সমুদ্র জাতীয় সন্ধিসমূহের স্থান নির্দেশে	স্থির	তুরসেবনী

“অংশপীঠপদভগ্নিতথেষু সামুদগাঃ।” এই বচনের অর্থানুসারে নিতম্বে যে চারিটা সামুদগ সন্ধির কথা বলা হইল, তাহাতে নিতম্বে ফলকের সন্ধিই বুঝা যায়। অথচ কটা কপাল শব্দে এখানে কপালশব্দের সাংক্ৰান্ত্য রাখিলে আর সেই অর্থ হয় না। সুতরাং এখানে কটা কপাল অর্থ ত্রিক অস্থিটী ধরিলে সমুদায় গোলমাল চুকিয়া যায়। ত্রিক অস্থিতে তিনটা সন্ধি আছে। যথা—১ পৃষ্ঠবংশ + ত্রিক, ১ উত্তর ত্রিকের $\frac{1}{2}$ অংশ + উত্তর ত্রিকের অর্দ্ধ অংশ—১ উত্তরাধর ত্রিক সংযোগ। তবে যাহারা “শিরঃ কটীকপালেষু তুরসেবনী” ইহার অর্থ মন্তক, কটা ও কপাল-দেশের সন্ধি করেন, আমি তাহাদিগকে “ত্রয়ঃ কটীকপালেষু” ও “পঞ্চ শিরঃ-কপালেষু” এই পূর্ববর্তী বচন দুইটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলি, তবে যাহারা ইহার অর্থ “কটা ও কপাল-দেশে” এবং মন্তকের কপালে (মাথার খুলিতে) করিয়াছেন, তাহাদিগকে নমস্কার। *

পৃষ্ঠবংশ

পৃষ্ঠবংশের অস্থিসংখ্যা মোট ২৪।২৫ খানা। সঞ্চারী প্রত্যর তদনুসারে সন্ধি-সংখ্যা গণনা করিলে ২৪ খানা সন্ধি হইতে পারে। কিন্তু পৃষ্ঠবংশের অস্থিগণনা কালে তাহাতে প্রধান ভাবে ১৬।১৭ খানা অস্থির কথা বলা হইয়াছে। বাকী ৮।২ খানা অস্থি ত্রিকের মধ্যে গণনীয়। ত্রিকের প্রধান সন্ধিগণনা পূর্বে কটা কপাল শব্দে বলা হইয়াছে। অথচ এখানে পুনরায় তাহার উল্লেখ হইতেছে। সামান্য ভাবে কথাটা স্বীকার করিয়া লইলেও সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না।

পার্শ্ববংশ

প্রত্যেক পার্শ্বে ১২টা অস্থিসন্ধির কথা বলা হইল। এই দ্বাদশটা সন্ধি পশ্চাকা ও পৃষ্ঠবংশ সংযোগে হইয়াছে, এবং দুই পার্শ্বে মোট সন্ধি সংখ্যা ২৪। এতদ্ব্যতীত পশ্চাকার আরও সন্ধি আছে। বক্ষোস্থির

* বেণীমাধবের হস্তত। বঙ্গবাসীর হস্তত।

উঃ

সহিত-এবং কয়েকখানা পুস্তককার পরস্পর সংহতি।
এতদ্ব্যতীত বঙ্কোহস্থির নির্মাণেও কয়েকটি সন্ধি আছে।
এখানে মোট সন্ধি সংখ্যা।—

(ক) বক্ষঃ অস্থিতে — ৩ ————— ৩

(খ) বক্ষঃ অস্থি + দক্ষ পুস্তকা } ১৪
 " + বাম " " }

পুস্তকা গত ১০
২৭

গ্রীবা

পঞ্চাৎ করোটির নিম্নভাগ

সঞ্চারী প্রান্তর

১ম গ্রীবাস্থি	সংযোগে	১
১ম + ২য়	"	১
২য় + ৩য়	"	১
৩য় + ৪র্থ	"	১
৪র্থ + ৫ম	"	১
৫ম + ৬ষ্ঠ	"	১
৬ষ্ঠ + ৭ম	"	১
৭ম + ৮ম	"	১
		৮

এখানে অস্থি সংখ্যানুসারে একটি কম বা বেশী
হইতে পারে।

কণ্ঠ

দক্ষ অক্ষক প্রান্ত ও বঙ্কোহস্থি যোগে ১ স্থির

বাম " " যোগে ১

১ম বঙ্কোহস্থি ও দ্বিতীয় বঙ্কোহস্থি যোগে ১

৩

তবে ইহার অর্থ কণ্ঠনাড়ীও করা যাইতে পারে।
ঋগ্বেদ জাতীয় সন্ধির উদাহরণে কণ্ঠ নাড়ীর বিশেষ
উল্লেখ আছে। তবে ইহারই পরে কাকলক ও হৃদয়
কোষ নিবদ্ধ নাড়ীর কথা বলা হইবে। ঐ নাড়ীর প্রথম
তিন খানা অস্থিকে কণ্ঠ নাড়ীর অস্থি মধ্যে গণনা
করিলেও চলিতে পারে। বস্তুতঃ কাকলক ও কণ্ঠ নাড়ী
তিনখানাকে স্বতন্ত্র রাখা প্রয়োজন এবং তদনুসারে

এই অস্থি তিনধানাকে কণ্ঠ নাড়ীর অস্থি বলাই উচিত।
কিন্তু এই ব্যাখ্যা করিলে অক্ষকের সন্ধি গণনা এক
বারেই থাকে না।

হৃদয় ক্রোম-

নিবদ্ধ নাড়ী

হৃদয় ক্রোম নিবদ্ধ নাড়ী কি? এই নাড়ীটি
কি? খাসনদীতে কতকগুলি তরুণ অস্থি আছে
এতদ্ব্যতীত এইস্থানে কোন নাড়ীতেই অস্থি নাই।
আমরা পূর্বে যে অস্থি গণনার হুটীপত্র প্রকাশ
করিয়াছি তাহাতে কোন মতেই এই অস্থি গুলির উল্লেখ
নাই। তবে চরকে যে বক্ষঃ অস্থি বলিয়া ১৭ থানা
অস্থির নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই কি এই
নাড়ী অস্থি? তাহা যদি স্বীকার করা যায় তাহাইলে
পূর্বে বক্ষোহস্থি বলিয়া শিশুরের (Starnum) যে
অস্থি সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে তাহার কি হইবে?
আমরা এই তর্ককর্কশ পথে না গিয়া যদি প্রকৃত বিষয়
নিরীচনের জন্তই আগ্রহ হই, তাহা হইলে এই
নাড়ীটিকে হুস্ হুস্ নিবদ্ধ নাড়ীই বলা উচিত। স্থান
ও সন্ধির আকৃতি অনুসারে এই কয়টি মণ্ডল শ্রেণীর
সন্ধি। সুতরাং আর বৃথা তর্কের অবসর না দিয়া অস্থি
সন্ধির নির্দেশ মত কয়েকখানা নুতন অস্থি স্বীকার
করিলে সমুদায় গোল মাল চুকিয়া যায়। (এখানকার
ক্রোম শব্দটি সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিব।)

হির মণ্ডল

দন্তমূল

২ থানা গণ্ড অস্থিতে ১৬ টি গর্ত এবং হৃদয়স্থিত
১৬টি গর্ত আছে, এই গর্ত গুলিতে স্নায়ুদ্বারা দন্তসমূহ বদ্ধ
থাকে। দন্তোৎপত্তি কালে এই গর্ত হয় এবং দন্ত স্বাভা-
বিক পতিত হইলে বুদ্ধাবস্থায় গর্তগুলি মিলাইয়া যায়।

হির উদুখল

কাকলক

কণ্ঠমণি, কণ্ঠনাড়ীর অস্থির সংযোগে।

হির মণ্ডল

নাসা

ঘোণাস্থি ও ললাটস্থি যোগে।

হির সীবনী

বক্ষঃমণ্ডল

ললাটস্থি ও গণ্ডাস্থি যোগে।

হির সীবনী

গণ্ড

উত্তর-গণ্ড ও অধর গণ্ডের সংযোগে একটা সন্ধি

হির সীবনী

আছে। এতদ্ব্যতীত অস্থি অস্থির সহিত ইহার সংযোগ
আছে। সুতরাং এখানে একটা সন্ধি না বলিয়া আরও
বেশী বলা উচিত।

কর্ণ শব্দাঙ্কিত সহিত কর্ণের তরুণাঙ্কিত সংযোগ কেবল স্থির সীবনী
 স্নায়ু ঘরাই আছে। ইহাকে সন্ধি বলাই ভাল।
 শব্দ তবে ইহার শ্রেণী-করণে শব্দাবর্ত বলায় উদ্দেশ্য বুঝিতে
 পারা গেল না।

শব্দের অস্থি সন্ধি পার্শ্ব করোটি ও পশ্চাৎ করো- স্থির সীবনী
 টার:ললাটাস্থি সহ। ইহা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহার
 বিশেষবৃত্তিউল্লেখ নাই। উহাদিগকে তুলসেবনী শ্রেণীর
 বলা যাইতে পারে। কিন্তু যতদূর বুঝা যায় ইহাকে
 সম্পূর্ণ সেবনী শ্রেণীর অন্তর্গত করাই উচিত। জ্বর
 উপরের সন্ধিটী ইহারই অন্তর্গত।

হস্ত গণ্ড ও শব্দযোগে সন্ধি উৎপন্ন। চল যায়সতুও
 শিরঃ কপাল ১ ললাটাস্থি + দক্ষ পার্শ্ব করোটি স্থির সেবনী

১ „ + বাম „ „

১ দক্ষ পাঃ করোটি + পশ্চাৎ করোটি

১ বাম „ „ + „ „

১ মধ্য করোটি + অত্যন্ত অস্থি।

অঙ্গুলি ২ পর্ক গত } অঙ্গুলি চল কোর
 ২ পর্ক + শলাকা } $3 \times 8 = 12$

অঙ্গুষ্ঠ ১ পর্ক গত } ২ চল কোর
 ১ পর্ক + শলাকাধিষ্ঠান }

মণিবন্ধ ও গুল্ফ } ইহাদের এক একটা করিয়া সন্ধি গণনা নিতান্ত স্থূল। চল কোর
 বরং ইহাদিগকে অস্থিদৃষ্ট্যত বলা হইয়াছে তাহাই
 শিষ্ট সম্মত। প্রত্যক্ষতঃ এখানে অনেকগুলি সন্ধি
 আছে। এবং শব্দবিৎ চিকিৎসকের পক্ষে তাহা সুস্থ
 ভাবে জানা বড় আবশ্যক।

জাহ্ন জজ্বার দুই থানা, অঙ্গী ও উরু অস্থির সংযোগ। চল কোর

কুর্পূর অরঞ্জির দুই থানা ও প্রগণ্ডের অস্থি সংযোগে। চল কোর

কক্ষা অংসফলক + অক্ষক + প্রগণ্ড অস্থি সংযোগে চল উদুখল

বংক্ষণ শ্রোণীফলক + উরু অস্থি চল উদুখল

সংক্ষেপে অস্থি সন্ধি সমূহের যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তথা হইতে পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা
 অসম্ভব। শরীর তত্ত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষ সাধ্য। এখানে স্থূল গণনার প্রতি আস্থা প্রকাশ করিয়া

কেবল পুষ্টি গুণ বিজ্ঞান অর্জন করিলে প্রতিপদে ভ্রম থাকিবেক। বিস্তৃত ভাবে অস্থি-সন্ধি ভদ্র জানিতে হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে বলবৎ করিয়া গ্রন্থ রচনা ও উপদেশের ব্যবস্থা আবশ্যক।

এই বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে দুইটা পস্থা আছে।

প্রথমতঃ—আয়ুর্বেদের এই সংক্ষিপ্ত টুকুকে মূল করিয়া শব্দব্যবচ্ছেদ ও কঙ্কাল পরিদর্শন করিয়া নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন। এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে বহু আয়াস এবং বহু আলোচনার আবশ্যক হইবে। তবে এই ভাবে আলোচনা হইলে তাহা মৌলিক হইবে এবং অনুকৃতি বা অনুবাদের দোষ থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ—অনুবাদ। যাহারা এখন শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া ও কঙ্কাল দর্শন করিয়া শরীর বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন সেই বৈদেশিকগণের গ্রন্থ সমুদায় অনুবাদ করিলে কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে। তবে এইরূপ অনুবাদে মৌলিক গবেষণার অভাববশতঃ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের বড় অভাব হয় এবং সময়ে সময়ে অনুবাদ অপেক্ষা মূলভাষার গ্রন্থ পাঠেই অধিক আনন্দ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই অনুবাদ দ্বারা যদি আয়ুর্বেদের কোন রূপ হানি হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে এই কার্য্য না হওয়াই প্রার্থনীয়।

এখানে অনুবাদের সহায়তার জন্ত কয়েকটা পারিভাষিক শব্দ সংগৃহীত হইল।

চলাচল ও চলসন্ধি।

স্থান	সন্ধি শ্রেণী	আয়ুর্বেদোক্ত স্থান নাম	সুশ্রুত সন্ধি শ্রেণী	নূতন নাম
Body of spine	Amphearthrodial	পৃষ্ঠবংশ	প্রভর	চলাচল
Process of do.	Arthrodial			
Atlas + spine	Arthrodial	গ্রীবাস্থি	প্রভর	
Do. + Occipital	Condylaloid			
Lower jaw	Gynglymo-Arthrodial	হস্ত	বায়সতুণ্ড	
Head of Ribs				প্রভর
+Body of spine	Arthrodial			
+Process of votibra	„			প্রভর
Rib+Sternum	„			প্রভর
Rib+ Rib	Amphearthrodial			চলাচল
Sacro-iliac	„			প্রভর
Sacrum +				চলাচলগীবনী
Coccyx				
Sterno+	Arthrodial	বক্ষোস্থি +	প্রভর	

স্থান	সন্ধি শ্রেণী	আয়ুর্বেদোক্ত স্থান নাম	সুশ্রুত সন্ধিশ্রেণী	নূতন নাম
Claviocular		অক্ষক		
Acromeo- claviocular	Arthrodial	অসফলক + অক্ষক	প্রতর	
Shoulder	Enarthrodial	কক্ষা	উদুখল	চলোদুখল
Elbow	Gynglymus	কুর্পর	কোর	
Sup: Radio- Ulnar	Trochoid			চক্রাকার
Mid. „ „	by the ligament oblique			
Inf „ „	Trochoid			চক্রাকার
Wrist	Condylloid	মণিবদ্ধ	কোর	অণ্ডকোর
Ist Row carp. bone	Arthrodial			প্রতর
2nd. „ „ „				প্রতর
Carpo- Metacarpal	Arthrodial			প্রতর
Metacarpophalangeal,	Condylloid		কোর	অণ্ডকোর
Phalangeal	Ginglymus	অঙ্গুলিসন্ধি	কোর	
Hip joint	Enarthrodial	বৎফণ	উদুখল	চলোদুখল
Knee	Ginglymus	জাহ্ন	কোর	কোরসজ্জাত
Sup: Tibio- Fibular	Arthrodial			প্রতর
Inf. „ „				„
Mid „ „			„	„
Ankle	Ginglymus	গুল্ফ	কোর	প্রতর
Astra-Navicular	Arthrodial			„
Tarso- metatarsal	Do			প্রতর
Metatarso + phalange	Condylloid			অণ্ডকোর

অচলসন্ধি।

স্থান	সন্ধি শ্রেণী	আয়ুর্বেদোক্ত স্থান নাম	সুশ্রুত সন্ধিশ্রেণী	নূতন নাম
Synarthrosis				
Cranium	Synarthrosis	শিরঃকপাল	স্থির	অচল
Prietaal Bone	Sutura Dentata	পার্শ্বকরোটি	স্থির	দন্তসীবনী
Frontal „	„ Serrata	ললাটাস্থি	স্থির	ক্রকচসীবনী
Parietal + Frontal	„ Limbosa	পার্শ্বকরোটীললাটাস্থি	স্থির	যুক্তসীবনী
Sqamo-Parietal,	„ Squamosa			
Palate Bone	„ Harmonia	ভাষস্থি	স্থির	সমসীবনী
Sphenoid + Vomer	Schindylesis	কণ্ঠ্যবোলাস্থি	স্থির	—সামুদ্রগ
Sup: max. + Patate	„	গণ্ডভাষস্থি	স্থির	—সামুদ্রগ
Teeth + Max.	Gomphosis	দন্ত হস্ত	স্থির	অচলোদ্ধল
Longbone + certes	Synchondrosis			
	Sutura Notha	শব্দ	স্থির	সামুদ্রগ

পারিত্যয়িক শব্দ

Joint	}	অস্থি সন্ধি
Articulation		
(১) Synarthrosis	}	স্থির, অচল
Immovable		
(২) Diarthrosis	}	চল
movable		
(৩) Amphiarthrosis	}	চলাচল
mixed		
(১) (ক) Sutura		সীবনী
(১) „ Vera		তুলসীবনী
(১) „ Dentata		দন্তসীবনী
(২) „ Serrata		ক্রকচ সীবনী
(৩) „ Limbosa		যুক্তসীবনী
(১) „ Notha		সম্পূট বা সামুদ্রগ
(খ) Schindylesis.....		সামুদ্রগ

- (গ) Gomphosis..... কীলকসন্ধি (উদুখল ?)
 (ঘ) Syochondrosis.....
 (২) (ক) Gynglymus } কোর সন্ধি
 or
 Hinge Joint }
 (খ) Trochoid চক্র কোর
 (গ) Condylloid অঞ্জ কোর
 (ঘ) Saddle Joint কুজ কোর
 (ঙ) Enathrosis চলোদুখল
 (চ) Arthrodia প্রত্যর
 বায়সতুণ্ড
 মণ্ডল
 শঙ্খাবর্ত

শ্রীহুর্গানারায়ণ সেন ।

১। আরবী খোদিতলিপির অনুলিপি।

- فيرجوا من الفقهاء بافئد دعوة * لتثبيت ايمان اوان العفادس
 جرى الله خيراته محض رحمة * و برو احسان لعا (؟) القلانس
 * لنصب واتخاذ المدارس
 نصير محمد * يلقب بالدهان قاضي العمارس (؟)
 في الدين حسنة * ليرضي به الرحمن من كل دارس
 * و اظهار دين الله من الع- ... س
 عضلة قب من الدين سعي *
 بيوم (؟) سلطان السلاطين عمدة * حكي عن عهد الخير لكل العمالس
 * بتوك ظفر خان هز برالع- ... س
 * وسيد بناء الخير بعد الفوارس
 وقاع علوج الكفر بالسيف والقذا * وبذل كنوز المال في كل
 وتعظيم علماء الشريعة جملة * لاعلاء اعلام العالم العفادس
 بتاريف حاء من سنيين وصادها * وخاء حروف الوقف حسبان قانس

২। খোদিতলিপি।

الحمد لولى الحمد .. يتكيت هذه المدرسة المسماة دار الخيرات في
 عهد سلطنة والى المبرات صاحب التاج والخاتم ظل الله في العالم المكرم الاكرم
 الاعظم مالك رقاب الامم شمس الدنيا والدين المخصوص بعناية رب العالمين
 وارث ملك سليمان ابو ... المظفر فيروز شاه السلطان خلد الله سلطانه
 بامر الخان الاجل الكريم المبجل الجليل العطاء الجميل الثناء نصير الاسلام ظهير
 الانام شهاب الحق والدين معين الملوك والسلاطين مرني ارباب يقين خان
 محمد ظفر خان اظفرة الله باعدائه و عطفه على اوليائه ... في غرة المحرم
 المضاف الى سنة ثلث عشرة وسبعمائ *

৩। নাসিরুদ্দীন মহম্মদ সাহের খোদিতলিপি ।

قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله و اليوم الآخر و اقام الصلوة و ادى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وقال عز من قائل جل جلاله و غم نواله ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و قال النبي صلى الله عليه و على اله و اصحابه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة المؤيد بتأييد الرحمن بالحجة و البرهان غوث الاسلام و المسلمين ناصر الدنيا و الدين ابوالمظفر محمود شاه السلطان خلد ملكه و سلطانه و على امره و شانه بنه البخان الاعظم المعظم المكرم المخاطب بخطاب تربيت خان سلمه الله تعالى عن افات اخر الزمان بمنه و كمال كرمه في سنه الحادي و ستين و ثمان مائه *

৪। খোদিতলিপি ।

قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا بنى المسجد البخان الاعظم و الخاقان المعظم الغ اجمل خان سلمه الله تعالى فى الدارين سرخيل خان معظم اقرار خان جانداز عز محل و سر لشكر و وزير عرصه ساجلا منكبهاد و شهر لا بلا دامت معاليه في العهد الملك العادل الباذل الفاضل الكامل ياربك شاه بن محمود شاه السلطان في تاريخ الحادي من المكرم و ستين ثمان مائة *

৫। খোদিতলিপি ।

قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و قال عليه السلام من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله له في الآخرة سبعين قصرا بنى المسجد في عهد السلطان الزمان المؤيد بتأييد الديان خليفة الله بالحجة و البرهان السلطان ابن السلطان شمس الدنيا و الدين ابوالمظفر يوسف شاه السلطان ابن ياربك شاه السلطان ابن محمود شاه السلطان خلد الله ملكه و سلطانه بنى هذا المسجد المجلس المجالس مجلس معظم المكرم صاحب السيف و القلم بهلوى العصر و الزمان الغ مجلس اعظم سلمه الله تعالى فى الدارين مورخا في اليوم الرابع لغرة من شهر محرم سنه اثنى و ثمانين و ثمانماية و تتم بالخيرة *

৬। খোদিতলিপি।

قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و قال النبي صلى الله عليه و سلم من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله له في الجنة قصرا بنى المسجد في عهد الملك العادل الباذل جلال الدنيا والدين ابوالمظفر فتح شاه سلطان ابن محمود شاه سلطان خلد الله ملكه بنى المسجد المجيد العظيم صاحب السيف و القلم الخ مجلس نور سر لشكر و وزير عرصه ساجلا منكهباد و شهر مشهور شملا باد و سر لشكر تهانه لاوبلا و معربك عرصه و محل هاديگر سلمه الله تعالى في الدارين مورخا في الرابع من المحرم سنة اثنين و تسعين و ثمان مائة بخط عبد ضعيف آخوند ملك *

৭। খোদিতলিপি।

بسم الله الرحمن الرحيم و تتمم بالخير

تبارك الله احسن الخالقين خالق الخلق و مذشى السحاب و منزل الوعد تبارك الذي بيده الملك و هو على كل شئ قدير الذي خلق الموت و الحيوه ليبلوكم ايكم احسن عملا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذاك جنات تجري من تحتها الانهار و جعل لك قصورا *

تبارك الله احسن الخالقين يا الهى و اله السموات السبع و ما فيهن و اله الارضين السبع و ما فيهن وصل على نبي محمد و على من بالجنة و نجني من النار انك انك المعطي المنان هذا الصراط سلطان العادل و الباذل علاء الدنيا و الدين ابوالمظفر حسين شاه السلطان خلد الله ملكه و سلطانه *

بناكرده خان اعظم خاقان معظم بهلو عصر و الزمان الخ مسند همد هو خان سر لشكر وزير حسين باد و عرصه ساجلا و سر لشكر تهانه لا بلا في غرة شهر رجب مورخا احد عشر و تسعمائة سنة ه *

৮। খোদিতলিপি ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربنا آتفأ في الدينأ حسنفة وفي الآخرفة حسنفة - نصر من الله
وفتق قريب وبشر المومنين - قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله
من امن با الله و اليوم الآخر و اقام الصلوة و آتى الزكوة و لم يخش
الا الله فعسى اولئك ان يكون من المهتدين - يعني هر كه عمارت كند
مساجد خدای را بے شك و شبه ايمان آرندة باشد و هدايت يافتندة باشد
بخدای - و قوله عليه السلام السعى مني و الاتمام من الله تعالى - قال الله
تعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا - بنى هذا المسجد النجام صاحب
السيف و القلم بهامى العصور و الزمان الخ مجلس المجالس مجلس اختيار
و سر لشكر و وزير شهر مشهور حسينآ باد بزرگ و عرصه ساجلا مفكهباد و سر لشكر
تهانه لا و بلا و شهر هاديگڑ عرف ركن الدين ركفخان ابن علاؤ الدين السرهتي
مد الله عمرة الى غير النهاية و ادام الله حكومته على العالمين و ابقى الله
خيراته للمسلمين دائما و نصره الله تعالى على القوم الكافرين لاطهار دين الحق -
امين رب العالمين - هر كه اين مسجد مرمت كند خدا تعالى بھو رحمت
كند و نعوذ بالله منها اگر كسى اين مسجد را بے عزت گرداند خداى تعالى
اورا بے عزت گرداند *

৯। খোদিতলিপি ।

قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة
فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون - الوقف لا يملك -
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت من بيتك و يوم الجمعة فانت
مهاجر فان مت فى طريق فانت فى الجنة فى عليين - و قال عليه السلام من
تصرف بالغضب مال المسجد - و الاوقاف كالزنا (؟) ابنته و امه و اخته -
المساجد من الاوقاف نور وجهه يوم القيامة كليلة البدر - فى زمان
السلطان العادل الكامل ابوالمظفر سلطان نصره شاه ابن حسين شاه الحسينى خلد

الله تعالى ملكه و سلطنته بنا کرد مسجد جامع خان سيادت پناه سيد جمال الدين حسين ابن سيد فخرالدين املی في تاريخ شهر رمضان المبارك سنة ست و ثلاثين و تسعمائه بغابر آنکه جماعة ملايان و ارباب اگر بصرف اوقاف خيانت کفند بلعنت خدا گرفتار شوند واجب و لازم آيد حکام و قضات را بجائے که مانع خيانت شوند تا روز قيامت در مظالم گرفتار نيايند *

১০। খোদিতলিপি ।

قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر اقام الصلوة و ادى الزكوة و لم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله له سبعين قصرا في الجنة - في زمان السلطان العادل ابو المظفر نصرت شاه سلطان ابن حسين شاه سلطان الحسيني - بنى مسجد جامع عاليجناب سيادت ماب و فخر ال طه سيد جمال الدين بن سيد فخرالدين املی سلمه الله في الدنيا و الدين في تاريخ شهر رمضان المبارك سنة ست و ثلاثين و تسعمائة *

ময়নামতীর গান।

স্বল্পদ্রবীণ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট মাণিকচাঁদ ও ময়নামতীর গানের প্রথম আভাস পাই। সে অনেক দিনের কথা—“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” তখনও প্রকাশিত হয় নাই। বহুকাল পরে, যখন বিষয়কসম্মেলনক্ষে আমি নীলকামারী মহাকুমার অবস্থিত, তখন একদিন রংপুর জেলার মানচিত্রে ময়নামতীর কোটের অবস্থান দেখিতে পাই এবং এই ময়নামতী ঐ গানের ময়নামতী হইতে পারে মনে করিয়া অনুসন্ধান-কালে চতুস্পার্শ্বস্থ লোকের ময়নামতী সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও তাঁহার বিবরণ সংগ্রহে উপেক্ষা দেখিয়া যেমন একদিকে বিষয়াবিষ্ট হই, তেমনি অপর দিকে এই প্রাচীন গ্রাম্য-গাথার অভিনব ও বিশেষতঃ বিশেষ আনন্দ অনুভব করি। ময়নামতীর গাথার ঐতিহাসিক মত্য় অলৌকিকতার গাঢ় কুহেলিকায় আবৃত, কিন্তু এই অলৌকিকতাও বিশেষতঃ পূর্ণ। দীনেশ বাবু “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” লিখিয়াছেন—“এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। অনেক স্থলেই বৌদ্ধগণের উপাস্ত ধর্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।... মাণিকচাঁদের গান সলিলে সলিলবিন্দুর জায় প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া যায় নাই, সলিলে তৈলবিন্দুর জায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া আছে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য খুজিলেই পক্বিষ, দাড়িষ, কদম্ব, পদ্মপাশ, ধগরাজ, তিলফুল প্রভৃতি উপমার বস্তু দেখিতে পাই। গ্রাম্য গীতগুলিও এই উপমা হইতে মুক্ত নহে। *** কিন্তু মাণিকচাঁদের গীতের রূপ বর্ণনায় বুদ্ধ বাস, বাস্মীকি কি কবি কালিদাসের কোন হাত নাই। সে গুলি সংস্কৃতপ্রভাবশূন্য এবং সংস্কৃতের প্রভাবের পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়। * * স্থলে স্থলে দুই এক কথায় ছবিটি সুন্দর আঁকা হইয়াছে, রূপের একখানি প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠিয়াছে অথচ দাড়িষকদম্বাত্মক রূপবর্ণনা হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ্বীপ বাক্যে পুত্র স্নেহসমী মাতাকে উত্তম ৮০ মণ তৈলপূর্ণ স্নবুহং লৌহকটাহে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর মাতৃদেহবিশিষ্ট উক্ত কটাহে সংস্থাপিত রাখিয়াছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে রামায়ণী ও মহাভারতীয় নীতি, সেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা বিজাতীয়, ইহা হিন্দুজগতের বলিয়া বোধ হয় না।” পুনশ্চ—“এই গীতে নানারূপ ভীষণ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা আছে তাহা আমরা আরব্যোপ-ত্যাসের গল্পের জায় পাঠ করিয়াছি। অনুবাদ গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও কবিকল্প-চণ্ডী হইতে ভারতের অনন্যদমঙ্গল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন্ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই, সেই সব ঘটনা হইতে মাণিকচাঁদের গীতে বর্ণিত ঘটনা ভিন্ন রূপ। সে গুলির পশ্চাতে দেবশক্তি, তাই সে গুলি হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত, আর ইহার পশ্চাৎ শুধু মম্মশক্তি * *।

বৌদ্ধজগতের এই সঙ্গীত বোধ হয় এত দিন লুপ্ত হইয়া বাইত, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে এই গীতি ঈষৎ পরিমাণে হিন্দুত্বের আভা ধারণ করিয়াছে, এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমায়ু-বৃদ্ধির কারণ। গানের পরমায়ু-বৃদ্ধির অপর কারণ এই যে ইহা বহুকাল হইতে সম্প্রদায়-বিশেষের উপজীবিকা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে এবং যে সমাজে ইহা প্রচলিত সে সমাজ এখনও সংস্কৃত ও হিন্দুত্বের গভীর দ্বারা আপনাকে প্রাচীনতর সমাজ হইতে সম্যকরূপে স্বতন্ত্র করিতে পারে নাই।

ডাক্তার গ্রামারসন্ সাহেব প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে এনিয়টিক সোসাইটীর জারনালে “মাণিকচন্দ্র রাজার গান” নাম দিয়া সঙ্গীতটী প্রথম প্রকাশ করেন। দীনেশ বাবুর মন্তব্য এই এনিয়টিক সোসাইটীর জারনালে প্রকাশিত গানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এটি বাস্তবিক ময়নামতী গানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—জুগী বা যোগীজাতীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত। বাবু শিবচন্দ্র শীল যে ছন্দভিত্তিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গীত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এই গানের আর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ছন্দভিত্তিক গোবিন্দচন্দ্র ও যোগীদিগের গোপীচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি। একরূপ হইতে পারে যে নামটী বাস্তবিক গোবিন্দচন্দ্র বা গোবীচন্দ্র রূপে উচ্চারিত হইত, তাহাই গোবিন্দচন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

ছন্দভিত্তিক গান পুরাতন উপকরণের সাহায্যে নূতন ভাষায় রচিত, ইহাতে উপাখ্যান-ভাগও কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রীমারসন সাহেবের প্রকাশিত গান, প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলে, বাস্তবিকই প্রাচীন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নহে।

ময়নামতীর প্রাচীন গান কোথাও পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। রংপুরের কাণকাড়া যোগীরা মুখে মুখে ইহা অভ্যাস করে এবং আসরে বা ভিক্ষার সময়ে গোপীষন্দের সাহায্যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে উহা দ্বারা শ্রোতার মনস্তপ্তি জন্মাইবার চেষ্টা করে। লোহ, বংশ ও অলাবু দ্বারা এই গোপীষন্ত প্রস্তুত হয়। বৃহৎ গানের সকল অংশ সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না; সুতরাং গায়কের সামর্থ্য, রুচি ও প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পালার সৃষ্টি হইয়াছে। কোথাও বা গানের কোন নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ মাত্র গীত হয়, কোথাও বা শাখা প্রশাখা কর্তন করিয়া মূল বৃক্ষের কাণ্ডটী স্থির রাখিয়া বাক্যসম্ভব একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীমারসন সাহেবের গানটী শেষোক্ত শ্রেণীর। ছন্দভিত্তিক গান কেবল সংক্ষিপ্ত নহে, ইহাতে স্থূল ঘটনাবলীরও সম্পূর্ণ উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে মূল গানও যে অনেকস্থলে অপরের শাখা-পল্লবে আবৃত হইয়া পৃষ্ট কলংবরে পল্লীগ্রামের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। গানটির উপাখ্যানাংশ এইরূপ :—

বঙ্গ মাণিকচন্দ্র নামে এক “সতী” অর্থাৎ ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিলকচাঁদের কন্যা ময়নামতী তাহার রান্নি, কিন্তু একমাত্র রান্নি নহেন। রাজার ময়নামতীতে তৃপ্তি জন্মিল না;

অন্দর-মহলে “নও বুড়ী” রাণী সঙ্গেও তিনি পুনরায় বাসনাতৃপ্তির জন্ত দেবপুরের পাঁচ কছা বিবাহ করিলেন (মতান্তরে ৫০ বিবাহ করিলেন)। ইহার অবশ্যভাবী ফল ফলিল। “দ্যাবপুরের ৫ কন্যা ডাহিনী মএনা কোন্দল নাগিল”। রাজা তখন বর্ষায়সী ময়নামতীকে ব্যাগল অর্থাৎ পৃথক করিয়া ফেরমানগরে তাঁহার বাসহান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

মাণিকচাঁদের রাজ্যে প্রজার সুখের ইয়ত্তা ছিল না। প্রত্যেক হালে দেড় বুড়ী মাত্র খাজনা, একজনের বাড়ীর পথ দিয়া অপরে হাঁটে না, একজনের পুকুরিগীর জল অপরের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না, এমন কি

“দোনার ভেটা দিআ রাইঅতের ছাওআলে থেলাএ।

হেন দুঃখী কান্দাল নাই যে ধরিআ পালাএ ॥”

যে বেতনভোগী ভৃত্য তাহারও দুয়ারে ঘোড়া, বান্দী পর্যন্ত ঘুণার পাটের পাছড়া পরিতে অনিচ্ছুক। “পাতবেচা” সস্ত্রীক হাতী কিনিবার পরামর্শ করিতে লাগিল, “খড়ি বেচা” সস্ত্রীক বাড়ী পাকা করিবার মতলব আঁটিতে লাগিল। কিন্তু প্রজার অদৃষ্টে এ সুখ অধিক দিন টিকিল না। এক বৈদেশিক আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিল।

“দক্ষিণ হৈতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।

সেই বাঙ্গাল আসিয়া মূলুকৎ কৈল কড়ি ॥

দেওআনগিরি চাকরী রাজা সেই বাঙ্গালক দিল।

দেড় বুড়ী ছিল খাজনা পোনের গুণা নিল ॥

রাম লখখন ছুটা গোলা দুআরে ছাঁদিল ॥”

তখন কাজেই—

“খানে খানে তালুক সব ছন হইয়া গেল।” চাষা খাজনা দিবার জন্ত হাল গরু বিক্রয় করিল। সদাগর নৌকা বিক্রয় করিল, ককির ঝোলা-কাঁথা পর্যন্ত বেচিয়া ফেলিল।

“নাঙ্গল বেচাএ জোঙ্গাল বেচাএ আরও বেচাএ ফাল।

খাজনার তপত বেচাএ দুধের ছোআল ॥”

নিরীহ বঙ্গপ্রজা এ ঘোর দুর্ন্যবস্তু কি করিবে? সকলে পরামর্শ করিয়া গ্রামের মহৎ বা প্রধানের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। অবশেষে নদীতীরে ধর্মপূজা করিয়া রাজাকে অভিশাপ দেওয়া বাবাস্থ হইল। কোন গায়কের মতে প্রধান বা পরামানিক স্বয়ংই এই পরামর্শটুকু দিলেন, কাহারও মতে তিনি প্রজাদিগকে মহাদেবের নিকট পরামর্শের জন্ত পাঠাইলেন। ভোলা মহেশ্বর ধর্মের নামে প্রজাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া, বাহাতে ময়নামতীর নিকট তাঁহার এই পরামর্শ দান ব্যক্ত হইয়া না পড়ে তাহার জন্ত তাহাদিগকে তিন সত্য করাইয়া তবে বিনামূল্যে বা প্রণাম মাত্র লাভ করিয়া পরামর্শটি দিয়া ফেলিলেন। ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্য, তত্ত্বমস্ত্রে সিদ্ধহস্ত, তাই মহাদেবের ভয়, যে তাঁহার চক্ষুস্ত ব্যক্ত হইলে ময়নামতী কৈলাসপুরী “নওভণ্ড” করিবে।

প্রজারা ধূপ, ধূলা, ঘৃত, কলা, ধবল ধবল কৈতোর, ধবল ধবল (মতান্তরে কালা ধলা) পাঠা এবং একটা করিয়া বিনার খোপ লইয়া যথাসময়ে “পারগী গঙ্গা” অর্থাৎ তিস্তা নদীর তীরে উপস্থিত হইল। যথারীতি ধর্মপূজা হইল, বালির পিণ্ডে বিনার খোপ পুতিয়া দেওয়া হইল, পাঠাগুলি নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। এই অব্যর্থ অভিচারের ফল হাতে হাতে ফলিল, রাজার আঠার বৎসরের পরমায়ু ছয় মাসে পরিণত হইল, “চিত্র গোবিন্দ” দণ্ডর খুলিল, বিধাতা তলপটিটি লিখিয়া গোদা যমকে রাজার “জিউ” আনিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু এ জিউ যার তার নহে, ময়নামতীর স্বামীর,—যমকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। কেরুসানগরে বলিয়া ময়না দ্ব্যানে যমের আগমন বার্তা পাইলেন (মতান্তরে রাজার পাত্র হেমাই বা নেদা সশরীরে উপস্থিত হইয়া ময়নামতীকে পীড়ার সংবাদ দিল) এবং ময়না হ্রস্বজিত হইয়া রাজধানীতে চলিলেন।

“ধবল বস্ত্র নিল মএনা পরিধান করিআ।

হেমতালের নাঠি নিল হস্তেতে করিআ।

বাও ছঞ্চরে গেল রাজার দরবারক নাগিআ।”

ময়নামতী তাহার নিজের জ্ঞান বা তাহার ক্রিয়দংশ গ্রহণ করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন, তাহা হইলে রাজা যমের শক্তির অতীত হইবেন। কিন্তু মাণিকচন্দ্র তেজস্বী রাজা, তিনি জ্ঞীর নিকট জ্ঞান শিক্ষা অপমানজনক মনে করিলেন—

“আজ তিরির গিআন যদি মুই নৈঁও শিখিআ।

কেমন করি তোক্ ভক্তি করিম্ গুরুমা বলিআ।”

রাজার জ্ঞান লাভ হইল না। অগত্যা ময়নামতী—

“চাইট্টা মোমের বাতি দিলে ধরাইআ।

দিবা রাতি ঘর রাখিলে জালাইআ।

জেই রোগের জেই দাওআ আনিলে ধরিআ।

রাজার পইথানত বসিল খেআন করিআ।”

যমগণ বড়ই বিপদে পড়িল। প্রথমে একজন, তার পরে দুইজন এইরূপে সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু প্রত্যেক বারেই ময়নামতী কোন না কোন উপটোকন দ্রব্য দ্বারা—কখন-নির্জীব কখনও সজীব পদার্থ দ্বারা—তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। যমদিগকে যে অনেক বার ফিরিতে হইল, তাহার কারণ অবশ্য এই উপটোকনের পশ্চাতে “ডাহিনী” ময়নার জ্ঞানের ভেজ।

একবার চণ্ডী কালীর রূপ ধারণ করতঃ “তৈল পাটের খাঁড়া” হস্তে লইয়া ময়নামতী যম দিগকে “মার-মার” বলিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু বিধাতার হুকুম একরূপে পণ্ড হইতে পারে না—যমদিগের ভয় হইল, পাছে চাকরী খসে। অবশেষে সকল যম মিলিয়া এক পরামর্শ আঁটিল, কোন কোন গায়কের মতে মহাদেবের নিকট পরামর্শ গ্রহণ

করিল। এক যম ইন্দুর সাজিয়া “সেত কুমা”র জল চুষিয়া ফেলিল, এক যম বাঁওমুরি অর্থাৎ ঘুরীবাঘ হইয়া রাজার গৃহের দীপ নিবাইয়া দিল এবং ক্ষটিক পাত্রে জল ঢালিয়া ফেলিল। বুদ্ধিযম অলক্ষ্য ভাবে রাজাকে পরামর্শ দিল—“তুমি আর কোন রানীর হস্তের জল গ্রহণ করিবে না, ময়নামতীর নিজ হাতে জল দেওয়া চাই”। লিখা যম রাজার মরণ-তৃষ্ণা লাগাইয়া দিল, মাণিকচাঁদ “জল জল” বলিয়া কান্নিতে লাগিলেন। ময়নামতী রাজার নিকটে থাকিতে চাহিলেন কিন্তু তাঁহার মিনতি বার্থ হইল, মাণিকচাঁদ আর কাহারও হস্তে জল খাইবেন না। রাজার নির্বাক্তিশয় দেখিয়া ময়নামতী অগত্যা সোণার ঝাড়ি লইয়া জল আনিতে চলিলেন। কিন্তু জল কোথায়? ময়নামতী নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া অবশেষে নদীতে গেলেন। তখন

“আজপুরী ছাড়িয়া মএনা আস্তা পাও দিল।

আর খানিক খানিক করি জমের ঘর কাছাইতে নাগিল ॥

রাজা গোদা যমকে ময়নামতীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে অহরোধ করিলেন, কিন্তু ঐ স্মরণ সে ছাড়িবে কেন?

“লোতার মুদগর নিলে জম হস্তে করিয়া।

চামের দড়ি দিয়া জম বান্ধিলে ভিড়িয়া ॥

বার মোকামে বার ডাং দিলে মুদগর তুলিয়া ॥

মরণ ছুরী দিয়া রাজাক জুই ডাং দিল।

রাজার জিউ গোদা জম লাংটিত বান্ধি নিল ॥”

যখন যম স্বর্ণভ্রমর রূপে রাজার জীবন লইয়া উড়িয়া যায়, তখন ময়নামতী নদী হইতে জল তুলিতেছিলেন। গঙ্গাদেবী মূর্তমতী হইয়া ময়নাকে রাজার অবস্থা জানাইলেন। ময়নামতী আপনার কপালে আঘাত করিয়া সোণার ঝাড়ি ভাঙিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সিন্ধুর ও হাতের শাখা মলিন হইল, একটা আত্মপল্লব হস্তে লইয়া গৃহে চলিলেন। তারপর জ্ঞাতিদিগকে সমবেত করিয়া তাহাদের উপর রাজার শরীর রক্ষার ভার দিলেন এবং স্বয়ং যমপুরী যাত্রা করিলেন। গোপুচ্ছের সাহায্য ব্যতীকেও ভীষণ বৈতরণী নদী পার হইতে তাঁহার কষ্ট হইল না, সোণার ভোমরা হইয়া অনায়াসেই উড়িয়া গেলেন। কোন গায়কের মতে তিনি ময়নামতী রূপেই যমপুরীতে পৌঁছিলেন। কাহারও মতে যমের নিকট স্বীয় অস্তিত্ব গোপন করিবার জন্ত বিধবা ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করিয়া গেলেন। বাহা হউক ক্রমে যমেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু পলাইয়াও নিস্তার নাই, ময়নামতীর হস্তে বন্ধন ও প্রহার এড়াইতে পারিল না। ময়নামতী যমরাজের বাজারে মাণিকচাঁদের অন্বেষণে গেলেন; রাজাকে পাইলেন না, অধিকন্তু এই স্মরণে অবসর বুঝিয়া গোদা যম পলায়ন করিল। কিন্তু ময়নামতী স্কন্ধায়িত যমকে বাহির করিলেন এবং নির্ঘাতনের একশেষ করিলেন। ইন্দুর,

পায়রা, সরিষা, ইচ্চা মাছ প্রভৃতি বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়াও গোদা ঘম বিড়াল, বাজ, ঘুঘু, মহিষ প্রভৃতি বহুবিধরূপধারিণী ময়নামতীর হস্তে নিস্তার পাইল না। অশেষ লাঞ্ছনার পর—কারণ চাকরী বজায় রাখিতেই হইবে—গোদা ঘম মাণিকচন্দ্র রাজার জিউ বিধাতার নিকট হাজির করিয়া দিল। এ দিকে দেবগণের মধ্যে মহা ভীতির সঞ্চার হইল—যদি ময়নামতী এইরূপে নিজের স্বামীর প্রাণ বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তবে আর বিধাতার বিধানের স্থিরতা কি? স্বয়ং গৌরক্ষনাথ ময়নামতীর সহিত আপোষের প্রস্তাব করিলেন—নারদের দ্বারা আশীর্বাদ-লিপি লেখাইয়া ময়নামতীকে পুত্রবর দিলেন। কোন কোন মতে এই উপলক্ষে বহু দেবতার, পাঁচভাই পাণ্ডব, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতিরও সমাগম হইল। কিন্তু ময়নামতীকে সন্তুষ্ট করা ততটা সহজ হইল না। ময়নামতী দেখিলেন আশীর্বাদানুসারে পুত্রের বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র, উনবিংশ বৎসরে তাহার মৃত্যু। তিনি ছানি ছকুম চাহিয়া বসিলেন। কিন্তু—

“বিধাতার কলম থঙনে না জাএ।

ভাঙ্গা জোড়া দুইটা কন্দ্ব বিধাতা করাএ।”

অগত্যা বন্দোবস্ত হইল যে নিক্কা হাড়ির চরণ ভজনা করিলে ময়নামতীর পুত্র অমর হইবে। ময়নামতীর উদরে একেবারে আড়াই মাসিয়া (কোন মতে ৯ মাসের, কোন মতে ৭ মাসের) ছেলের আবির্ভাব হইল এবং আঠার মাসে পুত্রের জন্ম হইবে তাহাও স্থির হইয়া গেল। তখন রাজার শব ভস্মসাৎ করার আয়োজন হইল। ৯ কড়া (কোন মতে ২১ কড়া) কড়ি দিয়া মৃত্তিকা কিনিয়া আত্র-পল্লব হস্তে করিয়া ময়নামতী সঙ্গে চলিলেন। যখন মাণিকচাঁদের দেহ জ্বলিতে লাগিল, তখন ময়নামতীও সেই অনলে কিন্তু,—

“কোলোতে পুড়িয়া রাজাক্ কোলোতে কৈল ছাই।

ব্রহ্মার ভিতর বসি থাকুল মএনা লোহার কলাই।”

“নাতদিন নও রাত” পর্য্যন্ত অগ্নি জ্বলিল কিন্তু অনলের তেজ এবং জ্বাতিগণের নিগ্রহে ময়নামতীর কেশও বিচলিত হইল না। তিনি স্নহ শরীরে পতির অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের পর এক পুত্র গ্রাসব করিলেন। সোনাই দাঁই নাড়ী ছেদ করিল, পুত্রকে গৃহে আনিবার সময় ময়নামতী রাত্তায় আর এক শিশু পাইলেন, তাহাকেও কুড়াইয়া আনিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। নব কুমারের তিন দিনে তিন কামান, ৪ দিনে চতুর্থা, দশ দিনে দশা এবং ত্রিশ দিনে ত্রিশা হইল। রাজপুত্রের নাম রাখা হইল গোপীচন্দ্র, অপর বালকের নাম হইল খেতুয়া। ক্রমে রাজার বিভাশিক্ষা হইল, তাহার পর ময়নামতী বিবাহের আয়োজন করিলেন। কোন মতে ৯ বৎসর বয়সে কোন মতে ১২ বৎসর বয়সে বিবাহের আয়োজন হইল; হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অছনা ও পছনার সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। কোন গায়কের মতে গুরুব্রাহ্মণ, কোন মতে হেমাই পাত্র, কোন মতে স্বয়ং নারদ মুনি ঘটকালিটা করিয়া দিলেন। গুয়া পান কাটিয়া শুভ দিন ধার্য্য করা হইল, “পঞ্চগাছি” কলার

গাছ, সোনালী চালুনবাতি ও পঞ্চ বৈরাতীর সাহায্যে এক রবিবার দিন বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল,— “অহ্নাক বিবাহ কল্পে পহ্নাক পাইলে দানে ।

এক শত বান্দী পাইলে ব্যবহার করণে ॥”

গোপীচন্দ্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার মৃত্যুকাল নিকটে আসিল। তখন ময়নামতী একদিন ধবল বস্ত্র পরিধান করিয়া, হেমতাল্লের লাঠি হস্তে লইয়া স্রবাস ভাস্কর চর্চণ করিতে করিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজা সভাভঙ্গ করিলে তাঁহার নিকট সিদ্ধা হাড়ির চরণ ভজিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। হাড়িসিদ্ধা বা জলন্দরি গোরক্ষনাথের শিষ্য স্মরণ্য ময়নামতীর গুরুভাই। কিন্তু রাজা হাড়িকে গুরু করার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

“ডুবালু মা জাতকুল আর সবর গাঁও ।

বাইশ দণ্ড রাজা হঞা হাড়ির ধরব পাও ॥

হাট সামটে হাড়ি বেটা না করে সিনান ।

কোথা হইতে পাইল তিনি চৈতন্য গিআন ॥”

ময়নামতী পুত্রকে এমন অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগের জন্ত ভৎসনা করতঃ ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান করিয়া দিলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন—

“এ দেশীয়া হাড়ি নএ বঙ্গদেশে ঘর ।

চান্দ সুরজ রাখছে দুই কাণের কুণ্ডল ॥

চান্দের পৃষ্ঠে রান্ধে হাড়ি কুর্শের পৃষ্ঠে খাএ ।

সোণার খড়ম পাএ দিআ দৌড়িআ বেড়াএ ॥

দৌড়িআ বেড়াতে যদি যমের লাগ্গ পাএ ।

চিলাচান্দি দিআ জমক্ তিন পহর কিলাএ ॥”

রাজা বিশ্বাস করিলেন না, জননীর প্রতি কটুবাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলেন।

“হাড়ির খাইছেন শুআ মা হাড়ির খাইছেন পান ।

ভাব করি শিখি নিছেন ঐ হাড়ির গিআন ॥

তোর জ্ঞানে হাড়ির জ্ঞানে একস্তর করিআ ।

আমার পিতাক মাচ্ছেন তোরা গরল বিষ থোমাইআ ।

বুদ্ধি পরামিশে আমাক বনবাস পাঠাআ ।

শেষে বিটি থাকেন তুমি ঐ হাড়ি নৈআ ॥”

এই সাজ্জাতিক অপমান ময়নামতীর মর্মে ভেদ করিল, তিনি পুত্রকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে গুরু গোরক্ষনাথকে স্মরণ করিলেন। গুরু কৈলাস হইতে মঞ্চে নামিলেন এবং গোপীচাঁদকে একেবারে মারিয়া ফেলা অধৌক্তিক স্থির করিয়া তাঁহার সম্যাসাবস্থায় নানারূপ ক্রোধ নির্দেশপূর্বক অভিশাপ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

ময়নামতী সে দিনকার মত ফিরিয়া গেলেন কিন্তু পুনরায় আসিয়া পুত্রকে নানাক্রপ উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসে যাইবার জন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। গোপীচন্দ্র অহুনা ও পত্নী রানীকে সহসা ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত নহেন, তাহাদিগকে তিনি “বটবৃক্ষের ছায়া”র মত দেখেন। ময়নামতী বিবিধ নারী-চরিত্র বর্ণনা করত জ্বর প্রেমের অসারতা প্রদর্শন করিলেন এবং পুত্রের নানা জটিল আত্মাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

“হিদি গএআ হিদি গঙ্গা হিদি বানারসী।

মুখে হ’ল তোর জপ তপ মস্তকে তুলসী ॥

মনে রাখে তনে পর্শে আত্মাএ বসি থাএ।

জিতারূপে শুইআ থাক মহতে নিদ্রা যাএ ॥”

“আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানী।

সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কপাল খান ॥”

“যখন আছিল যাহ জননীর উদরে।

উত্তরে সিথান যাহ তোর দখি খণে পৈথান।

জননীর উদরে থাইকা জপছ নিজ নাম ॥”

অবশেষে জননীর বাক্যই প্রবল হইল। রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অন্যর মহলে আসিলেই অহুনা ও পত্নী রানী কাশে অস্ত্র গুল দিল, ময়নামতার জ্ঞানের পরীক্ষা লইবার পরামর্শ দিল। পরদিন ময়নামতী পুনরায় রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলে গোপীচন্দ্র বলিলেন—

“হাট গেছেন বাজার গেছেন কিনিআ থাইছেন খই।

আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই ॥

আমার পিতার মরণের দিন সতী গেলেন হএ।

সত্য রাজার পুত্র হইআ নাও পাড়ানু হএ ॥”

ময়নামতী উত্তরে বলিলেন যে তিনি সতী যাওয়ার জন্ত চেষ্টার ক্রটি করেন নাই কিন্তু অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে অক্ষম। রাজা সন্যোগ বুঝিয়া এই কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। “বাইশ মোগী” (কাহারও মতে ষাটমণী) কড়াই আনী মগ তৈলে পূর্ণ করা হইল। “মাত দিন নও রাত” অগ্নি-সংযোগে ঐ তৈল উত্তপ্ত করা হইল। তখন থেতুয়া রাজাদেশে ফেরসা নগর হইতে ময়নামতীকে আনিতে চলিল—ঝাড়ির মুখের গামছা সঙ্গে লইয়া চলিল, ময়নামতী সহজে না আসিলে গামছা খানির সন্ধান হার করিতে হইবে।

ময়নামতী বাঁশের চরকার সিমুলতুলার সূতা কাটিতেছিলেন, তিনি পরীক্ষা দিবার জন্ত আসিতে অসম্মত হইলেন; কিন্তু থেতুয়া স্বীয় প্রভুর আদেশ পালন করিতে ক্রটি করিল না, গামছা দ্বারা ময়নামতীকে “ভিড়িয়া বাকিল”। ময়নামতী তখন পলায়ন করিবেন না বলিয়া

প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বান করিতে গেলেন। তৈল, থৈল প্রথমে ধর্মকে পরে গঙ্গাকে নিবেদন করিয়া শেষে আপনার মস্তকে দিয়া স্বানে নামিলেন। গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত লৌহকটাহে নিপতিত হইলেন এবং অঞ্জলি পূরিয়া কটাহের তৈল মস্তকে দিতে দিতে খেতুয়াকে বলিলেন, “ইহাতে আমার কিছু শীত নিবারণ হইতেছে বটে, কিন্তু আর একটু গরম হইলে ভাল হইত”। রাজা পূর্বে তৈল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মাতার কথায় সন্দিহান হইয়া আবার তাহাতে জাল চড়াইয়া দিলেন। ময়নামতী ছয় দিন পর্য্যন্ত তৈলে থাকিয়া, অবশেষে সর্বপুরুষ ধারণ করত উত্তপ্ত তৈলে ভাসিতে লাগিলেন। তখন রাজার এবং খেতুয়ার ভয় হইল যে ময়নামতী আর ইহ জগতে নাই। রাজার মাতৃভক্তি অকস্মাৎ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন—

“দুধ মিঠা চিনি মিঠা আর ও মিঠা ননী।

সবার চেএ অধিক মিঠা মা বড় জননী ॥”

“বোল মর্দে” লৌহকটাহ তুলিয়া তেপথিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। ময়নামতী সর্বপুরুষে ছর্কা মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া জ্ঞাতিগণের ব্যবহার লক্ষ্য করিলেন। পরে নিজরূপ ধারণ করিয়া পুত্রবধূগণের নিকট তাহার মৃত্যুসংবাদ রটনা করিতে খেতুয়াকে আদেশ দিলেন। যথাসম্ভব গন্তীর ভাবে ও বাপ্পাকুল নয়নে খেতুয়া আদেশ পালন করিল। রাজবধূগণ আনন্দে অধীর হইলেন, আর রাজাকে কে সন্ন্যাসে পাঠায়? কিন্তু ময়নামতী মরেন নাই, বধূগণের হর্ষ শীঘ্রই বিবাদে পরিণত হইল। রাজার মন কিন্তু ইহাতেও সন্ন্যাসাশ্রমের জন্ত প্রস্তুত হইল না, তিনি জননীর অস্ত্র পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তুলাদণ্ড দ্বারা জননীকে ওজন করা হইল—

“এক পাকে তুলিআ দিল পোস্তের দানা।

আর এক পাকে বসল রাজার মা মএনা ॥”

ময়নামতী অপেক্ষা পোস্তার দানা ভারী হইল, কিন্তু রাজার তখনও অবিখ্যাস,—নিকি খানা ভাঙ্গা ছিল,

“ভাঙ্গা দিআ জননীর ওজন পড়িল ছস্কিয়া।”

তখন এক সোণার তুলাদণ্ড আনা হইল এবং এক দিকে এক তুলসী পত্র অপর দিকে “রাজার মা ময়না”কে রাখা হইল।

“তুলসীর পত্র থাকিল মুক্তিকায় পড়িআ।

ভাহিনী মএনা উঠিল স্বর্গক নাগিআ ॥”

কিন্তু রাজা তুষ্ট হইলেন না, আরও পরীক্ষা চাই। এক তুষের নৌকা প্রস্তুত হইল, “কাকুরা-দানের স্তম্ভ” নৌকার বৈঠা হইল, ময়নামতী নৌকায় নদী পার হইতে চলিলেন। যে সে নদী নহে,—

“ঐত বৈষ্ণবিনী নদী নাই তারে হাওয়া ।

ছএ মাসের ওয়ার নদী বচ্ছরে পড়ে খেওয়া ॥”

“এক এক চেউ উঠে পর্কতের চুড়া ।

আকাশে উঠে চেউ পাতালে বএ ঝোড়া ইত্যাদি ॥”

ময়নামতী নৌকা খানি পূজা করিয়া লইবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু কে এই অস্বাভাবিক নৌকার পূজা করিতে সাহসী হইবে? ময়নামতী প্রথমে গুরু গোরক্ষনাথকে, পরে ক্রমে হাড়িনিকা, ধীরনাথ, মীননাথ এবং ভোলা মহেশ্বরকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কাহারও সাহসে কুলাইল না। ময়নামতীর সহিষ্ণুতা আর কতক্ষণ থাকিবে? তিনি ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলেন, দেবগণ যে যেখানে ছিলেন সটান দৌড় মারিলেন।

“কচু বাড়ী দিআ বুড়া শিব জাএ পলাইআ ।

হোলা ব্যাঙের মতন মএনা নিগাএ নেদিআ ॥”

ময়নামতী বুড়া শিবকে খপু করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। বাধ্য হইয়া ভোলা মহেশ্বরকে পোরোহিত্য স্বীকার করিতে হইল।

“এলুয়াবাড়ী বেলুয়াবাড়ী কাশিয়াবাড়ী দিঘাটা ।

শিআলক দেখি জানোআর পালাএ হাসিয়া মৈল পাঠা ॥”

ইত্যাদি নানা উন্টা মন্ত্র দ্বারা ভোলানাথ নৌকা পূজা করিয়া দিলেন, ময়না মূনি মন্ত্র জপিয়া নৌকায় উঠিলেন, তাঁহার বংশীধ্বনিতে নদীর জল উজান বহিতে লাগিল। জল ময়নামতীর আদেশে তিন গুণ হইল, কিন্তু ময়না কেবল নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইলেন এমন নহে; শেষে ভূষের নৌকা ও বৈঠা কবরীর মধ্যে গুঁজিয়া সোণার খড়ম পায় দিয়া পদব্রজেই সে কার্য্য সমাধা করিলেন। গোপীচন্দ্র আর বিশ্বাস না করিয়া যাম কোথায়? তিনি বাধ্য হইয়া মস্তকমুগুনপূর্বক সন্ন্যাসী হইতে স্বীকার করিলেন। গণনা দ্বারা শুভদিন স্থির করিবার জন্ত পণ্ডিত আনিতে খেতুয়া প্রেরিত হইল। অছনা ও পছনা স্নাগীও উদাসীন রহিলেন না। তাঁহারা “খোশ” অর্থাৎ উৎকোচ দ্বারা পণ্ডিতকে বশ করিবার জন্ত বান্দীর হস্তে ৫০০ পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন; পণ্ডিত ঠাকুর উৎকোচ গ্রহণে অনিচ্ছুক, কিন্তু

“পণ্ডিতের চাইতে পণ্ডিতানী গেআন ।

আকাশে পাতালে বেটী ধইরাছে ধিআন ॥”

পণ্ডিতানী পণ্ডিত ঠাকুরকে চক্ষে অলুলি-দিয়া বুঝাইয়া দিল যে, যে ব্যক্তি পাজি পুস্তক হস্তে ঘুরিয়া সারাদিনে এক মুষ্টি চাউল ও কাঁচকালা সংগ্রহ করিতে না পারে, তার পক্ষে ৫০০ পাঁচ শত টাকা প্রত্যাখ্যান নিতান্তই আহম্বকের কাজ। পণ্ডিত ঠাকুর অন্তঃপুরের মুক্তিতে পরাস্ত হইলেন এবং বিবেকের বাতি নিবাইয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কুক্ষিগত করিলেন। নানা উপচয়ে আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইল। ভোজনান্তে

“ধবল বস্ত্র নিল ঠাকুর পরিধান করিআ।

পাঁজি পুস্তক নিলে ঠাকুর ঝোলদা ভরিআ।

দৈবক মুনি বাত্মা করল কানি নসুন হুঙ্গিয়া॥”

বিস্তর বাধা উপেক্ষা করিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর রাজদরবারে চলিলেন। খালি কলমী, “মেলাচুল”, এমন কি চন্দনবৃক্ষের কাকের নিষেধবাণীও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

পণ্ডিত দরবারে গিয়া উৎকোচের মর্যাদা রক্ষা করিলেন, এবার সন্ন্যাসে কুশল নাই বলিলেন এবং “এক ছাওমলের বাপ” হইয়া সন্ন্যাসে বাইতে রাজাকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু মাতার মন্ত্র তখন ধরিয়াছে, গোপীচন্দ্র বিরক্ত হইয়া স্বয়ং গণনা বসিলেন এবং পণ্ডিতের “খোসা” বাওয়ার কথা ধরিয়া ফেলিলেন। খেতুয়ার প্রতি হুকুম হইল “চণ্ডীর দ্বারে লইয়া ব্রাহ্মণকে বলি দাও”। আদেশ পালিত হইবার উপক্রম হইল, ব্রাহ্মণ কাতর হইয়া “চণ্ডী-মাও” বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং ধর্মের দোহাই দিয়া চণ্ডীদেবীর ককণা ভিক্ষা করিলেন। চণ্ডী মাতার দয়া হইল, তিনি হৃদয়ে “মুনিমন্ত্র” রূপ করিয়া শ্রেষ্ঠ মক্ষিকারূপ ধরিয়া ব্রাহ্মণের কর্ণে উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন। যখন ঝোল জন পাষাণ ব্রাহ্মণকে ধরিয়া কাতরায় ফেলিয়াছে এবং তাঁহার প্রাণবায়ু দেহভ্যাগ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণ রাজার দোহাই দিলেন। তাঁহার নাবালক পুত্র পঞ্জিকা-খানিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল, তিনি স্নান করিয়া ঠিক গণনা করিয়া দিবেন—এই রূপ জানাইলেন। পণ্ডিত মুক্ত-কলেবরে রাজ-দরবারে আনীত হইয়া এবার সমস্তই কুশল গণনা করিলেন।

“শনিবার দিনা হবে শূঁথে মহাস্থিতি।

অবিবারক দিনা ভাণ্ডের অধোগতি॥

সোমবারক দিনে তোমার মুড়িয়া যাবে মাথা।

মঙ্গলবার দিনে তোমার শিখাবে ঝুলি কেঁথা॥”

ইত্যাদির পর শুক্রবার দিন বিপ্রহর সন্ন্যাসের জন্ত ধার্য্য হইল। ব্রাহ্মণ উপযুক্ত দক্ষিণা-পাইয়া গৃহে ফিরিলেন। তার পরই নাপিত আনিবার জন্ত বিরাট আয়োজন হইল। রানীগণের বাধা ও উৎকোচসত্ত্বেও নাপিতকে ক্ষুর লইয়া হাজির হইতে হইল। তখন রাজাকে বোণী করিবার উদ্যোগ হইল—

“ফেঁকসা হইতে বুড়ী মএনা আসিল চলিআ।

হুঙ্কারেতে দেবগণক আনলে ডাক দিআ॥”

“রাজার মস্তক খেউরী করে মারোআএ বসিআ।

নেউজ পাতে মহারাজ বসিল ভিড়িআ॥

বুড়ী মএনা নাপিতক্ দেএছে বলিআ।

কামাইও মোরজা ছর মাথা না করিও ঘিন॥

সোনা দিয়া খুর বাক্সাব মাণিক দিব চিন ॥
কামাইও মোর জাহ্নর মাথা রাখিও ব্রহ্মচুলি ।
অবশে গুটাইবে উঞার গুরুর কেঁথাখুলি ॥”

অনন্তর নাপিত—

“এক সোভা দুই সোতা তিন সোতা দিল ।
যখন রাজার মস্তকের কেশ মৃত্তিকাএ পড়িল ।
কেশী গঙ্গা নদী হএঞা বহিতে নাগিল ॥”

ময়নামতী রন্ধন করিলেন ; ইন্নাথ, ভিন্নাথ, কাণকাড়া, গোরখনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাগণের
ভোজন হইল । তার পর—

“পাঁচ নোটা কুআর জলে রাজাক ছিনান করাইয়া ।
মাড়োআর তলে নিয়া গেল ধরিয়া ॥
এক থান রেজিছুরী আনিল জোগাইয়া ॥
ঐ রেজিনি গিয়া ইন্নাথক দিল ।
ইন্নাথের হাতের রেজি কানকাড়াক দিল ॥
হরিবোল বলিয়া রাজার দুই কর্ণ ছেদিল ।
দরশনের বৈরাগী সাজাবার নাগিল ॥
এক থান বস্ত্র মএনা জোগাইল আনিয়া ।
ঐ বস্ত্র নিগিয়া মএনা হাড়ি হস্তে দিল ॥
হরিবোল বলিয়া বস্ত্র পরিতে নাগিল ।
আড়াই হাত ফাড়ি রাজার পরিবস সাজাইল ॥
সোআ তিন হাত কাপড় ফাড়ি রাজার থিঙ্কা বানাইল ।
চৌদ্দ অঙ্গুলি কাপড় ফাড়ি কপ্পি সাজাইল ॥
আড়াই অঙ্গুলি ফাড়িয়া এ ডোর সাজাইল ।
হরিবোল বলিয়া ডোর কপ্পি পরাইল ॥”

ময়নামতী তখন রাজাকে হাড়িপার হস্তে সমর্পণ করিলেন । হাড়ি প্রথমেই রাজাকে
আপনার জননীর মহলে গিয়া ভিক্ষা আনিতে আদেশ দিলেন । রাজা আদেশানুসারে
ভিক্ষায় গেলেন, ময়নামতী অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া স্বর্ণের থালায় রাজাকে ভোজন
করিতে বলিলেন, কিন্তু রাজা এখন সন্ন্যাসী, তিনি স্বর্ণের থালায় ভোজন না করিয়া
কড়র থালায় খাইতে বসিলেন । স্বর্ণ-ভুজারের জল “করঙ্গ তুম্মায়” নিলেন । হাড়ীর
কোপেই হউক কি “তুম্মা ছিল” বলিয়াই হউক জল মাটিতে পড়িয়া গেল, রাজা
তাহা চুমুক দিয়া খাইলেন । ময়নামতী রাজাকে বার কাহণ কড়ি ভিক্ষা দিয়া উপদেশ
দিলেন—

শরুআতে সরু বেটা ছুঁবলাতে হীন ।
 তখনি পাওআ বাবে পর দেশের চিন ॥
 ডুবু কথা না বলিও তোর গুরুর বরাবর ।
 ছাই ভস্ম করিয়া তোক পাঠাবে যমের ঘর ॥
 বৈরাগী বৈষ্ণব দেখিলা করিও হেলা ।
 গড় হইআ প্রণাম করিও যাব গলায় দরশনের মালা ॥
 পরর স্ত্রীক দেখি বেটা হাত না করিও ।
 আগে মা বলিয়া পিছে তিথা নিও ॥
 পাখীগুলো দেখিআ ডিমা না মারিও ॥”

রাজা আবার হাড়ির সহিত মিলিত হইলেন। এবার হাড়ির আদেশ হইল—

“আর কিছু আনেক ভিক্ষা তোর রাণীর মহল বাএঞা ॥”

এ বড় বিষম আদেশ, ইহাতে “নিবা আগুণ” জ্বলিয়া উঠিল, এক গভীর করুণরসাত্মক পালায় অভিনয় হইল। অত্না ও পত্নী অনেক কাকুতি মিনতি করিল, সঙ্গে যাইবার জন্ত অস্থির হইল, রাজাকে বুঝাইয়া বলিল তাহার সঙ্গে গেলে “ভোকেয় কালে অন্ন এবং তিয়াস কালে পানি” ‘জ্বারের কালে ওড়ন এবং গ্রীষ্মকালে বাতাস দিবে, সন্ধ্যা বেলা হাত পা টিপিয়া দেবে’ হাসিয়া খেলিয়া রজনী পোহাইবে, ইত্যাদি রাজা এ প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন না। তিনি পথের নানা বিপদের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু রাণীরা ছাড়িবার পাত্র নহেন—

“কঁার কএ এ গিলা কথা কে আর পইতাই।
 পুরুষের সঙ্গে গেলে কি তিরিক বাঘে খাই ॥
 এমন ছষ্ট বনের বাঘ তিরি পুরুষ বাছিয়া বেড়ায় ॥
 যেখানেতে বনের বাঘ খাইবে ধরিআ।
 নিশ্চয় করি প্রাণের পতি মোক পালাইস ছাড়িআ ॥
 থাক না কেনে বনের বাঘ তাক না করি ডর।
 নিফলক মরণ হউক সোয়ামীর পদের তল ॥”

রাণীদ্বয় ডোর কোপীন পরিয়া, সম্মুখের ছয়টা করিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া, মন্তক মুগুন করিয়া, ভিক্ষার বুলি লইয়া রাজার পশ্চাতে যাইবার জন্ত অল্পমতি চাহিলেন। হাড়ি-সিদ্ধারথে ভয়ঙ্কর কাঁথায় “কঁার-পানি নাহি পড়ে নওকুড়ি বচ্ছর” যাহা “সাত দরিবার জল” হইলে ভেজে এবং চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রে শুকায়, যাহার গন্ধ ছয় মাসের পথ পর্যন্ত লোককে অস্থির করে, বাহাতে

“এন্দুর সলেআর বাসা আর মাকড়সার জালি।
 ওরদের লেখা নাই উকুন ডালি ডালি ॥”

যাহা পাগলা হাতীও তুলিতে পারে না, সে কাঁধার ভয়ও রাণীদ্বয়কে নিরস্ত করিতে পারিল না। দম্য-ভীতির যুক্তি বিফল হইল। রাজা কিন্তু কিছুতেই জীলোক সঙ্গে লইতে সম্মত নহেন, ভাই খেতুমার হাতে রাজ্য-ভার এমন কি তাঁহার জীগণকে পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া একাকী বনে বাইতে কৃতসংকল্প। কিন্তু রাণীদ্বয় খেতুমার নিকট বাইতে একেবারেই রাজি নহেন—

“হস্তপদ বাক্সিয়া মোরে ডুবাও সাগরে।

তরুও সপিয়া না জাও গোলাম খেতুর ঘরে ॥”

তাঁহারা রাজার নিকট পুত্র চাহিলেন, কিন্তু রাজা সম্মাসে চলিয়াছেন, পুত্র পাইবেক কোথায় ?

“চিনি চম্পা কলা নএ জলে গুলিয়া খাব।

হাটৎ না বেয়াএ ছেলে কিনিয়া নিয়া দিব।”

তিনি স্বয়ং রাণীদিগের পুত্র হইবার প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য এই মাতৃ-সম্বোধনে রাণীদিগের মনস্তৃষ্টি জন্মিল না। তাঁহারা ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিলেন। গোপীচন্দ্র এতটা মনে ভাবেন নাই, তিনি এখন হাড়িশুকের শরণাপন্ন হইলেন—রাণীদ্বয়কে বাঁচাইতে না পারিলে হাড়িশুকার এমন কি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যে তাঁহার সঙ্গে গোপীচন্দ্রের তায় রাজা বনবাসে বাইতে পারেন ? হাড়িশুকা ধূলা পড়া দিয়া রাণীদ্বয়কে বাঁচাইয়া দিলেন। কোন কোন গায়কের মতে এই সময়ে তিনি একটু রসিকতা করিয়া অহ্নার মুণ্ড পছনার স্বন্ধে এবং পছনার মুণ্ড অহ্নার স্বন্ধে লাগাইয়া দিলেন। (স্বপ্নের বিষয় উভয়েই এক পতির সম্পত্তি স্মরণে বেতালের প্রদ্ব করিবার কোন অবসর ঘটিল না)। রাণীরা এই অলৌকিক ঘটনার অভিভূত হইয়া স্বামীকে হাড়ির হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। তখন রাজার বৈরাগ্যে সৈন্ত-সামন্ত, হস্তী, ঘোড়া, পক্ষী ও বৃক্ষ যে যেখানে ছিল কান্দিতে লাগিল।

“বাইশ কাণো নাও কান্দে ভেইশ কাণো দাড়ি।

গলেআর মান্নি কান্দে বিশাসয় কাণারী ॥” ইত্যাদি।

রাজার অল্পপস্থিতিকালে রাজপুরীর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বার জায়গায় চৌকি এবং তের জায়গায় থানা বসান হইল, রামজাল ও ব্রহ্মজালে পুরী বেষ্টিত হইল, বার বৎসর পর্য্যন্ত কোন লোক পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এই আদেশ প্রচারিত হইল। সত্যের অন্ত, সত্যের পাশা এবং দামামা গৃহে লখিত রাখিয়া গোপীচন্দ্র হাড়ির সহিত যাত্রা করিলেন। খেতুয়া রাজপ্রতিনিধি হইল এবং বাঞ্চে রাণীগুলিকে হস্তগত করিল। কিন্তু প্রথমে লোকে তাহাকে মানিতে চাহিল না, কারণ—

“ছোটলোকের ছাওআ যদি বড় বিষয় পাএ।

টেরিআ করি পাগড়ী বাক্সি ছেআর দিকে চাএ ॥”

যাহা হউক, রাজার হস্ত ধরিয়া হাড়িশুকা চলিতে লাগিলেন, তিনি মন্ত্রবলে রাজ্য

জুলির ভার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং এক বৃহৎ অরণ্যের সৃষ্টি করিয়া রাজার পথশ্রমের মাজা চড়াইয়া দিলেন। কণ্টকে রাজার শরীর বিদীর্ণ হইল, তিনি গুরু ককণা ভিক্ষা করিয়া বালকের ত্রায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং এই অরণ্য হইতে উদ্ধার পাইয়া সূর্যদেবের মুখ দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। হাড়িসিদ্ধা তখন ক্ষল শূন্যে উড়াইয়া দিলেন, এক বৃহৎ বালুকাময় প্রদেশ সৃষ্ট হইল। সূর্যদেব ও ব্রহ্মা আহুত হইলেন, তাঁহারা আসিয়া হাড়িকে প্রণাম করিলেন, তাঁহাদের উপর বালুকা উত্তপ্ত করিয়া দিবার আদেশ হইল। তেরটা সূর্যের তেজ প্রকটিত হইল। বালুকার ভীষণ উত্তাপে গোপীচাঁদ ছটফট করিতে লাগিলেন এবং গুরুর নিকট বৃক্ষের ছায়া প্রার্থনা করিলেন। হাড়ি এক বৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু রাজার হৃদয়টি ঘাটল, তিনি গুরুকে পশ্চাতে রাখিয়া বৃক্ষাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। রাজা বত অগ্রসর হন, বৃক্ষও তত অগ্রসর হয়। অবশেষে বৃক্ষটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, রাজা আবার কান্দিতে লাগিলেন। আবার গুরুর দয়া হইল, আবার নূতন বৃক্ষের সৃষ্টি হইল, গুরুশিষ্য যাইয়া সেই বৃক্ষের তলে বসিলেন। রাজার প্রার্থনামুসারে হাড়িসিদ্ধার বাম হাঁটু গোপীচন্দ্রের উপাধান হইল। রাজাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত রাখিয়া হাড়ি যমরাজের মাতাকে আহ্বান করিলেন। মন্তকে পালঙ্ক ও এক হস্তে পাখা লইয়া যমের মা হাড়ির আদেশ পালনের জন্য উপস্থিত হইলেন। রাজাকে ঐ পালঙ্কে শয়ন করান হইল, স্বয়ং যমের মা পাখা দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তারপর হাড়ি বিশ্বকর্মা এবং “গাড়াঅন্না” নামক আর দুইটা দেবতাকে তলব দিয়া তাহাদের দ্বারা রাস্তার জন্য ক্ষল পরিষ্কার করাইয়া লইলেন। তখন যমগণকে আহ্বান করা হইলে তাহারা লাজিয়া বাহির হইল—

“চেংরা চেংরা জম সাজিল মাথার সোণার টুপি।

জুআন জুআন জম সাজিল গলায় রসের কাঠী।

বুড়া বুড়া জম সাজিল হাতে সোণার লাঠি ॥

সোক জম সাজিয়া গেল আবাল জমের বাড়ী।

আবাল জম খাড়া হইল মাটিতে পল্ল দাড়ি ॥”

যমেরা আসিয়া প্রণাম করিলে হাড়ি তাহাদিগকে দারাইপুর সহর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন।

“জুআন জুআন জমে জাও চাপা কাটিয়া।

চেংরা চেংরা জমে জাও চাপারে উঠিয়া।

বুড়া বিরধু জমে জাও চাপারে রাখিয়া ॥”

যমগণ আদেশ পাইয়া ছয় মাসের কাজ ছয় দণ্ডে শেষ করিল। তারপর তলব হইল কচ্ছপ মূনির। ইনি মরীচির পুত্র কি সলিলবিহারী চতুষ্পদ মূনি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, ইনি হাড়ির আদেশে বুক দিয়া Roller-এর কাজটা সারিয়া দিলেন।

তখন হাইড্রাগী আসিয়া গায়ের ছাট দিয়া রাস্তা লেপিয়া দিল, মাইলানী আসিয়া আতর, গোলাপ ও চন্দন বর্ষণ করিল। তখন লক্ষা হইতে হনুমান ও বানরগণ আহুত হইয়া ফুলের গাছ, পাথর ইত্যাদি আনিতে আদিষ্ট হইল। তাহারা এই হুকুম তামিল করিলে গোদা ও আবাল যমের উপর আদেশ হইল যে—

“পাষণ দিআ ডিগির দাও চারবাট বান্দিআ ।

ফুলের বাগিচা দেও মারুগির বগলে লাগাআ ॥”

যমগণ কার্যোদ্ধার করিয়া হাড়ির সন্তোষ বিধান করিল। হনুমানদিগকে যথেষ্ট কলা দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি উহাদের মনে একটু অভিমান হইল। রামের ভৃত্য হইয়া তাহারা হাড়ির বেগার খাতে কেন? ফিরিয়া বাইবার সময় তাহারা পরামর্শ করিল, “হাড়ি শালাকে” একটু জব্দ করিতে হইবে—

“রামরথের ডোর হাড়ির হস্তে লাগাইল ।

ছাওআএ ছোট্টাএ হনুমান টানিতে লাগিল ॥

কিন্তু “থাক পড়ি হাড়িক তুলিবার হাতখান নড়াইতে না পাইল ।”

কাজেই তখন “সউক হনুমান হাড়ির হস্তত প্রণাম জানাইল ॥”

কিন্তু প্রণাম করিয়াও রক্ষা নাই, হাড়ি তাহাদের পরামর্শ ও কুবাক্য অবশ্যই ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন, তিনি শাপ দিলেন—

“জা জারে হনুমান বেটা তোক দিলাম বর।

সুখপোড়া বানর হইআ থাক শআলের ভিতর ॥

চীকাং চাপর দিআ নিবে তেলেজা সঙ্কল ॥”

এ শাপ ব্যর্থ হইল না। হাড়ি এই অপূর্ণ রাস্তা দিয়া রাজাকে লইয়া যাওয়া সম্ভব কি না একটু চিন্তা করিলেন। তারপর রাজার মন পরীক্ষার জন্ত নিজাববস্থা রাজাকে এক বজ্রচাপড় মারিলেন। রাজা “মাও মাও” না বলিয়া “গুরু গুরু” বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তখন কাজেই তাঁহাকে সেই বিচিত্র রাস্তায় ভ্রমণ সুখভোগ করাইতে আর কোন আপত্তি রহিল না। সেই মনোরম কুসুম-সমাকীর্ণ প্রশস্ত পথে চলিতে চলিতে রাণীদিগের কথা স্মরণতঃই রাজার মনে উঠিল, তিনি গুরুকে বলিলেন “বদি ফিরিবার সময় আমাকে এই পথ দিয়া যান তবে রাণীদিগের জন্ত গোটা কয়েক ফুল লইয়া যাইতে পারি।”

হাড়িসিদ্ধা মনে মনে কুপিত হইলেন এবং এই ধৃষ্টতার জন্ত রাজাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হইয়া চলিতে চলিতে রাজার নিকট গাঁজা সেবনের জন্ত বার কড়া কড়ি চাহিলেন। রাজা গাঁজার কথা শুনিয়াই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং মগর্কে বলিলেন “বার কড়া কেন বার কাহ্নও দিতে পারি।” হাড়িসিদ্ধা বুঝিলেন রাতার নিকট ভিক্ষা লইয়া রাজার এই অহঙ্কার। তিনি মন্তবলে রাজার খুলি হইতে কড়িগুলি উড়াইয়া দিলেন, কড়ির জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন—

“ঝুলিতে হস্ত দিআ রাজা পড়িআ গেল ধান্দা।

ঝুলির কড়ি ঝুলিতে নাই গুরুবাণ এ কেমন কণা ॥

উপরে আছে গিরো গাইট তলত নাই জে ভাঙ্গা।

ঝুলির কড়ি ঝুলিতে নাই গুরুবাণ মোক থুইআ থা বান্ধা ॥”

রাজা এই কথা বলিবানাত্র হাড়িসিদ্ধা “বসমাতা”কে সাক্ষী রাখিলেন এবং রাজাকে বান্ধা রাখিবার জন্ত বন্দরে চলিলেন।

“বোলাচাকী কলিকার বাজার গেইছে লাগিআ।

ঐ হাটক নাগি গুরু-শিষ্য গেলত চলিআ ॥”

পনার মাজাইয়া নানা দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্ত বহু জীলোক বন্দরে ছিল। তাহারা সকলেই রাজার রূপ দেখিয়া তাঁহাকে একেবারে কিনিয়া ফেলিবার জন্ত ইচ্ছুক, অল্প দিনের জন্ত বান্ধা রাখিতে কাহারও মন উঠিল না।

“খাল ভরি দেই টাকা খোলা ভরি নেও।

বান্ধা ছাড়ার কার্জ্য নাই এইঠে বেচাইআ জাও ॥”

সর্বত্রই এই সুর উঠিল।

“কলাটর দোকান কলাইবেচী নেদাইআ ফেলাইআ।

ঐ রাজার কোমর ধলে “মরিম” বলিআ ॥

লবণবেচী বলে “দিদি! কোমর ছাড়েক তুই।

লবণের দোকান থুইআ কোমর আগে ধরছঁ মুই ॥”

এটরূপে অনেকেই আগে ধরিবার দাবী উপস্থিত করিল। এমন “টানাটানি ষিচাষিচি” উপস্থিত হইল যে—

“আর এক টান দিলে রাজার ছেড়াএ কোমর।”

রাজা কান্দিয়া হাড়ির করুণা প্রার্থনা করিলেন, তখন হাড়িসিদ্ধা ইজ্রকে তলব দিয়া বৃষ্টি করিবার ছকুম দিলেন।

“লাগাও ফেরন্তা মোঘ হইআ ছাড়া ছাড়া।

কোনদিআ জল বিরষ্টি কোনদিগে থড়া ॥

এলাহানে আইস ঝড়ি বেলহানে পাণর।

তিন্‌মুহুক ছাড়িআ বইস দোকানের উপর ॥”

শিখা বৃষ্টিতে সকলেই রাজার কোমর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কলাইবেচী আর ছাড়ে না, সে ঘরের স্বামীকে “বাণদায়” দিয়া মরিয়া হইয়া পড়িয়াছে। তখন হাড়ির আদেশে দেবরাজ এক প্রকাণ্ড পাথর কলাইবেচীর পৃষ্ঠদেশে ফেলিয়া তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন। কলাইবেচী কুজা হইয়া রাজাকে ছাড়িয়া দিল এবং আবার “ঘরের সোয়ামীর” আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইল ও প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল—

“পরপুরুষ নহিত আমি না জাব চলিআ।”

হাড়ি ক্রমে রাজাকে এক হালুয়ার নিকট উপস্থিত করিলেন, কিন্তু সে বলিল—

“এমন রূপ দেখি নাই দেবের দেবস্থান।

কি দিআ গড়্ছে দেহা নাগ্ছে জলিবার।

যেমন রূপ আছে রাজার শরীরের উপর।

এই কি খাটিবার পারে আমার চাধানোকের ঘর ॥”

পরিশেষে হালুয়া বলিয়া দিল—

“ইহার যোগ্গমান আছে সেই হীরানটীর ঘরে।”

হালুয়া হীরানটীর অবস্থা ও ঐশ্বর্য্য সবিশেষ বর্ণনা করিল। তাহার দ্বারে ঘোড় দামামা আছে, কোন রাজরাজড়া আসিলে তাহাতে আঘাত করিয়া আগমনবার্তা জানাইতে হয়। দামামায় বতটা ঘা পড়িবে, তত হাজার টাকা দরজায় গণিয়া দিয়া তবে অন্তরমহলে প্রবেশের অধিকার জন্মিবে। প্রত্যেক ঘা’এর জন্ত—

“একহাজার টাকা জেবা দিতে নাহি পারে।

ঘাড়ে হাত দিআ তারে চতুরার বার করে ॥”

হাড়ি হালুয়াকে আশীর্বাদ করিয়া হীরার বাড়ীতে পৌঁছিলেন এবং কাঠখণ্ড দ্বারা দামামায় প্রহার করিলেন। ভীষণ শব্দ হইল, হীরার পুরী চমকিয়া উঠিল, একি ভূমিকম্প! তখন “ডাং”এর পর ডাঙ চড়িতে লাগিল, হীরানটীর বান্দী বাহিরে আসিয়া দেখিল এক বৈরাগীর এই কাণ্ড, যে বৈরাগীর—

“চক্ষু ছটা দেখা জ্ঞাচ্ছে জেন স্বরগের তারা।

নস্তগুলি দেখা জ্ঞাএ.....মাঘমাসিআ মূলা ॥” ইত্যাদি।

সিদ্ধা জানাইলেন তিনি নটীর প্রেমপিপাসু নহেন, নিজের শিষ্যকে বান্ধা রাখিতে আসিয়াছেন। বান্দী শিষ্যকে দেখিল এবং ফিরিয়া গিয়া হীরাকে জানাইল—

“জেই রাজার তরে তপ কর এ বার বছর।

সেই রাজা আইছে তোমার দরজার উপর ॥

জেমন রূপ আছে তার চরণের উপর।

তেমন রূপ নাই তোমার কপালের উপর ॥”

হীরা তখন সাক্ষিগোষ্ঠিয়া বনাতের “কারোয়াল”এর উপর দিয়া হাঁটিয়া বাহিরে আসিল।

“দুই দুই অঙ্গুলি নটা তুলিয়া ফেলাএ পাও।

ঝুঝু ঝুঝু বলিআ নুপুরে ছাড়ে রাও ॥

জখন হীরা নটা চতুরার বাহির হৈল।

এ বাও বাতালে নটা হালিতে নাগিল ॥

যেই দিআ হীরা নটী নএঅন তুলিআ চাএ।

থাক পড়িআ মনুষ্য দেবতা তুলিআ জাঅ ॥”

হীরা অবশ্যই গোপীচন্দ্রের রূপে মোহিত হইয়া গেল, তাঁহাকে কিনিয়া ফেলিবার জন্ত ব্যগ্র হইল; কিন্তু হাড়ি জানাইলেন তাঁহার শিষ্যকে বিক্রয় করিবার অধিকার নাই, তিনি বার কড়া কড়ি পাইলে বার বৎসরের জন্ত দলিল লিখিয়া দিয়া রাজাকে বদ্ধক রাখিয়া বাইতে প্রস্তুত। তাহাই স্থির হইল, তিন জন মহাজন দলিলের সাক্ষী হইল। রাজা স্বহস্তে খত লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দিলেন। তখন—

“ঐ খত নিগিয়া হাড়ি হীরা নটীর হাতে দিল।

কড়ি বার কড়া আনিআ হীরা হাড়ির হস্তে দিল।

হস্ত ধরিআ রাজাক নটীর হস্তে দিল ॥”

এই আদান-প্রদানের পর স্বভাবতঃই “খটমট করিয়া নটী হাঁসিয়া উঠিল।” নটী মুখ ফিরাইলে পর সিদ্ধা কড়িগুলি তাহার দরজার সম্মুখে মুক্তিকায় প্রোথিত করিয়া নিজের রূপ পরিবর্তন করত পাভালে প্রবেশ করিলেন এবং “চৌকতাল” জ্বলয়ে তলে ঘোগামনে বসিলেন। বাইবার পূর্বে আর একটা কাজ করিয়া গেলেন—

“না তিরি না পুরুষ রাজাক করাইল।

কাম ক্রোধ রতি মাএআ সকলি টুটাইল ॥”

এটা অবশ্য রাজার নৈতিক জীবন রক্ষার জন্ত। বাহা হউক হীরার আদেশে রাজার “তৈলে থৈলে” স্নানটা নির্বিঘ্নে সমাপিত হইল। সোণার পালঙ্কে তাহার জন্ত অপূর্ণ শয্যা রচিত হইল। “টাটীর উপর” “এক বুক উচল” “পাটী” বিছান হইল, “আসগাড়ু” “পাশগাড়ু” “শিয়রের মাহুরা”, “ছন্নবুড়ি পাচেরা” ইত্যাদি দ্বারা শয্যা রচিত হইল, তাহার উপর নানা স্বগন্ধি দ্রব্য বর্ষিত হইল, সুবাসিত তাখুল ইত্যাদিরও বন্দোবস্ত থাকিল। রাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে বিবিধ রসনা-তৃপ্তিকর খাওয়ার আশ্বাদ গ্রহণ করিতে হইল। মনের মত বেশ-ভূষা করিতে হীরার অনেক লমর লাগিল। কত বারই সে সাড়ী পরিবর্তন করিল এবং কত বারই কবরী বিতাস করিল। অবশেষে শতেশ্বরী হার প্রভৃতিতে সজ্জিত ও চন্দনে চর্চিত হইয় হীরা রাজার পালঙ্কের নিকটে গেলে এক ভৃত্য ছত্র ধরিল, এক দাসী বাজন করিতে লাগিল। হীরা রাজার মুখে থিলি তুলিয়া দিল, রাজা চিবাইতে চিবাইতে বিদায়কালে মায়ের উপদেশ স্মরণ করিলেন। হীরার তুমুল আয়োজন ব্যর্থ হইল। রাজা তাখুল ফেলিয়া দিলেন, হীরার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলেন।

“জতকে ধর্মী রাজা স’রে ল’রে জাএ।

অভাগীআ হীরা নটী গাও বেসিআ জাএ ॥”

রাজা নটীর উপজব নিবারণের জন্ত তাহাকে অনেক কথা বলিলেন,—

“কি তুমি নেহালাও নটী তোমার পাজাএ পাজাএ চুল।

তুই স্তন দেখি জেন তোর ধুতুরার ফুল ॥

উপরত দেখা জাএ জেন শাস্ত মহাকালের ফল।

তলত ভান্দিয়া দেখ ছাই আর আঁদার ॥

জেনমন রাণীক ছাড়ি আইছ নাটমন্দির ঘরে।

তার বান্দীর পাএর রূপ নাই তোর কপালের মাঝারে ॥”

নটী তখনও ছাড়ে না ;—

“রাজার হাত খরি নটী হিদে তুলি দিল।

“মাও মাও” বলি স্তন থাইবার নাগিল ॥”

শেষে নটীকে পরাস্ত ও অপদস্থ হইতে হইল, তাহার প্রেম যুগায় পরিণত হইল।
প্রত্যাখ্যাতী হীরা রাজাকে পদাবাতে শয্যা হইতে মৃত্তিকার ফেলিয়া দিল।

“কথার নাগর বুড়া দীদী কথার নাগর বুড়া।

কাম কোদ নাই বেটাক ভাদাই ধানের কুড়া ॥”

হীরার প্রতিহিংসাবৃত্তি বীভৎস আকারে দেখা দিল। রাজার বস্ত্রালঙ্কার অপসারিত
হইল, তিনি প্রত্যহ করতোয়া নদী হইতে ১২ ডার অর্থাৎ ২৪ কলসী জল আনিতে আদিষ্ট
হইলেন। জলের পরিমাণ কম হইলে প্রহারের ব্যবস্থা হইল। জল আনা হইলে হীরার
“ভাড়ুয়া”রা রাজাকে চিৎ করিয়া ধরে এবং

“সোণার খরম হীরানটী চরণে নাগাএআ।

রাজার বথ্বে গাও ধোএছে নটী দোমাএআ দোমাএআ ॥”

আর এদিকে—

“নটীর পরিধান হৈল আঙণ পাটের সাড়ী।

ধম্মী রাজার পরিধান হইল বার গাঠিআ ধড়ি ॥”

“থাকিবার শয়নে দিল ছাগলের খুপুরী।

মাঘমাসিআ জারত দিল বুড়া একখান চটী ॥”

ছাগলের লগুগি হইল গাও হরিদ্রা বরণ।

কোদালচেছী মঅলা হইল শরীলের উপর ॥

ঝেচুপাখী বাসা কৈল মস্তকের উপর।

দিনান্তরে জাএছে দেএছে একখান সিদা ॥

আকারিআ চাউল দিল বিচিআ বাতাকী।

বিচিআ বাতাকী দিল পুড়িআ থাইতে মানা।

তাহাতে করিল নটী লবণ ভৈল মানা ॥”

“পাপের বিছানা” তোলা এবং পাপের কড়ি গণা রাজার নিত্যকর্ম হইল। হীরার

অত্যাচারে রাজা মৃতকল্প হইলেন। অহুনা ও পহুনা রাণীর নিবেদ্যবাক্য মনে পড়িল, তাহাদের নাম স্মরণ পড়ায় রাজপুত্রীহৃৎ সত্যের পাশা “মাউলাইয়া পড়িল”, অহুনা ও পহুনা রাণী কান্দিতে লাগিল, তাহাদের ভয় হইয়া রাজা বৃষ্টি আর ইহলোকে নাই। রাণীদিগের ঘোদনে গৃহপালিত শুক ও “শাদী” পক্ষী-বিকল হইল এবং রাজার অন্বেষণে বাইবার জন্ত অল্পমতি প্রার্থনা করিল। বন্ধনমুক্ত হইয়া তাহারা নানাদেশে রাজাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত অভূত দেশই তাহাদের নয়নে পড়িল,—একঠেঙ্গিয়ার দেশ, কাণফড়ার দেশ, মশারাজার দেশ, মেচপাড়ার দেশ, ত্রিপাটনের দেশ ইত্যাদি। মেচপাড়ার বিবরণটা এইরূপ—

“এক বেটা মেচ আছে হেমাঁই পান্তর।
মণ্ড মশেক ধান শুকাএ পিঠের উপর ॥
তার ছোট ভাই আছে বামঠেংআ গোদ।
হস্তী ঘোড়াএ চলি জাএ গোদের না পাএ বোদ ॥
তার ছোট বইন আছে নাহি তারো কোক।
নওহাঁড়ি পান্তা খাএ দশহাঁড়ি তপত ॥
তার ছোট বইন আছে নামে ছদ্মতানি।
আশীমর্দে পড়িআ কিলএ নহি চোখোত পাণী ॥”

এই সকল দেশে এবং “গয়া গঙ্গা কাশী বৃন্দাবন” কোথাও গোপীচন্দ্রকে না পাইয়া পক্ষিধ্বয় আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিল। তাহারা “রাঘব বোয়ালের” উদরস্থ হইবে আশা করিয়া অডাজড়ি করিয়া নদীতে পড়িল, কিন্তু কোন বোয়ালই তাহাদিগকে ধরিয়া খাইতে সাহস পাইল না। গঙ্গা বোয়ালদিগকে পূর্বেই সাবধান করিয়া দিলেন যে ইহারা ময়নামতীর নাতি, ইহাদিগকে উদরস্থ করিলে—

“বামহস্ত দিআ দরিআ ফেলাইবে বাক্দিআ।
ডানহাতে দরিআর জল ফেলাইবে ছাকিআ।
তোমাক মারিবে মএনা পেটত পাও দিআ ॥”

পক্ষিধ্বয় অগত্যা অল্পঘাটে গেল, গোপীচন্দ্রের ছায় এক ব্যক্তিকে জল ভরিতে দেখিল এবং তাহার মস্তকের উপর উড়িতে লাগিল। গোপীচন্দ্রও দেখিলেন পক্ষী দুইটি তাহার পালিত পক্ষীর ছায়, তিনি কান্দিতে লাগিলেন; পক্ষীরা তখন তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, রাজা চমৎকৃত হইলেন—

“এওখানে কেউ নাই রঙ্গের বাপ ভাই।

নাম ধরিআ কে ডাকাইলি বঙ্গের গোঁসাই ॥”

পক্ষিধ্বয় তখন নিজমুখে রাজার পরিচয় লইয়া তাঁহার বাহর উপর পড়িল এবং তাঁহার হৃৎকৃতান্ত আমূল শ্রবণ করিল। রাজা দেখাইলেন প্রহারে তাঁহার পঙ্করের অস্থি পর্য্যন্ত

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পক্ষীদিগের অতুরোধে রাজা স্নান করিলেন এবং রাজ্ঞীদিগের প্রদত্ত মাড়ু ভাঙ্গাদিগের সহিত ভাগ করিয়া খাইলেন। তারপর “নাকর পাকর” দুইটা পত্র আনিয়া এবং দস্তদ্বারা এক লেখনী প্রস্তুত করিয়া, বাম উকর রক্তদ্বারা দুইখানি পত্র লিখিলেন; একখানি অজুনা রাণীর নিকট, সেখানি ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ—অপরখানি ময়নামতীর নিকট, তাহা করুণবিলাপোক্তিপূর্ণ। পক্ষিদ্বয় যথাস্থানে পত্র প্রদান করিল। ময়নামতী চড়কা কাটিতে ছিলেন, পত্র পড়িয়া জলিয়া উঠিলেন, কত আশায় তিনি গোপীচন্দ্রকে হাড়ির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই হাড়ির এই কাজ! ময়নামতী ধ্যানে বসিলেন, তারপর—

“বজ্রচাপড় হাড়িক্ মএনা মারিলে তুলিআ।

ধেআনে আছিল হাড়ি উঠিল চমকিআ ॥”

হাড়িসিদ্ধার অতুতাপ হইল,—এতকাল তিনি দীদৌর পুত্রকে এই অবস্থায় রাখিয়াছেন, কোন খোঁজখবর মেন নাই। স্নসজ্জিত হইয়া হাড়িসিদ্ধা গোপীচন্দ্রকে উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন।

“বাওগ্নি মোণী কেঁথা নিল কোমরে বাকিআ।

আশী মোণী সোডা নিলে কপালে ডাবিআ ॥

নয় মণিআ খড়ম নিলে চরণে নাগাএআ।

মণ পঞ্চাশে ভাঙ্গের গুড়া মুখের মধ্যে দিআ।

কলঙ্গী দশেক জল দিআ ফেলাইল গিলিআ ॥

আর গৈর মার গৈর তিনটা গৈর দিআ।

শুটী চোদ্ধ ধূলা নিলে হিরদে মাখিআ ॥

ওঠেএলা হাড়িসিদ্ধা গাও মোড়া দিআ।

সগুগতে ঠেকিল মাথা ছটুন্ করিআ ॥”

বিরাসী কোশ অস্তুর পা ফেলিয়া সিদ্ধা হাড়ি অচিরেই করতোয়ার ঘাটে উপস্থিত হইলেন, রাজার তখন বার ভার জলের মধ্যে এক ভার তোলা বাকী, তিনি গুরুকে দেখিয়া জলতোলা ঝাঁক নদীতে ভাসাইয়া দিলেন, ঘড়া দুইটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। হাড়িসিদ্ধা রাজাকে রূপান্তরিত করিয়া ঝোলায় মধ্যে রাখিলেন এবং হীরার বাড়ীতে পৌঁছিয়া যথারীতি দামামায় বা মারিলেন। হীরার বান্দী আসিয়া হাড়িকে দেখিল এবং অন্তঃপুরে ফিরিয়া হীরাকে সংবাদ দিল যে, হাড়ি রাজাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে। তখন হীরার মনে ভয় হইল, রাজাকে রাজপুত্র সাজাইয়া হাড়ির নিকট উপস্থিত করার জন্ত বিপুল আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা কোথায়? নদীতীরে রাজা মিলিল না, তৈল-তৈল এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ বান্দীর হস্তেই রহিয়া গেল। বান্দী ভয় জলপাত্র দেখিয়া হীরাকে জানাইল রাজার মৃত্যু হইয়াছে। সিদ্ধা রাজাকে খালাস করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, হীরা কখন বলে, “রাজা বন্দরে অক্ষকীড়া

করিতে গিয়াছেন” কখন বলে, “তিনি যুগযুগপ্রিয়, বনে যুগযুগ গিয়াছিলেন, এখনও ফিরেন নাই এবং বহু পশুর হস্তে তাঁহার কি অবস্থা ঘটয়াছে তাহাও জানা যায় নাই”। হীরা একদিন সময় চাহিল, কিন্তু অত্বে কল্য করিতে হাড়ির অধিকক্ষণ লঙ্গিল না।

“চান সৃজ্য থাইলে সিদ্ধা দুই কাণে ভরিয়া।” শীঘ্রই—

“আত্মি করে কিকিমিকি কোকিলাএ করে রাও।

খেত কাউআএ বলে রাত্রি পোহাও পোহাও॥”

কিন্তু রাজাকে পাওয়া গেল না, হীরা সিদ্ধার চরণে পড়িল, হাড়ি রাজাকে ধোলা হইতে বাহির করিলেন এবং কড়ি বারকড়া হীরাকে প্রতাপর্ণ করিয়া খত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রাজার উদ্ধার সাধন করিলেন। তারপর হীরার শাস্তির ব্যবস্থা হইল। তাহাকে দিয়া জল আনান হইল, রাজা হীরার বক্ষঃস্থলে চড়িয়া সেই জলে স্নান করিলেন, হীরা একটু গা-মোড়া দিয়াছিল বলিয়া যথেষ্ট প্রহার ভোগ করিল। শেষে হাড়ি হীরাকে “ঘোড়বগছল”, তাহার বান্দীকে বেষ্ঠা এবং তাহার ধনকে খাপরায় পরিণত করিলেন।

এইবার গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে প্রত্যাগমন। প্রত্যাগমনের সময় পথে আসল কাজটা হাসিল হইল, রাজার জ্ঞানশিক্ষা হইল। হাড়ি প্রথমতঃ রাজাকে ভিক্ষার জন্ত বন্দরে পাঠাইলেন। কিন্তু রাজার অগ্রেই স্বয়ং “ভাংগা” কোটালের রূপ ধরিয়া বন্দরে গিয়া সকলকে বলিয়া আসিলেন, “এক পরম রূপবান্ যুবক ভিক্ষায় আসিতেছে, তোমাদের বউ বেটা সামাল”। বন্দরের লোক রাজার উপর কুকুর নেলাইয়া দিল, ভিক্ষার পরিবর্তে তাঁহার বিড়ম্বনালাভ হইল। রাজার অনুপস্থিতি কালে, হাড়িসিদ্ধা লক্ষ্মীদেবীকে তলব দিয়া অন্নের সংস্থান করিলেন এবং আপনার ভুক্তাবশেষের মধ্যে “আড়াই পুটী” পরিমাণ জ্ঞান মিশাইয়া তাহা রাজার জন্ত রাখিয়া দিলেন, কিছু নিষ্ঠীবনাদিও অন্নের সহিত না মিশিল এমনত নহে। রাজা ফিরিয়া আসিলে হাড়ি বলিলেন “আমার এক ভক্ত কিছু অন্ন দিয়া গিয়াছে, তোমার ভাগ রহিয়াছে, খাও”। ক্ষুধার্ত রাজা অন্ন দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।

“মাছি করে ঘিনঘিন পিপড়াএ ছাড়ি জ্ঞাএ।

এইনত অন্ন আমার কুত্ভাএ না খাএ॥”

রাজা স্থগার সহিত প্রথম গ্রাস মুখে তুলিয়া দেখিলেন ইহা অমৃত, তৃতীয় গ্রাসের সময় হাড়ি রাজার হস্ত ধরিলেন, রাজা কাড়াকাড়ি করিয়া আড়াই গ্রাস পর্য্যন্ত খাইলেন, তাঁহার আড়াইপুটী জ্ঞান জন্মিল। কোন গায়ক বলেন—

“আপ পুটী জ্ঞান হাড়ী স্বর্গে উড়াই দিল।

সেইকাল হইতে রোজাটৈব পৃথিবীতে হইল॥”

হাড়ি রাজাকে একটু পরীক্ষা করিবার জন্ত মায়াবান্ পথে প্রথমে এক গোবাঘা, পরে এক নদী সৃষ্টি করিলেন; রাজা এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুরী লক্ষ্য করিয়া

চলিলেন। বাড়ীটার ভুল না হয় সে জন্ত একটু সতর্কতা অবলম্বন করিতেও ক্রটি করেন নাই।

“খাটো গছি গুয়া দেখা ডাব নারিকল।

হর মএআলে দেখা জাএ কার বাড়ীঘড় ॥”

এই প্রস্তরের উত্তরে এক রাখালের নিকট অপমানিত হইলেন। রাখাল বলিল, “এখানে এক রাজা ছিল, সে কতকগুলি বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু রাণীগুলিকে পুষিতে না পারিয়া উদাসীন হইয়া গিয়াছে।”

“উম্মার রাণীক যদি মুই আখেআল পাও।

আরো চাইট্টা পালের গরু বেশী করি চরাঁও ॥”

রাখালের অদৃষ্টে যে অভিশাপ ঘটয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। রাজা আকৃতি পরিবর্তন করত এক ভিক্ষকের বেশে রাজপুরীতে পৌঁছিলেন। তখন কথা হইল “কোন পুরুষ রাজাজ্ঞা অমাত্য করিয়া এই পুরীতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল? অহুনা ও পহুনা রাণীর আদেশে হেঙ্গল অর্থাৎ কুকুরগুলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া রাজার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু রাজার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক তাহারা তাঁহার পায়ে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল, মত্ত হস্তীও তাহাদের পশ্চাৎ অবলম্বন করিল। বান্দীগণ ভিক্ষা লইয়া আসিল, কিন্তু রাজা বান্দীর হস্তে ভিক্ষা লইলেন না। অহুনা ও পহুনা রাণী ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু রাজা “তিরি” লোকের হাতের ভিক্ষা লইবেন না, তাহাদের “মাথার ছত্তর” অর্থাৎ স্বামীকে চাই। রাণীরা ভিক্ষকের হস্তে রাজার অঙ্গুরীয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি ইহা কোথায় পাইলে,” ভিক্ষুক বেশধারী রাজা বলিলেন “তোমাদের রাজা ও আমি এক গুরুর শিষ্য ছিলাম, একদিন “পইল মাঝে” আমরা এক গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইলাম, “বিজি ধানের” চাউল ও ঠাকরী কলাইএর ডাল আমাদের ভোগের জন্ত আসিল, তোমাদের রাজা “হতভুবি” হইয়া থাইয়া ভেদের পীড়ায় পঞ্চম লাভ করিয়াছে এবং

“কাথো দিলে বুলিমাঝা কাথো গোপালডাং।

ভাবত থাকি শ্রীআমুট মোক কচ্ছে দান ॥”

রাণীরা বিশ্বাস করিলেন এবং ছুরিকা হস্তে আত্মহত্যা করিতে উত্তত হইলেন। রাজা আর থাকিতে পারিলেন না—

“চেংরা কালের হাসি রাখন না জাএ।

নাকেমুখে ফাঁপর খাইআ দিলে পরিচএ ॥”

“বখনে ধর্মী রাজা মহলে সোন্দাইল।

ছআরের জোড়নাগরা বাড়িআ উঠিল ॥”

রাজা কালবিলম্ব না করিয়া সোণার ভোমরা হইয়া ফেঞ্চনা নগরে উড়িয়া গেলেন এবং ময়নাগুতীর চরকা মল্লবলে উড়াইয়া দিলেন।

“ও মএনা পাইছে গোরখনাথের বর।

উড়িআ জাইতে ধরলে মএনা চরকার ছত্তর।”

মাতা পুত্রে মিলন হইল, গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে আনন্দের স্রোত বহিল। মধু নাপিত রাজার মস্তক মুণ্ডন করিল। হস্তী রাজাকে তুলিয়া সিংহাসনে বসাইল, বীরসিং ভাণ্ডারী মূল্যকের হিসাব দিতে লাগিল। নজর প্রণাসী বিস্তর যুটিল। ময়নার হুকারে দেবগণ পর্যন্ত আসিয়া এই উৎসবে যোগ দিলেন। খাজনা পুনরায় দেড়বুড়ি স্থির হইল, “রাইয়ত প্রজা”র সুখের দিন ফিরিয়া আসিল।

এই হইল ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান। ইহা প্রহসন নহে; রামায়ণ ও মহাভারত পল্লীগ্রামের খাঁটি হিন্দুর নিকট ষতদূর সত্য, ময়নামতীর গাথাও বৌদ্ধদিগের এবং তাহাদের বহুসংখ্যক শ্রোতার নিকট ততদূর সত্য। বঙ্গভাষার মেবকের নিকট ইহাতে বিবিধ আবর্জনা মধ্যে পুরাবৃত্ত আছে, রাজনৈতিক ইতিহাস আছে, ধর্ম জগতের একটা বিশাল প্রবাহের প্রতিবিম্ব আছে, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব আলোচনার নূতন উপাদান আছে। ময়নামতীর গাথা মার্জিত করিবার পাণ্ডিত্য-শূন্য হইলেও একেবারে কবিত্ব-শূন্য নহে। ইহাতে প্রসাদগুণ আছে, শ্লেষ আছে, অনেক স্থলেই মানব-প্রকৃতির প্রকৃত আলেখ্য আছে। অতিপ্রাকৃত ঘটনার অতিরিক্ত সমাবেশ সত্ত্বেও কবিতাদেবীর অঙ্গ-সৌরভ দূরীকৃত হয় নাই।

মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী, গোপীচন্দ্র ইঁহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি; এক সময়ে যে তাঁহারা রক্তমাংসের শরীরে আমাদেরই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন তাহা নিশ্চিত। নীলফামারী মহকুমার অন্তর্গত ডিমলা থানার অধীন হরিণচড়া ও আটরাবাড়ী গ্রামে এখনও ময়নামতীর “কোট” বা বাসস্থানের নিদর্শন বর্তমান।

বোধ হয় ঐ স্থানকেই পূর্বে ফেরমানগর বলিত। ১৩১৩ সালের চৈত্রমাসের “তারতী”তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম যে এই কোটের “চতুর্দিকস্থ মন্ময় প্রাকার কালের নানা অত্যাচার সহ করিয়া ক্ষীণকায় হইলেও এখনও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার আশা রাখে। প্রাকারের নিম্নস্থ পরিখাও সম্পূর্ণরূপে পঞ্চভূতে বিলীন হয় নাই।

কালক্রমে এ দেশীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অদৃষ্টে অনেক সময়েই বাহা ঘটয়া থাকে, ময়নামতীরও তাহা ঘটয়াছে। তিনি দেবদ্ব প্রাপ্ত হইয়া “ময়নাবুড়ী” নামে স্থানীয় লোকের পূজার পাত্রী হইয়া পড়িয়াছেন, ভগ্ন প্রাকারের উপর তাঁহার পূজার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, ব্যয় নির্বাহের জন্ত ভূমিসম্পত্তি বরাদ্দ হইয়াছে। দেওদা উপাধিযুক্ত রাজবংশী জাতীয় প্রোহিত তাঁহার পূজার মন্ত্র আবিস্কার করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। জমীদারের পূণ্যাহার সময়ই তাঁহার পূজার পক্ষে প্রস্তুত। অবশ্য যে ভক্ত ময়নাবুড়ীর নিকট মানত করিয়া অভীষ্ট লাভ করত ছাগাদি গুণ্ডর সদগতি করিতে প্রস্তুত তাহার পক্ষে কালকাল নাই। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় দীক্ষিত ময়নামতী মাংসাহার করিতেন কিনা জানিনা। কিন্তু

কালে পুরোহিতের রূপায় নৃমুণ্ডমালিনী দেবীর সহিত তাহার অভিন্নত্ব কল্পিত হইয়াছে।
অতরাং এখন তাকে ছাগশিশুর মস্তক হইতে বঞ্চিত রাখা নিতান্তই অভক্তের কাজ।
পূজার মন্ত্রের প্রারম্ভটি এইরূপ—

“চিয়াও চিয়াও বুড়ীমা কল যাত্রা নিনি।

কত নিদ্রা কর মা আবালের গোপনী”।

দৈওদার সাহায্য ব্যতীত এই মন্ত্রের অর্থ হ্রাস করা অসম্ভব। মন্ত্রের শব্দ পবিত্র বলিয়াই
বোধ হয়, ইহাকে আধুনিক করিবার চেষ্টা হয় নাই। উত্তর-পূর্ব ভারতে পার্শ্বত্যাগ অনেক
জাতির পুরোহিতই দৈওদা নামে অভিহিত। এই আখ্যা রাজবংশী জাতিরও পূর্ব বৃত্তান্ত
স্থচিত্ত করিতেছে, কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়।

মানিকচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের রাজধানী কোথায় ছিল, যোগীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত
ময়নামতীর গানে কোথাও তাহার উল্লেখ নাই।* দুর্লভমল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গীতে
গোপীচন্দ্রের রাজধানী পাটিকানগর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই পাটিকানগর যে
ময়নামতীর কোটের অদূরবর্তী বর্তমান পাটকাপাড়া তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।
পাটকাপাড়ার বহু পুরাতন অট্টালিকার বিস্তর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এখন ইহার
পূর্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই। নদারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির অঙ্গুগ্রহে ইহার ইষ্টক-
স্তূপও নিষ্ঠুর হস্তে পড়িয়া লৌহবস্ত্র নির্মাণের সহায়তা করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্বে
যে স্থান গোপীচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইত, এখন তাহা কেবল জৈনক মুসলমান-
সাধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য সাধারণের সভক্তি পাদক্ষেপ আকর্ষণ করিতেছে। ময়নামতীর
কোট ও পাটকাপাড়ার কিঞ্চিৎ দূরে—বোধ হয় ১৥ মাইলের মধ্যে—ধর্মপালের গড়। ইহার
আকৃতি অনেকটা ময়নামতীর কোটের স্থায়, কিন্তু আয়তন অনেক বড়। ইহার উচ্চ
ও বিস্তৃত প্রাকার অতীতের ষবনিকা ভেদ করিয়া এখনও হিন্দুদর্শককে এক স্বপ্নময় রাজ্যের
অখণ্ডভোগের অধিকারী করে। ডাক্তার বুকানন, হার্মিণ্টন ইহার মধ্যে যে তিনটি মনোহর
সরোবরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মনোহারিত্ব আর নাই। যে স্থান একসময়ে
বর্ণচর্ণ-সজ্জিত বঙ্গীর অখারোহী সৈন্তের ক্রীড়াস্থলী ছিল, তাহা এক্ষণে শূন্যক্ষেত্রে
পরিণত হইয়াছে, কিন্তু প্রাকারের উচ্চতা ও বিস্তার, প্রাকারোপরি উপযুক্ত স্থানে প্রহরি-
স্থাপনের ব্যবস্থা, ধ্বংসাবশিষ্ট গন্ধিকা এবং তাহার বহির্দেশস্থ দ্বিতীয় প্রাকার দুর্ভেদ্য-জঙ্গলের
মধ্য হইতেও বঙ্গসন্তানের চক্ষুকে সাদরে আগম্বণ করত আপনার পূর্ব গৌরব স্মরণ

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায়বাহাদুর ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটিতে গঠিত এক প্রবন্ধে এক গোপীচন্দ্র
রাজার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে তাহার উপকরণ সংগৃহীত; তাহার মতে গোপীচন্দ্রের
রাজধানী ছিল চৈত্রগ্রামে। তাহার উপাখ্যানের কোন কোন অংশে যোগীদিগের উপাখ্যানের স্ফীণমুতি গ্রহীত
হইলেও তিনি গোপীচন্দ্রের যে বংশবিবরণ দিয়াছেন, তাহা যোগীদিগের বিবরণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমর্য
যোগীদিগের গোপীচন্দ্রকে চৈত্রগ্রামবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে একেবারেই অক্ষম।

করাইয়া দেয়। ধর্মপালের নামানুসারে সমগ্র মৌজার নাম এখন ধর্মপাল হইয়াছে : ধর্মপাল [ধর্মপুর নহে] একটী বিস্তৃত গ্রাম, এক্ষণে জলঢাকা থানার অধীন। পাটকাপাড়া ইহার অন্তর্গত। ধর্মপাল ও ময়নামতীর কোটের মধ্যে দেওনাই নামে এক ক্ষুদ্রনদ এখনও কলকলরবে প্রবাহিত। গীতোক্ত কলিঙ্গার বন্দর, শ্রীকলার বন্দর ও ডারাইপুর মহর কোথায় ছিল তাহা জানি না, কিন্তু যে স্থানে হীরার ধন খাপরায় পরিণত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সেই খোলাহাটী বর্তমান পার্শ্বতীপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে অধিক দূর নহে। পাটকাপাড়া হইতে পার্শ্বতীপুর প্রায় ৩৪ মাইল হইবে। এই স্থানেই পশ্চিম-মধ্যে হাড়ির অন্তত কয়েক লীলাভূমি অব্বেষণ করিতে হইবে। নৈদপুর ও পার্শ্বতীপুরের মধ্যস্থ প্রায় ১২ মাইল স্থান বঙ্গীয় প্রভুতত্ত্ববিদের পক্ষে বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্র। গ্রাম্য কৃষকের অধ্যুষিত পল্লী ও শ্রামল শস্তক্ষেত্রের মধ্যে কত প্রাচীন স্মৃতিস্মরণীয় দীর্ঘকায় কঙ্কালবিশেষ এখনও বিদ্যমান। কত ইষ্টক ও প্রস্তর রেলওয়ে কোম্পানীকর্তৃক স্থানান্তরিত অথবা মৃত্তিকায় নীল হইয়াও কোতুলোদীপ চক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। কত গ্রাম্যপ্রবাদ সাংস্কৃতিকের কৃষকশিল্পের নিদ্রোৎপাদনের সহায়তা করিতেছে। গীত-বর্ণিত কোন কোন উন্নত স্থানের অবস্থিতি এই প্রাচীন ভূমিতে অনুমান করা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না।

প্রচলিত মত অনুসারে মাণিকচাঁদ ধর্মপালের ভ্রাতা, স্ততরাং ধর্মপাল গোপীচন্দ্রের পিতৃব্য ছিলেন, মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর রাজ্য লইয়া ধর্মপাল ও ময়নামতীতে বোর যুদ্ধ হয়, তাহাতে ধর্মপাল নিহত হইলে গোপীচাঁদ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। ডাক্তার বুকানন এই মতের প্রবর্তক ; গ্রিয়ারসন, গ্লেজিয়ার প্রভৃতি অনেকে ইহার আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। বঙ্গীয় উপন্যাসকারের লেখনী এইমত ফিপ্রতার সহিত গ্রহণ করিয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের সময়ক্ষেপের সহায়তা করিয়া দিয়াছে। কেহ কেহ আবার ধর্মপালের এই Sister-in-law (ভ্রাতৃ-বধূ) ময়নামতীকে তাঁহার স্থালিকায় পরিণত করিয়াছেন। কেহবা ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বিকৃত নাম মিনাবতী অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষায় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বুকানন বোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তীর দোহাই দিয়া এই মতের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রিয়ারসন কিংবদন্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ধর্মপালকে মাণিকচাঁদের ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি বা সামন্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। আমি কেবল এইমত ভ্রমাত্মক বলিয়া গণ্য করি এমন নহে, বুকাননের উল্লিখিত কিংবদন্তীর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহান। যুদ্ধ ও প্রৌঢ় বোগীদিগের মধ্যে তুল্য তুল্য করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও আমি এইরূপ কিংবদন্তির বিন্দুমাত্র ভিত্তি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। যাহারা সমগ্র জীবন ময়নামতীর গাথা গাইয়া কাটাইয়াছে, যাহাদের বাসস্থান ময়নামতী ও গোপীচাঁদের কার্যক্ষেত্রের অনতিদূরে, তাহাদের মধ্যে এইরূপ

কিংবদন্তি না থাকিলে আর কোথায় পাওয়া যাইবে ? আর পাওয়া গেলেই বা কে তাহাতে বিন্দুমাত্র আত্মস্থাপন করিতে পারে ? কেবল এই কিংবদন্তীর অভাবই বুকাননের মত প্রত্যাখ্যান করিবার একমাত্র কারণ নহে । প্রাচীন যোগীদিগের মধ্যে যে অন্তরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ আছে । যে বুদ্ধযোগীদিগের নিকট হইতে আমি ময়নামতীর গান সংগ্রহ করিয়াছি তাহাদের মধ্যে এক জনের নিকট পরলোকগত অপর এক যোগীর রচিত একটা গাথা পাওয়া গিয়াছে । এটাও ময়নামতী সম্বন্ধে, ইহার প্রথম ভাগ এইরূপ—

“ধর্মপাল নামে ছিল রাজ্য অধিপতি ।

কদলী সহরে গ্রাম তাহার বসতি ॥

তাহার পুত্র রাজা মৌপাল নাম ।

শান্ত দান্ত স্নশীল গুণধাম ॥”

এই গাথার মতে মৌপাল বা মৈপাল রাজা পুত্রের জন্ম প্রতিদিন হরপার্বতীর পূজা করিতেন । একদিন ইজের সভায় এক ঢুলীর তালভঙ্গ হওয়ায় সে শাপগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে মৌপাল রাজার পুত্ররূপে জন্মিল । এই শাপগ্রস্ত ঢুলীই রাজা মানিকচাঁদ । আমি স্বীকার করি, এই গাথার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই । কিন্তু যদি ধর্মপাল রাজা মানিকচাঁদের ভ্রাতা অথবা ময়নামতীর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া যোগীদিগের মধ্যে সর্বত্র প্রবাদ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কি এই পরলোকগত যোগী ধর্মপালকে মানিকচাঁদের পিতামহরূপে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস পাইত ? অথবা সেই প্রবাদ কি এত শীঘ্রই যোগী-সমাজে লোপ পাইত ? ময়নামতীর গানে মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর গোপীচাঁদের জন্ম, বিবাহ, সিংহাসনারোহণ, সন্ন্যাস প্রভৃতির বিবরণ আছে । যদি তাঁহার সিংহাসন পিতৃব্যের বা অপর কোন নৃপতির কঠোর হস্ত হইতে বলপূর্বক উদ্ধার করার বিবরণ যুগান্ত্রেও সত্য হইত, তবে কি ময়নামতীর বিস্তৃত গৌরবগাথার মধ্যে তাহার একটুও স্থান যুটিত না ? এক মাইল ছুই মাইলের মধ্যে কি ছুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার অস্তিত্ব সম্ভবে ?

যদি ধর্মপাল মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর রাজ্যশ্রী হস্তগত হইবামাত্র ময়নামতী কর্তৃক তাড়িত বা নিহত হইতেন, তাহা হইলে রাজধানীর নাম তাঁহার নামানুসারে না হইয়া ময়নামতী বা গোপীচাঁদের নামানুসারে হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল । সিংহাসনারোহণের পরই পলায়িত বা নিহত রাজার নাম নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী আজীবন বহন করিবে কেন ? মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর ময়নামতীকর্তৃক তাড়িত বা নিহত হইলে পরিখা-প্রাকারযুক্ত রাজধানী স্থাপনের সুযোগই বা ধর্মপাল কখন পাইলেন ?

আমার বিশ্বাস মানিকচাঁদের সহিত ধর্মপালের আত্মীয়তা কি বৈরিভাষ্যচক যে সমস্ত মত প্রচলিত হইয়াছে তাহা সমস্তই কাল্পনিক এবং বাসস্থানের সন্নিধ্যই সেই কল্পনায় ইন্ধন যোগাইয়াছে । মানিকচাঁদ বা গোপীচাঁদ যে পালবংশীয় রাজা ছিলেন, এরূপ বিশ্বাস

করিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। তাঁহাদের নামে পাল উপাধি নাই, গোবিন্দচন্দ্রের গীতে তাঁহার পরিচয়স্থলে লিখিত হইয়াছে—

“সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।

তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ॥”

যেভাবে এই পংক্তি দুইটি প্রাচীন পুঁথিতে সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাদিগের ঐতিহাসিক মূল্য থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কে বলিতে সাহসী হইবে যে বঙ্গের পাল-বংশীয় এক নৃপতির নাম ছিল ধাড়িচন্দ্র? গ্রীয়ারসন্ সাহেবের প্রকাশিত মাণিকচন্দ্রের গানে গোপীচাঁদরাজ্যের বেণেজাতি ও ক্ষত্রিকুল উক্ত হইয়াছে। এ ক্ষত্রী ক্ষত্রিয় কি না তাহা জানি না, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের আবার বেণেজাতি কেমন করিয়া হয়? ময়নামতীর গানে গোপীচাঁদ রাজ্যের যে সমস্ত সংস্কারের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে উপনয়নের কোথাও প্রসঙ্গ দেখি না, জন্মের পর ত্রিশ দিনে ত্রিশার উল্লেখ আছে। তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছুক হইলেও ত্রাত্য বা “বৃষলতাং গত”। এ অবস্থায় ময়নামতীর দেশে বহুকাল হইতে যে জাতি প্রবল, এমন কি এখনও কেবল “হিন্দু” বলিলে যে জাতিকে বুঝায়, যে জাতির নাম এবং ইতিহাস-শূন্য অতীতের ক্ষীণস্মৃতি তাহার প্রাচীন রাজপদ ঘোষণা করিতেছে, যে জাতি এখনও ত্রাত্য বা ভঙ্গ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবার স্পর্ধা করে, যে জাতির মধ্যে এখনও “বাগিয়া”-শাখা সম্মানিত, মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদ সেই রাজবংশী কুলসম্প্রদায় অনুমান করা কি নিতান্তই অত্যাচার? ধাড়িচন্দ্র, অছনা, পছনা ও লোরা প্রভৃতি নাম, পাটিকানগরের ত্রায় পাণ্ডুবর্জিত স্থানে মাণিকচাঁদের বহু জাতির অস্তিত্ব, দেবপুরের বা পার্শ্বত্যাগ্রেদেশের কত্যাগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন, অদূরে স্বজাতি হরিশ্চন্দ্র রাজ্যের অবস্থান, অছনাকে বিবাহ দিবার সময়ে দানসামগ্রীর মধ্যে তাঁহার অপর কত্যা পছনাকে পর্য্যন্ত দান, অছনা ও পছনাকে বাদ দিলে রাজপরিবারস্থ নারীগণের সতীত্বধর্ম্যে আস্থা, বৈধব্যদশায় ময়নামতীর প্রকাশ্যভাবে তামূল চর্কণ, এ সমস্তই যেন মাণিকচাঁদের রাজবংশীকূলে জন্মের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র, তবে এই অনুমানে উপনীত হইবার পর একখানি গ্রন্থে ইহার সমর্থক মত পাওয়া গিয়াছে। বাবু দুর্গাচন্দ্র সান্না্যাল তাঁহার “বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস” নামক পুস্তকে ভবচন্দ্র রাজ্যের রাজধানীর বিবরণ লিখিয়া বলিয়াছেন যে এই বংশীয়েরা রাজবংশী ছিলেন। দুর্গাচন্দ্র বাবু তাঁহার এই উক্তির গোষক কোন প্রমাণ বা তর্কের অবতারণা করেন নাই, বোধ হয় রঙ্গপুরের দক্ষিণাংশ হইতে সংগৃহীত কোন প্রবাদই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এত সহজভাবে কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহার বিরুদ্ধে অত্যাচার মত যে বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় তাঁহার অপরিস্রুত। ভবচন্দ্র রাজা গোপীচন্দ্রের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবচন্দ্র বা হবচন্দ্রের নির্বুদ্ধিতার অনেক গল্প এখনও ঠাকুরমার ঝুলি অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভবচন্দ্রের পরবর্তী রাজাকে বুকানন “পাল রাজা” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই

পালরাজা যে ভবচন্দ্রের বংশীয় তাহার প্রমাণ কোথায়? বুকানন ইহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। ইহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ নাকি “পালেরগড়” নামে এখনও পরিচিত। যদি ইনি ভবচন্দ্রের বংশীয়ই হইবেন তবে পূর্বপুরুষের স্থায় বিশেষ নামে পরিচিত না হইয়া পালরাজা বলিয়া খ্যাত হইবেন কেন? তাঁহার বাসস্থানই বা বিশেষরূপে “পালেরগড়” আখ্যা পাইবে কেন?

রাজবংশী নাম শুনিলেই কোন ঘৃণিত জাতি মনে করিবার কারণ নাই। রঙ্গপুরে রাজবংশীজাতি সম্ভবতঃ দক্ষিণবঙ্গের মৎস্যব্যবসায়ী রাজবংশী হইতে ভিন্ন। তাহার নিশ্চয়ই ভারতীয় আদিম অনার্য্যজাতি হইতে উচ্চস্তরে। লোকগণনার তাহাদিগকে কোচ্ হইতে স্বতন্ত্র এবং Dravidian বলা হইয়া থাকিলেও অনেকের মতে তাহাদের শরীরে বিলক্ষণ মঙ্গোলীয় শোণিত এবং ক্রিয়ৎপরিমাণে আর্য্য-শোণিত বিद्यমান আছে। ভারতের উত্তরপূর্বদ্বার পূর্বভারতে অনেক সময়ে বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ আনয়ন করিয়াছে। কথিত আছে, গোড়নগর হিন্দুর রাজধানী হইবার পূর্বে তুরাণদেশীয় কোন নৃপতির বাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। খুব সম্ভব এইরূপ কোন পার্শ্বত্যাগি জাতিই কালে রাজবংশী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, হিন্দুর সংস্রবে আদিয়া হিন্দু প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ক্রিয়ৎপরিমাণে আর্য্যরক্ত শরীরে মিশাইয়াছে।

মানিকচাঁদের সহিত পালবংশের সংস্রবসূচক যে সমস্ত উপাখ্যান সাহেবেয়া বিবৃত করিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও তাঁহার বংশের সহিত পালবংশের কোন কুটুম্বিতা ঘটা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহার প্রমাণাভাব। এই হুই বংশের সংঘর্ষ অনুমান করিবারই অধিক কারণ দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মপালের নাম ও গড় তাঁহার প্রবল প্রভাপ ঘোষণা করিতেছে। পূর্ববর্তী বংশের কর্ত্তি লুপ্ত বা খর্ব্ব করিয়া আপন প্রাধাত্য স্থাপন এবং গৌরববর্দ্ধনই সনাতন রাজপ্রথা। এরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে যে অরক্ষিত পাটকানগর হইতে গোপীচাঁদ বা তাঁহার বংশধর প্রবলতর পালবংশকর্ত্তক তাড়িত হন এবং তাহার পর পরিধা-প্রাকারবেষ্টিত ধর্ম্মপালনগর প্রতিষ্ঠিত হয়। বুকাননের সময়ে গোপীচন্দ্রের ব্রহ্মপুত্রতীরে উলিপুরের পূর্বদিকে এক বাসগৃহ ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত ছিল। তাহার পুত্র ভবচন্দ্র বা হবচন্দ্রের রাজধানী রঙ্গপুরের দক্ষিণভাগে বাগ্‌ছয়ারে অবস্থিত ছিল। এ উভয় স্থানই পাটকানগর হইতে বহুদূরে। গোপীচাঁদ বাইশদণ্ডের রাজা ছিলেন বলিয়া গানে উক্ত হইয়াছেন। হইতে পারে যোগীরা আপন সমৃদ্ধির মানদণ্ড দ্বারা রাজার সমৃদ্ধির পরিমাপ করিতে গিয়া তাঁহার গৌরব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান পার্কতীপুরের অদূরে যে রাজার “বৈদেশ সহর” ছিল, তিনি ঠিক বাইশদণ্ডের রাজা না হইলেও বঙ্গদেশের বা বরেন্দ্রভূমির একচ্ছত্র রাজা ছিলেন না ইহা নিশ্চিত। “বাইশদণ্ডের রাজা” বলিয়া প্রসিদ্ধ নৃপতির রাজধানীর অদূরে যদি অপর নৃপতির নাম অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাঁহার নিজের রাজধানী যদি

বাইশদণ্ডেরও অধিক দূরে স্থানান্তরিত হয়, তবে তাহা স্বেচ্ছায় স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া সহজে মনে করা কঠিন হইয়া উঠে। বুকাননের উল্লিখিত পালরাজ্য বিজেতা পালবংশের কোন শাখা হইতে উদ্ভূত হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা মনে হয়।

অপরপক্ষে বলা বাইতে পারে যে পরলোকগত যোগীর যে গাথায় মাণিকচাঁদ ধর্মপালের পৌত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ঐ গাথা বুকাননের মতের বিরোধী হইলেও রাজার পাল-বংশই ঘোষণা করিতেছে। মহীপাল, যোগীপাল ও গোপীপালের গীত বাঙ্গালার লোকের ঐতিহ্যবাহী ছিল, ইহা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ গানের ভগ্নাবশেষই সমুদ্রের হ্রদে পরিণতির-দ্বারা ক্ষীণকালেবরে জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা—সুতরাং গোপীচাঁদের গীতই গোপীপালের গীত বলিয়া অনুমান করা কর্তব্য। এই যুক্তি কতদূর প্রবল তাহা বিবেচনার বিষয়। মহীপালের গীত গোপীপালের গীত অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল অথচ এখন আর তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত কেহই মহীপাল ও যোগীপালের গীত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় গোপীপালের গীত যে অধিকতর সৌভাগ্যশালী হইয়াছে তাহা কিরূপে অনুমান করা যায়? আর যদি ইহা গোপীপালের গীতই হইবে তবে গানের এক স্থানেও রাজার পাল উপাধির উল্লেখ নাই কেন?

বাহা হউক এ বিষয়ে আরও গবেষণা আবশ্যক। আমাদের বর্তমান উপকরণ লইয়া বিচার অনেকটা অন্ধকারে হস্ত প্রসারের দ্বারা।

গোপীচাঁদের ঋগুর হরিশ্চন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্রও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ধর্মপাল হইতে ৭৮ মাইল ব্যবধানে হরিশ্চন্দ্র-পাট গ্রাম বিদ্যমান। গ্রামের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশ্চন্দ্রের অতীত মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দুইটী বৃহৎ মূর্তিকাস্তূপ এখনও পার্শ্ববর্তী লোকের বিশ্বাসোৎপাদন করিতেছে, একটীর মধ্যস্থ ইষ্টক ও প্রস্তর রাজার সমাধি বলিয়া ডাকার গীয়ারসন্ অনুমান করিয়াছেন। এই স্তূপ বিপর্যস্ত ও ইহার উপকরণ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, কিন্তু এক স্তূপ প্রস্তরখণ্ড এখনও উপরিভাগে বিদ্যমান থাকিয়া বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র অবস্থানজনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে। ধর্মপাল ও হরিশ্চন্দ্র পাটের মধ্যবর্তী এক গ্রামের এক প্রাচীন পুষ্করিণীর মধ্যে অল্পদিন পূর্বেও এক ধ্যানিবুদ্ধমূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহা বোধ হয় এখনও নীলফামারীতে আছে।

মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের সময় নির্ধারণ, তাঁহাদের জাতিনির্ধারণ অপেক্ষা কঠিন নহে। স্ক্রজ্জর দৌনেশচন্দ্র সেন খৃষ্টীয় দশম-কি একাদশ শতাব্দীতে গোপীচন্দ্রের আবির্ভাব-কাল নির্দেশ করেন এবং মূল গাথাটাও ঐ রূপ সময়ে রচিত বলিয়া অনুমান করেন, তিনি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট সমীচীন বোধ হয় না। এই গাথায় কড়িয়ারা রাজকর আদায়ের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু কড়ি যে কেবল হিন্দুরাজ্যেই রাজকররূপে গ্রহীত হইত এমন নহে। মুসলমানরাজত্বের

শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হয়। আমাদের ইতিবৃত্তে শ্রীহট্ট প্রদেশের কড়ির ভাৱ “ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির” কর্মচারিবর্গকে পর্যন্ত উভ্যক্ত করিয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তিরুমলয়ের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে যে গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সে গোবিন্দচন্দ্র ময়নামতীর পুত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া কতকটা দুঃসাহসের কাজ। ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্র বলিয়াই বিখ্যাত। যদি দুর্ভাগ্য মল্লিকের গানে তাঁহার নাম গোবিন্দচন্দ্রে পরিণত হইয়াছে এবং যোগীদিগের গানেও দুই এক স্থানে “রাজা গোবিন্দাই” এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়, তথাপি তাহা গোপীচন্দ্রের প্রচলিত নাম বলিয়া কোনমতেই স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যদিও ময়নামতীর গানে গোপীচন্দ্র “বঙ্গের গোসাই” বলিয়া একস্থানে উক্ত হইয়াছেন, তথাপি বঙ্গ বলিতে সে কালে সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গই বুঝাইত।

হাড়িসিদ্ধার বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া স্বয়ং ময়নামতী বলিতেছেন—

“এদেশীয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর।”

যদি ময়নামতীর হস্তে ধর্মপাল নিহত হওয়ার প্রবাদ সত্য হয়, তাহা হইলেত ধর্মপাল ও গোপীচন্দ্র উভয়ের রাজেন্দ্র চোলের হস্তে পরাজিত হওয়ার বিবরণ একেবারে ভিত্তিহীন হইয়া দাঁড়ায়। গোবিন্দচন্দ্র যদি বরেন্দ্রভূমির ২২ দণ্ডের রাজা হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার পরাজয়ের উল্লেখ দিখিজয়ী দাক্ষিণাত্যরাজের শিলালিপিতে স্পষ্টরূপে সহিত খোদিত হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। এই সকল কারণে রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি আমাদের সহায়তা করিতে অক্ষম বলিয়া মনে হয়। ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তকতালিকায় (Catalogue) এক গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ আছে (Catalogue no 2739, m. m. 1351c)—গ্রন্থকার সুরেশ্বর বা শূরপাল লিখিয়াছেন যে তিনি ভীমপাল নৃপতির রাজবৈষ্ঠ, তাঁহার পিতা বঙ্গদেশের রামপালের রাজবৈষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার বৃদ্ধপিতামহ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজবৈষ্ঠ ছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্র শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র কি না মনেহ, তাঁহাকে আমাদের গোপীচন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিতে একেবারেই সাহসে কুলায় না।

পূর্বে গোপীচাঁদের জাতিকুল বিচার এবং ধর্মপালনগর স্থাপন সম্বন্ধে যে অনুমান করা গিয়াছে তাহা হইতে স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে, গোপীচাঁদ সম্ভবতঃ ধর্মপালের কিছু পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই ধর্মপাল যদি ২য় ধর্মপাল বা রাজেন্দ্র চোলের উল্লিখিত ধর্মপাল হন, তাহা হইলেও গোপীচাঁদ অন্ততঃ দশম শতাব্দীর লোক হইতেছেন। গোপীচাঁদের গাথা তাহার মৃত্যুর অদিককাল পরে রচিত হওয়া সম্ভব নহে। সুরতাং রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত না হইলেও ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে। মূল ময়নামতীর গাথা খৃঃ দশম শতাব্দীতে বা তাঁহার সম্বন্ধিত কোন সময়ে রচিত। স্বহৃদর নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্পাদিত শ্রুতপুরাণের ভূমিকায়, ঐ গ্রন্থে সিদ্ধার নামোল্লেখ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা যদি প্রক্ষিপ্ত হয়, তবে কোন কথা নাই, কিন্তু তাহা

না হইলে এবং ঐ দিক্কা ও আমাদের হাড়িসিক্কা এক হইলে তাঁহার আবির্ভাব রমাই পণ্ডিতের পূর্বে বলিয়া অনুমান করিতে হয়। মগেন্দ্র বাবুর দিক্কাতে রমাই পণ্ডিতকে সম-সাময়িক বলিয়া অনুমান করিতে হয়। জলন্দরির গুরু গোরখনাথের আবির্ভাব কাশ এখনও নিঃসন্দেহরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই, তবে তিনি সম্ভবতঃ খৃঃ ৮ম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবীরের সহিত তর্কযুদ্ধের ইতিহাস অনেকের মতেই ঐতিহাসিক নহে। ময়নামতীর আবির্ভাব এবং যে সময়ে তাঁহার গাথা রচিত হয়, সে সময় গোড়ে ও মগধে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণপ্রভা প্রকটিত। কিন্তু ইহা বিস্ময়কর বৌদ্ধধর্ম নহে, নানা কুসংস্কারজড়িত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। হাড়ি দিক্কা এবং ময়নামতী উভয়ই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গোরখনাথের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গাথাটিতে অনেক নিরক্ষর জয়গোপালের পাণ্ডিত্য যোজিত হইয়াছে এবং যথাসম্ভব হিন্দুত্ব ইহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ইহাকে এক অপূর্ণ খিচুড়ীতে পরিণত করিয়াছে। বৌদ্ধ মতের সহিত বৈষ্ণব ও শৈব মতের অদ্ভুত পরিণয় হইয়াছে; ভাষা অনেক স্থলেই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত, সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এবং ছন্দভ মল্লিকের অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গাথায় যতটা বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষিত হয়, হিন্দুত্ব প্রাপ্ত যোগীদিগের রূপায় এখন স্রব্ধং পালায় ও ততটা পাওয়া কঠিন, কিন্তু বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার মোহিনী শক্তি এবং গোপীচন্দ্রের অপূর্ণ বৈরাগ্য যে প্রাচীন কাণেই দেশ দেশান্তরে লোকের মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা নাগ-সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুক যোগীর চেষ্টা ও উত্তমের ফল। এত বড় শিকার সম্ভবতঃ তাহাদের আর কখনও হস্তগত হয় নাই। ভিক্ষাবৃত্তিধারী যোগীগণ যেখানে গিয়াছে, সেই খানেই তাহাদের প্রিয় গাথার বিকৃত বা অবিকৃত ভাবে প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে।

তাই আমরা দেখিতে পাই ছন্দভ মল্লিক পশ্চিম বাঙ্গালার লোক হইয়াও রঙ্গপুরের, সন্ন্যাসী রাজা ও তাঁহার গুরুর যশোকীর্তনে ব্যগ্র। শুনিয়াছি ত্রিপুরা জেলায় ও পূর্বে বঙ্গ রাজ্য গোপীচাঁদের গাথা প্রচলিত ছিল। এখন তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য গোপীচন্দ্রের বৈরাগ্য গাথাকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার রাজ্যের পরিমাণ যাহাই থাকুক, খ্যাতি করতোয়ার তীরে আবদ্ধ ছিল না।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় তাহার “বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র প্রাচীন কাল হইতে গোপীচাঁদ নামক এক রাজার বিবরণটি লিখিত ও কথিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রদেশ, রাজপুতানা, অযোধ্যা, পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি বহুস্থানে রাজা গোপীচাঁদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের লোকেরা রাজা গোপীচাঁদকে গোড় (বাঙ্গালী)

দেশীয় ব্রাহ্মণ রাজা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহাদের পূর্ব পুরুষেরাও গোপীচাঁদকে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজা বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। মরাঠী, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় রাজা গোপীচাঁদ সম্বন্ধে শত শত কাব্য, নাটক, গল্প, ছড়া ও গীত প্রভৃতি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও পুণায় বাঙ্গালী রাজা গোপীচাঁদের ছবি বিক্রীত হইয়া থাকে। কান্দী, ফয়জাবাদ, আহামদনগর, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে, গোপীচাঁদ রাজার নাটক অভিনয় হইয়া থাকে অথচ বঙ্গদেশে কেহ কখন গোপীচাঁদ রাজার নামও শ্রবণ করে নাই। পশ্চিমোত্তরপ্রদেশে গোপীচাঁদের গল্প कहিয়া অথবা তাঁহার জীবনের ঘটনাবিশেষের গান গাইয়া শত সহস্র লোক ভিফা করিয়া থাকে। বহু ভাষায় বহু পুস্তকে গোপীচাঁদের অদ্ভুত জন্ম, বনবাস, রাজত্ব, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসধর্মগ্রহণ, গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার, পুনরায় স্বরাজ্যে আগমন, বিবাহ, পিশাচকর্তৃক আক্রমণ, ভূতের সহিত যুদ্ধ, রাণীর সহিত কলহ, মাতার সহিত মনোমালিখ প্রভৃতি ঘটনাবলী নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক বিরচিত হইয়া গিয়াছে, সকল গ্রন্থেই ইহাকে গোড়দেশের “বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজা” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ বঙ্গদেশে এই রাজার নাম কেহই শুনে নাই” ইত্যাদি। অত্যাশ্চর্য্য প্রদেশের সাহিত্যে গোপীচাঁদের উপাখ্যান কতকটা বিকৃতভাবে গৃহীত হইলেও, বঙ্গীয় উপাখ্যানের সহিত তাহার এতই সাদৃশ্য যে আমাদের যোগীসম্প্রদায় নির্দিষ্টবাদে উত্তমর্গের গর্ব্ব অলুভব করিতে পারে। ছারিকাপুরীর অদূরবর্তী আক্কদনগরের কবি, রাজার মর্যাদা রক্ষার জন্ত, তাঁহার মহিষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৬০০ করিয়া দিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সম্বন্ধবিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপাখ্যানের মৈনামতী ত্রৈলোক্যচাঁদ, কাঞ্চননগর, জলন্দর, কাণিপা প্রভৃতির নাম এবং প্রবাদের সারমর্ম আপন জন্মভূমি লুকাইতে পারে নাই।

কে এই বঙ্গীয় গাথার আদি রচয়িতা তাহা স্থির করা অসম্ভব—সম্ভবতঃ কোন যোগী। রঙ্গপুরের যোগীসম্প্রদায় এখন অত্যাশ্চর্য্য স্থানের যোগী হইতে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুত্বের স্থূল আবিরণ দ্বারা প্রাচীন বৌদ্ধমত প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহাদের আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ সেই ভাবের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিতে পারে নাই। এখনও ধর্ম্ম তাহাদের প্রধান উপাস্তদেবতা, গোরখনাথ, দীরনাথ, ছায়ানাথ, রঘুনাথ প্রভৃতি উপদেবতা বা স্মরণীয় মহাপুরুষ। মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড় ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুরে ধর্ম্ম শ্বেতক্লম্বী। এখানেও—

“ধলখাট, ধলপাট ধল সিংহাসন

ধরম সতীক পুষ্পের পর ধর্ম্মের আসন।”

ভিক্ষাদ্বারা তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া বৈশাখ ও কার্তিক মাসে যোগীদিগকে ধর্ম্মপূজা করিতে হয়। এই পূজায় হংস, পারাবতাদি উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু নিহত করা হয় না। যোগীদিগের গুরু ও পুরোহিত স্বজাতীয়। যোগীদিগের জন্মের পর ক্ষৌরকার দ্বারা সন্তানদের কর্ণ চিরিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, তিন বৎসর বয়সে গুরুর মন্ত্রগ্রহণ করিতে হয়, নতুবা শিশুর পংক্তি-

ভোজনের অধিকার ক্রমে না। মৃতদেহ জোড়াসন বা যোগাসনে সমাধিস্থ করা হয়। ধর্মঠাকুরকে কোন কোন স্থানে চুণ উপহার দেওয়া হয় বলিয়া শুনা যায়। চুণ বিক্রয় ও ভিক্ষা ময়নামতীর গানের যোগীদিগের প্রধান উপজীবিকা।

যোগীসম্প্রদায়ের লোক প্রায়ই নিরক্ষর। এই গাথার কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁকি আমি পাই নাই। ভিন্নস্থানীয় দুইটি বুদ্ধ যোগীর আবৃত্তি অনুসারে দুইটি সুবিস্তৃত পাঠ সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহার একটীতে লোচনদাস নামে এক বৈষ্ণবকবির ভণিতা দৃষ্ট হয়। এই লোচনদাস যে, স্থানে স্থানে আপনার ভক্তি ও কবিত্বশক্তি দ্বারা গাথার কমেবর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দুইটি পাঠ ব্যতীত, আর একটা আংশিক পাঠ অপর এক যোগীর নিকট হইতে আহৃত হইয়াছে। সম্পূর্ণ গাথা আবৃত্তি করিতে পারে এমন যোগী এখন দুর্ঘট। এই সকল পাঠ এবং গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ তুলনা করিয়া আমরা এফগে ময়নামতীর গানের একটা সংস্করণ প্রকাশ করত প্রাচীন সাহিত্যাদ্যে বঙ্গীয় পাঠককে উপহার দিতে সমর্থ। ভিন্ন ভিন্ন পাঠের তুলনায় প্রাচীন ও আধুনিক অংশ স্থানে স্থানে স্বতন্ত্ররূপে নির্দেশ করাও কতকটা সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই গানের অনেক অংশের অর্থবোধ একটা বিবম ব্যাপার। কোথাও প্রাচীন শব্দের সমাবেশ, কোথাও রঙ্গপুরের গ্রাম্যগানের ব্যবহার, কোথাও নিরক্ষর গায়কের হস্তে প্রচলিত শব্দের বিকৃতি এমন কঠোর জটিলতা আনয়ন করিয়াছে, বাহা হইতে অর্থোদ্ধার কেবল পাণ্ডিত্যের সাহায্যে ঘটিয়া উঠে না। গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত গাথার অনেক পাঠ-বিভ্রাট এবং তাহার ব্যাখ্যায় অনেক অর্থবিভ্রাট সহজেই ধরা পড়ে। এই সুপ্রাচীন ইতিহাসমূলক বৌদ্ধভাষাঙ্গ গ্রাম্যগাথার উদ্ধার যে বঙ্গভাষার পক্ষে বিশেষ বাঞ্ছনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। যে দুইটি বুদ্ধের নিকট হইতে বিস্তৃত পাঠ সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহাদিগের জন্ম গোদা ধর্মের নিকট অচিরে তলপ চিঠি প্রেরণ বিপাতার পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে। গাথাটী লুপ্ত হইলে বঙ্গভাষার ভাণ্ডার হইতে এমন একটা অমার্জিত রত্ন অপসৃত হইবে যাহার স্থান চণ্ডীদাস, কৃতিবাস কি কবিকঙ্কণ পূরণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ

সিংহবংশ

মহাবংশ হইতে জানা যায়, বঙ্গরাজ্যের কত্তার নাম সুপ্রদেবী। বয়স হইলেও সুপ্রদেবীর বিবাহ হয় নাই। পরমাসুন্দরী, সুপ্রদেবী কামগুণিনী হইয়া বৈরাচার-সুখোদ্দেশে একাকিনী পিতৃভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে এক সার্থপতি

বঙ্গ-হইতে মগধে যাইতেছিলেন, সুপ্রদেবী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সার্বপতিকৈ সার্থসিংহ বলা যাইতে পারে। সুপ্রদেবীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐ সার্থসিংহের ঔরসজাত এ কথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা অসম্ভব নহে। সুপ্রদেবীর পুত্রের নাম সিংহবাহ। হিউএনসঙ্গ, ইহাকে জম্বুদ্বীপের মহাবলিক ও ইহার নাম সিংহ বলিয়াছেন। বঙ্গরাজের দৌহিত্র এই সিংহবাহ শতযোজন অরণ্যে সিংহপুর নামক নগর ও গ্রামসমূহ নিবেশিত করেন। সিংহবাহর রাষ্ট্রের নাম “লাডুরটু”। জৈনশাস্ত্রে লাড়কে “লাট” বলে। “লাডু” বা “লাটু” আমাদের রাঢ়দেশ। সিংহপুর, বোধ হয় হুগলি জেলার অন্তর্গত বর্তমান সিজুর। সিংহবাহ, স্বীয়ভগিনী সিংহস্ত্রীবলিকৈ মহিষী করিয়া ঐ নগরে রাজত্ব করেন। সিংহবাহর পুত্রের নাম বিজয়সিংহ। বিজয়সিংহ, ভাত্রপর্নি দ্বীপজয় করায় তাঁহার নাম হইতে ঐ দ্বীপের নাম সিংহল হইয়াছে। নির্ঝাণোন্মুখ ভগবান্ বুদ্ধ যে দিন কুশীনগরের হই শাল তরুদ্বয়ের মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন, কুমার বিজয়সিংহ সেই দিন ভাত্রপর্নিদ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

শাক্যবংশ

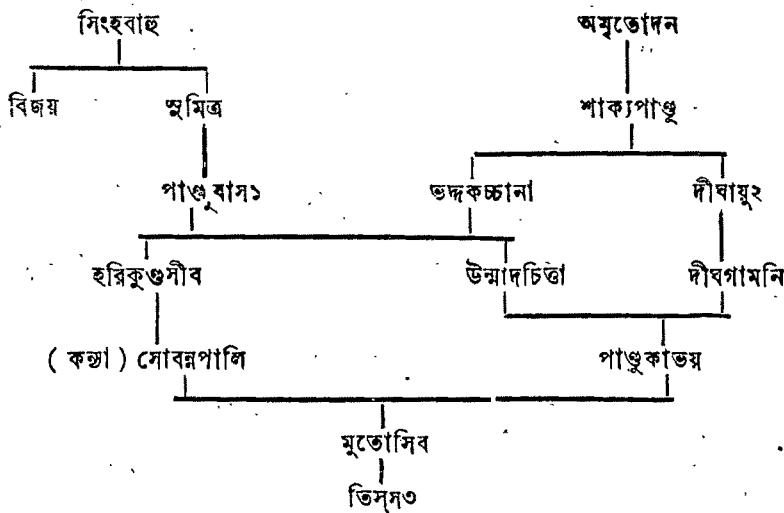
মহাকৌশলের পুত্র কাশীকৌশলেখর প্রসেনজিৎ, বিবাহার্থ এক শাক্যকন্যা প্রার্থনা করিয়া কপিলবাস্ত্র নগরে দূত প্রেরণ করেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর তৎকালে মহান্ শাক্য কপিলবাস্ত্রর রাজা হইয়াছিলেন। মহান্-শাক্যের মহানন্দা নাম্নী এক দাসী ছিল। ঐ দাসীর গর্ভে তাঁহার বাসভণ্ডিকা ও মালিকা নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল। মহান্-শাক্য ঘোড়শবরীয়া ঐ দাসীকন্যাকে স্বীয়কন্যা বলিয়া কোশলেখরের দূতদিগের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। প্রসেনজিৎ, তাহাকে শাক্যকুলকন্যা জানিয়া প্রধানা রাজ্ঞী করিলেন। যথাকালে রাজ্ঞী এক পুত্র প্রসব করিলেন, তাহার নাম হইল বিরুচক। বিরুচক, বাল্যকালে কপিলবাস্ত্র নগরে গমন করিলে শাক্যবালকগণ, তাঁহাকে দেখিয়া দাসীপুত্র বলিয়া উপহাস করেন। জাতকোদধি বিরুচক উত্তরকালে স্বীয় পিতা প্রসেনজিৎকে, সেনাপতি দীর্ঘচায়ারণের সাহায্যে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শ্রাবস্তীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। প্রসেনজিৎ, স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে নিজ জামাতা অঙ্গ ও মগধের অধীশ্বর অজাতশত্রুর সাহায্যে প্রার্থনার নিমিত্ত রাজগৃহে অভিযুক্তে যাত্রা করিলে পথে তাঁহার মৃত্যু হইল।

বিরুচক, কাশী ও কোশলের রাজা হইয়া পূর্বাগমান শ্রবণান্তে কপিলবাস্ত্র আক্রমণ করিলেন এবং পুরদ্বার ভেদ করিয়া সহস্রা প্রবেশানন্তর সপ্তসপ্ততি সহস্র শাক্যকে হনন করিলেন, পঞ্চশতশাক্যকে হস্তী ও লৌহদ্বারা মর্দিত করিলেন এবং পঞ্চশত শাক্যকন্যাকে বন্দিণী করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহারি তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী হইতে অসম্মত হইলে তাঁহাদের করছেদ করাইলেন। ভগবান্ বুদ্ধের খুল্লতাতে অমৃতোদন শাক্য, তাঁহার পুত্র পাণ্ডুশাক্য। পাণ্ডুশাক্য ঐ যুদ্ধের প্রাক্কালে নিজকদিগকে সঙ্গে লইয়া অস্ত্র অপদেষে

গঙ্গাপারে গমন করিলেন এবং তথায় পুর স্থাপিত করিয়া সেই পুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুশাক্যের নগর কোথায়? এই হুগলি জেলার অন্তর্গত বর্তমান পাণ্ডুরা? পাণ্ডুরায় পাণ্ডু নামে রাজা ছিলেন এই জনপ্রবাদ অত্যাধি প্রচলিত আছে। দক্ষিণরাঢ়ায় ভূরিস্থিতি (ভূরহুট) গ্রামে পাণ্ডুদাস নামে এক রাজা ছিলেন। বলদেব ও অবৈকার পুত্র শ্রীধর ঐ গ্রামে পাণ্ডুদাসের আশ্রয়ে বাস করিয়া ৯৯১ খৃষ্টাব্দে পদার্থ ধর্মসংগ্রহের ভাষ্যকন্দলী নামক টীকা লিখিয়াছিলেন। অনুমান হয়, পাণ্ডুদাস পাণ্ডুশাক্যের বংশে জন্মিয়াছিলেন।

পাণ্ডুশাক্যের বংশ ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অপসৃত হইয়া থাকিবে। শ্রামকদিগের “ফ্রা পথোম” গ্রন্থ হইতে জানা যায়, “থন্ববুরি” (দন্তপুরী) যে দেশের নগর সেই দেশে সিংহরস (সিংহরাজ?) নামে এক রাজা ছিলেন, যিনি স্বীয়রাজ্যে এক শ্রমিক চৈত্রে নিযুক্ত করেন, যাহার মধ্যে বৃক্ষের একটি দন্ত নিহিত ছিল। (J. A. S. B. 1848, p. 82.) উক্তোগপর্বে ২২ এবং ৪৭ অধ্যায়ে (প্রতাপচন্দ্র রায়ের সংস্করণ) কলিঙ্গদেশে যে “দন্তকূর” উক্ত হইয়াছে, উহাই দন্তপুরী। দন্তপুরীর বর্তমান নাম দাঁতন বলিয়া বোধ হয়।



১ বিজয় অপুত্রক ছিলেন বলিয়া পাণ্ডুবাস রাষ্ট্রদেশ হইতে সিংহলে নীত হইয়া রাজা হইয়াছিলেন।

২ দীঘায়ুর ভগিনী ভদ্রকচ্চানাকে পাণ্ডুবাস বিবাহ করেন। দীঘায়ু ভগিনীকে দেখিতে গিয়া সিংহলে বাস করেন।

৩ তিস্ম বা দেবানংগিরতিস্ম, পাটলিপুত্রে সম্রাট অশোকের নিকটে দূত পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

দন্তেশ্বরী

মঞ্চলপুরতলবাহিনী “মহানদী”র* শোভাময় তটদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অমরকণ্টক নামক প্রসিদ্ধ পার্বত্য প্রদেশ পর্য্যন্ত—এই সু বিস্তৃত ভূভাগ, অপূৰ্ণ নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। শোভাময়ী প্রকৃতি-সুন্দরী, এই স্থানে পথিকদিগের কেবল নয়ন ও মনের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন তাহা নহে, পরন্তু এই সুবিশাল প্রদেশস্থিত বহু সংখ্যক অতীব পুরাতন মন্দির, রাজ-প্রাসাদ, অভ্যাস্ত স্তম্ভ, নির্জন গুহা, বিহার, দেবালয়, দেবদেবীর মূর্তি, সাধকশ্রম প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া দিয়া পথিকগুণ্ণের হৃদয়ে মানব জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা, মনুষ্যের গৌরব ও মৌরভের নশ্বরতা, ধোবন, অহঙ্কার ও প্রভুত্বের ক্ষণস্থায়িত্ব, সংসারের চঞ্চলতা এবং কালের ছল্লিবার্য্য পরিবর্তন-শীলতা সম্বন্ধে ঘোরতর বৈরাগ্যের সঞ্চায় করিয়া দিয়া থাকেন। এই সকল প্রবীণ কীর্তিমালা মেকালের প্রবল প্রতাপাশ্রিত ও অসাধারণ প্রতিভাশালী হিন্দু নরপতিদিগের যেমন অতুলনীয় সামর্থ্যের পরিচায়িকা, তেমনি হিন্দু-ভাস্করদিগের বুদ্ধিকৌশল ও শিল্প-চাতুর্য্য এবং সনাতন সাধকদিগের ধর্ম্মপূহা নিতান্ত অক্ষুণ্ণ নিদর্শন স্বরূপ গণনীয় হইবার বোধ্য; কিন্তু বিষাদের বিষয় এই যে, এই সমস্ত প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষের বিস্তৃত বিবরণ আমরা অত্য়পি প্রাপ্ত হই নাই; কখনও সম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইব বলিয়া আশাও করা যায় না। বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞাচার্য্যদিগের পরিশ্রম ও অনুসন্ধানে ইহাদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকটিত হইয়াছে তাহা অতীব অল্প; আমাদের বাঙ্গালাভাষায় কিছুই নাই বলিলেও অবধা উক্তি হয় না। আমাদের প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি বন্ধু পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু কিম্বা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাভূষণ মহোদয়-ব্যয়ের মত সুদক্ষ পুরুষকে যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বাহাজুর অথবা কোন প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞালোচনী সভা তথায় প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমরা এ দেশের অনেক পুরাতন বিবরণ অভিজ্ঞাত হইতে পারি। যাহা হউক, বর্তমান প্রস্তাবে, মধ্য-প্রদেশান্তর্গত এই অসংখ্য পুরাতন কীর্তির ভগ্নাবশেষ মধ্যে দন্তেশ্বরীর মনোরম মন্দিরের কিঞ্চিৎ বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। বাঙ্গালা ১৩১৫ সনের গ্রাবুটকালে আমি প্রয়োজনোপলক্ষে মধ্য-প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম; কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগমন কালে ঐ স্থান অচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং এই বিবরণকে অশ্রান্ত বলিয়া পরিচয় দিবার আমার অধিকার আছে, এক্ষণ কথ্য কহিলে পাঠক মহাশয়দিগের বিরক্ত হইবার কোন কারণ দেখি না।

* বাঙ্গালা ভূগোলে “মহানদী”বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইংরাজী ভৌগোলিকেরা ইহাকে মহানদী বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে ইহা মহানদী বলিয়াই বর্ণিত আছে।

† অমরকণ্টক-পর্বতমালা নর্মদা নদীর উৎপত্তিস্থান।

মধ্য প্রদেশে (Central Province) বস্তার নামে একটা করদ হিন্দু রাজ্য আছে, ইহার রাজধানীর নাম বস্তারপুর, কেহ কেহ এই নগরকে বস্তরন বলিয়াও অভিহিত করেন। এই নগরে দন্তেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। এতদেশের সমুদয় হিন্দু জাতির ইহাই সর্বপ্রধান আরাধ্যা দেবী। শাখিনী ও ডাকিনী নামী দুইটি ক্ষুদ্রা নদীর মধ্যস্থিত ভূভাগে দেবীর মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। শাখিনী ও ডাকিনীর অপর নাম শঙ্খি ও ডঙ্কি। রাজা আনামজী সিংহ বাহাদুরের অহুজায়, প্রায় মণ্ডশত বৎসর পূর্বে, এই মন্দির প্রভূত পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল; তখন এদেশে মুসলমানদের অগ্ন্যাহ ও প্রভুত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কালপ্রভাবে আনামজীর সমসাময়িক আদিম মন্দিরের অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, কারণ পরবর্তী রাজগণ ঐ মন্দিরের অনেক স্থানে নূতন নূতন জিনিষ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। স্তূতরাং পথিকদিগের নিকট ইহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত-কারেই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। মন্দিরের চারিপার্শ্বে দেবালয় সম্পর্কীয় বিবিধ অট্টালিকা বর্তমান আছে, তাহাদের কোনটি সাধুদের আশ্রম, কোনটি পাঁকাগার, কোনটি ভাণ্ডার, কোনটি বা সাধকের নিৰ্জ্জন “বিহার” বৎ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মন্দির ও অট্টালিকাদির কারুকার্য অতীব মনোহর এবং প্রাচীন ভাস্কর্য্য-বিদ্যার পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক। মন্দির গ্রামাদের সর্বাভ্যন্তরীণ গৃহটি প্রধান পুরোহিতের আবাস; এই পুরোহিতের আদি পুরুষের বংশ প্রায় সাতশত বৎসর হইতে এখানে পুরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। ইহারই আদি-পুরুষ বরঙ্গল নামক স্থান হইতে দন্তেশ্বরী দেবীর মূর্তিকে বস্তার রাজ্যে লইয়া আসিয়া ছিলেন; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই প্রসিদ্ধা দেবী সহস্র বর্ষাধিক প্রাচীনা, কারণ বরঙ্গলে প্রায় তিনশত বর্ষ অবস্থানের পরে বস্তারে ঐ মূর্তি আনীতা হইয়াছিল। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে উড়িয়া অক্ষরে কিস্ত গণ্ডোয়াভাষায় যে শ্লোক খোদিত আছে * বহু কষ্টে তাহার অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে। অক্ষরগুলি এখন আর রীতিমত পড়া যায় না, শতকরা অশীতিটা বর্ণ একেবারে এমন মলিন বা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে যে, তাহা পাঠের আদৌ অযোগ্য। যখন এই শ্লোক কিছু কিছু পড়া যাইত, তখন ইহার অহুবাদ করা হইয়াছিল; ইংরাজী ভাষার ঐ অহুবাদ হইতে আমি নিয়ে বাঙ্গালা অর্থ করিয়া দিলাম।†

অহুবাদ।

“যদি মনুষ্য হও, দন্তেশ্বরী দেবীর পূজা কর; যদি পশু বা পক্ষী এই দেবীর পূজা কর; যদি কীট বা পতঙ্গ হও দন্তেশ্বরীর পূজা কর; কারণ এই যে, এই দন্তেশ্বরী দেবী পরমে-

* বস্তারের রাজা জাতিতে উড়িয়া। এতদঞ্চলে মহারাষ্ট্র, হিন্দী ও উড়িয়া এই ভাষায় সম্মিলিতা হইয়া গণ্ডোয়া নামে এক নূতন ভাষা বহুবর্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছে।—লেখক।

† “Indian Spectators” (Bombay). 29th September, 1908. (সম্মিত ইংরাজী প্রবন্ধ দেখুন।—লেখক।

শ্বরের সর্ব পদার্থব্যাপী আত্মার সামান্তর্যমাত্র। এই দেবীর নিন্দা করিও না। * * * *
 নিজে ভাল হও এবং অপরের ভাল করিবার জন্য সচেষ্ট থাক, ইহাই সর্বধর্ম ও সর্বমতের
 মারতন্ত্র। এই মন্দির পরমেশ্বরের আলয়; যে রাজা ইহা নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছেন তিনি
 ঈশ্বরের ভৃত্য এবং তাঁহার রাণী, দাসী। এই মন্দিরে মলিন বস্ত্র বা বিনামা পরিধান করিয়া
 প্রবেশ করিতে নাই; ছড়ি বা ছত্র হাতে আনিও না। দেহ হইতে, সর্ববিধ অলঙ্কার
 অপসৃত করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ কর, কারণ পরমারাধ্য পরমেশ্বর কোনপ্রকার পার্থিব
 সৌন্দর্যের পক্ষপাতী নহেন। বালকের ছায় সরলমনে আইস এবং বালকের ছায় সরল-
 মনে চলিয়া যাও। এই পার্থিব জগত ঘাসের ফুলের ছায়, প্রান্তে: ফুল ফুটে, মধ্যাহ্নের
 রোদ্রে তাহা শুকাইয়া যায়। দন্তেশ্বরী, বিশ্বমাতা বলিয়া আরাধিতা। এই বিশ্বমাতা
 দন্তেশ্বরী দন্তের ঈশ্বরী, যদি ইহার পূজা না কর তাহাহইলে ইনি তোমার দস্তপাটি ভগ্ন
 করিয়া দিবেন।”

মহানদী ও গোদাবরী এই সদী দুইটির মধ্যভাগস্থিত সমুদয় হিন্দুর ইনি প্রধান আরাধ্যা
 দেবী; বিশেষতঃ বস্তারের রাজার ইনি কুলবিগ্রহ। সমস্ত বস্তার রাজ্য, তান্ত্রিকের দলে
 পরিপূর্ণ; তন্ত্রবিদ্যার এখানে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া থাকে এবং প্রায় অধিবাসী, দেবী উপাসক
 ও তান্ত্রিক। তন্ত্রাচারের ইহা অদ্ভুত স্থান। বস্তারের রাজা, তান্ত্রিকদলের নেতা এবং
 দন্তেশ্বরীর “বরপুত্র” বলিয়া গণ্য। এই রাজার আদিপুরুষ উত্তরপশ্চিম দেশ হইতে
 ওয়ারেংগলে এবং ওয়ারেংগল হইতে তেলিঙ্গনা দেশে উপস্থিত হয়েন, তথাহইতে পরিণামে
 বস্তার রাজ্যে উপনীত হইয়া দেবীর শরণাগত হয়েন এবং কালক্রমে উড়িয়া জাতির সহিত
 মিলিয়া সম্পূর্ণরূপে “উড়িয়া” হইয়া গিয়াছেন। বস্তারের বর্তমান রাজা মহাশয় কহিয়া
 থাকেন,—“আমার এক পূর্বপুরুষ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে দন্তেশ্বরী গ্রাম হইতে কুলপুরো-
 হিতের দ্বারা বস্তারে আনাহয়; তাঁহার সেবা করিতে থাকেন, কিন্তু ঐ দন্তেশ্বরী কোথায়
 তাহা আমি জানি না। এই প্রাচীনা দন্তেশ্বরী পুরীতে তিনটি স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ বহু
 শতবৎসর কাল ব্যাপিয়া পরমস্বখে রাজত্ব করিয়াছিলেন, মুসলমানেরা সেখানে কখনও
 প্রবেশ করে নাই এবং রাজাদের সহিত মুসলমানদের কোন সম্পর্কই ছিল না। ইহারা
 সম্পূর্ণ প্রকারে স্বাধীন ছিলেন। ইহাদের স্মরণ সময়ে দন্তেশ্বরী-পুরীতে মূর্ত্ত বা ভিক্ষুক
 মনুষ্য ছিল না এবং শত শত শিল্পী ও বণিক তথায় বাস করিত। পুরুষ পরম্পরায় শুনিয়া
 আসিতেছি, সেই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রাচীনা পুরীতে দশহস্ত ব্রাহ্মণবিদ্যার্থী বেদাধ্যয়ন করিত।
 রাজাদের মন্ত্রীগণ বংশপরম্পরায় কায়স্থ জাতীয় ছিলেন, কায়স্থ ভিন্ন অপর জাতি কখন মন্ত্রী
 হয়েন নাই; এখনও মধ্য-প্রদেশের অনেক প্রাচীন বংশীয় হিন্দু রাজার স্মৃতিবান কায়স্থ মন্ত্রী
 রহিয়াছেন, যথা—পাটনাগড়, শোনপুর, কালাহাণ্ডী, বোধ, গাঁগপুর রঘুনাথপুর, ইত্যাদি।
 ছুংখেরবিষয়, প্রাচীনা দন্তেশ্বরী পুরীর ভৌগোলিক ব্যবস্থান সম্বন্ধে কোন স্মরণীয় পাই নাই।
 ইত্যাদি। ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত রাজা মহাশয়ের শ্রীমুখে এই প্রয়োজনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া

দন্তেশ্বরী পুরী সম্বন্ধে আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু ভারতবর্ষের যে যে স্থানে দন্তেশ্বরী নাম প্রাপ্ত হইয়াছি, সে সে স্থানের লোকেরা দন্তেশ্বরী দেবী কিম্বা দন্তেশ্বরী পুরীর প্রাচীন বিভব সম্বন্ধে কোন সমাচারই দিতে পারে না। বাস্তব, দন্তেশ্বরী কোথায় যদিও আমি নিশ্চিতরূপে নির্ণয় পরিতে সমর্থ হই নাই, কিন্তু এই অনুসন্ধান বুঝা হয় নাই। অত্যাশ্চর্য্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। মাদ্রাজপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গোদাবরী তটে দন্তেশ্বরী গ্রাম আছে, সেখানে একদা সংস্কৃত ভাষার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক বা পঞ্চবতীর নিকটে যে দন্তেশ্বরী গ্রাম আছে সেখানে এক সময়ে শত শত হিন্দু দস্তচিকিৎসক (Dentists) বিরাজ করিত, এই জন্ত ইহার নাম এখনও দন্তেশ্বর বা দন্তেশ্বরী বলিয়া পরিচিত। বর্তমানকালেও এখানে বহুল দস্তরোগের বৈদ্য বিদ্যমান আছেন। আমেরনগর হইতে ত্রিশ ক্রোশ অন্তরে ভূবনবিখ্যাত ইল্লোরা গুহা (Ellora caves) মধ্যে আমি অনেক বৎসর পূর্বে এক স্তূপহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিয়াছিলাম, আমার সহচর “পাণ্ডা” বলিয়াছিলেন, “ইহা দন্তেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত”। পাণি বা প্রাকৃত ভাষায় ঐ পাথরের উপরে বাহা খোদিত আছে, তাহার অবিকল বাঙ্গালায়বাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১)

অনুবাদ।

“দাঁত বিনা ভোজন হয় না। আর ভক্তি বিনা ভগবানের সাধন হয় না। মানুষের গড়ে কুড়িটি দাঁত থাকে, ধর্ম্মেরও কুড়িটি দাঁত, তাহা এই;—শুদ্ধতা, সত্যতা, ত্যাক্স, পরোপকার, স্বার্থত্যাগ, ধীরতা, সংযম, ঈশ্বরভীরুতা, জ্ঞান, বিবেক, সংসংসর্গ, শাস্ত্রালোচনা, সাধুসঙ্গ, পরিচ্ছন্নতা, ইঞ্জিয়ের উপরে অধিকার, সাহস, নিরপেক্ষতা, ধ্যান, স্বপ্নে সন্তোষ এবং বৈরাগ্য। এই দন্তেশ্বর বিকট বিঘাত দন্তযুক্ত। কেবল সিংহ ও বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে ইনি সমর্থ তাহা নহে, পরন্তু অপরাধ ও অধর্ম্মের সুদীর্ঘ দস্তপাতির ভীষণ দংশন হইতেও ইনি রক্ষা করিয়া থাকেন।”

হিন্দুগণ দন্তেশ্বরী মন্দিরে এত ছাগ বলি দেয় যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মন্দিরপার্শ্বে অট্টালিকা ব্যতীত প্রায় সাটখানি পর্ণকুটীর আছে, এই কুটারগুলি অনেক সময়ে ছাগ ও ছাগশিশুর সমাবেশে পরিপূর্ণ থাকে। রাজা ও দেওয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই দন্তেশ্বরীর উপাসক। রাজারা দন্তেশ্বরীর অনুমতি বিনা কোন বিশেষ কার্য বা ক্রিয়া সম্পন্ন করেন না। অনুমতি লইবার নিয়ম এই—দেবীর মাথায় দুইটি ফুল রাখিয়া দেওয়া হয়, যদি দক্ষিণদিকে ফুল পড়ে তাহা হইলেই মঙ্গল, বামদিকে পড়িলে অমঙ্গল জানিতে হয়। যে গ্রামে দন্তেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত তাহার নাম জগদলপুর। মন্দিরের পার্শ্বে ৫ হাত উচ্চ একটা কাষ্ঠস্তম্ভ আছে, দেশে অনায়াসে হইলে এখানকার লোকেরা ঐ স্তম্ভে হরিজ্ঞা, তৈল, সিন্দূর ও চন্দন মাখাইয়া পূজা করে।

(1) Vide “Indian Spectator” (Bombay) 26th september, 1908.

জন্মসাধারণের বিশ্বাস, এইরূপ করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রদেবকে জলের জন্ত অমরোদধি করেন এবং তদনন্তর স্রষ্টি হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে কবিকঙ্কণের প্রথম শত্ৰু, উদ্ধানের প্রথম কুল, গাছের প্রথম ফল এবং নূতন পুকুরের প্রথম ধরা নাছ দেবীকে না দিয়া কেহ ভোগ করে না। মড়ক হইলে দেবীর পূজার ধুমধাম লাগিয়া যায়, রাজার প্রথম পুত্র (সুবরাজ) জন্মগ্রহণ করিলে দেবীকে পাক্কীর ভিতর বসাইয়া জেলখানার সম্মুখে আনা হয় এবং যে কোন প্রকারের কয়েদী থাকুক না কেন, কারাগারের সমস্ত কয়েদীকে একেবারে মুক্ত করিয়া জেলখানাকে “খালি” করিয়া দেওয়া হয়। * কিন্তু এদেশে একটা ভয়ানক কুপ্রথা আছে, অতি পূর্বকাল হইতে এই কুপ্রথা এদেশে চলিয়া আসিতেছে। এখানকার গল্প নামক জাতি ভয়ানক “যাদুকর” (Enchanter) বলিয়া বিখ্যাত। লোকের বিশ্বাস এই, এই জাতির যাদুকরেরা মানুষকে ভেড়া করিতে এবং ভেড়াকে মানুষ করিয়া দিতে পারে। ইহারা যে কোন ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে সমর্থ, কিন্তু যাদুকর বা ডাইন ধরা পড়িলে তাহার বে দণ্ড হয় তাহা আরও ভয়ানক। কোন যাদুকর ধৃত হইলে তাহার মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত ধীবরের মাছধরা “জাল” (net) দ্বারা আবৃত করা হয়। তদনন্তর অশ্বখ গাছের পাতা আনাইয়া আসামীর দেহের দিকে দূর হইতে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে, যদি দেহের উর্দ্ধভাগে পাতা পড়ে তাহা হইলে আসামী দোষী বলিয়া এবং নিম্নভাগে পতিত হইলে নির্দোষ বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি দোষী বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে তাহার শরীরকে “চট্ট” বা “গুগ” দ্বারা আবৃত করিয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়; যদি ঐ ব্যক্তি জলে ডুবিয়া উপরে উঠিতে পারে তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিরপরাধী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া যায়। উঠিতে না পারিলে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে। তখন সেই অপরাধীকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া তাহার মাথা “ত্যাড়া” করা হয়, দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, গালে চুনকালি মাখাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাকে উত্তমমধ্যমরূপে প্রহারিত করিয়া গ্রাম হইতে নির্বাসিত করা হইয়া থাকে। জীলোক যদি ডাইন বলিয়া ধরা পড়ে, তাহা হইলে তাহাকেও ঐ রূপ শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাহার মাথার কেশগুলি কোন প্রকাশ্য স্থানে ঝোলাইয়া রাখিয়া ঢাক বাজান হয়। এতদঞ্চলে যাদুকর ও ডাইনের মন্ত্রের নমুনা এই—

“প্রিয় ঘেণ্ডু ও মেণ্ডু! তোমরা আসিয়া অমকের অমুক প্রকারে + সর্বনাশ সাধন কর। হে ঘেণ্ডু + ও মেণ্ডু! তোমরা আমার অভ্যস্ত অল্পগত ও স্নেহের পাত্র, আমার

* এই প্রথা এখনও অনেক হিন্দুরাজ্যে প্রচলিত আছে। রাজার “সালগিরা” হইলে অর্থাৎ জন্মদিনোপলক্ষে অনেক কয়েদী খালাস হইয়া থাকে। রাজা স্বয়ং কারাগার দর্শনে আসিলে অনেক বন্দীর মুক্তি হয়।—লেখক।

+ এই স্থানে পুরুষ বা জীলোকের নামোচ্চারণ করিতে হইবে।

+ ঘেণ্ডু ও মেণ্ডু দুইটা ভুতব নাম।—লেখক।

আদেশ শীঘ্র গাণন কর। পুঃ পুঃ পুঃ ॥ * কি অঙ্কুত কুসংস্কার ॥ প্রতিহিংসাপরায়ণতার ও অনিষ্টকারিণী প্রবৃত্তির কি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত !!!

দন্তেশ্বরীর মন্দির আগতনে স্রবহৎ নহে, কিন্তু ইহার প্রাচীনত্ব ও অখ্যাতি বড়ই প্রয়োজনীয় বিষয়। দেবীর মূর্তি দেখিতে সুন্দরী এবং বিবিধ মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত। মন্দিরের গঠন ও চিত্রাদি প্রাচীন হিন্দু-ভাস্কর্য্য-চাতুরীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন ॥ ছুইটি নদীর মধ্যস্থিত স্রম্য ভূভাগে (অর্থাৎ বরীপে) এই প্রাচীন, পবিত্র ও মনোহর মন্দিরটি, হিন্দুর ধর্ম্মপিপাসা, ভগবদ্ভক্তি ও সাধন কামনার সুন্দর পরিচায়ক। মন্দিরের ইষ্টকসমূহ এত ছোট যে এক এক খানি ইষ্টকে যেন ময়রার দোকানের “বরকি” বলিয়া ভ্রম হয়। অথচ ইহা সপ্তশত বর্ষকাল ব্যাপিয়া, প্রবল প্রাবৃত্তের অত্যাচার, নিদাঘের নিষ্ঠুরতা, বায়ুর প্রবলতা প্রভৃতিকে তুচ্ছ করিয়া, অটুট ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরের অর্দ্ধাংশ ইষ্টকের দ্বারা এবং বাকি অর্দ্ধাংশ প্রস্তরের দ্বারা নির্মিত। দিবা ও রজনীতে উপাসক, দর্শক, অতিথি, অভ্যাগত ও সাধকগণের মুখনিঃসৃত “মা দন্তেশ্বরী” “মা দন্তেশ্বরী” চীৎকারে সমস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে, সে দৃশ্য বড়ই মনোরম, সে ভক্তি-মাধা ধ্বনি বড়ই শ্রুতিমধুর।

শ্রীধর্মানন্দ মহাতারতী ।

যশোহরের গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ

অ

শব্দ	অর্থ
অলুকুণে	অশুভ, অমঙ্গল।
অতুরে	গীড়িত।
অলপ্প্যারে	জীর্ণের নিত্য ব্যবহার্য্য তিরস্কার।
অকাট	পূর্ণ, যেমন তুমি অকাট মিথ্যাক।
অঘরে	হীনকুল, অবরে কছাদান।
অকুরন্ত	যাহা নিঃশেষ হয় নাই।
অবুর	বুদ্ধিহীন।
অপিণ্ডে, অশ্রাদ্দে	স্থণিত গাঙ্গাগালি।

* এই স্থানে, কি প্রকার অনিষ্ট করা হইবে, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক।

আ

শব্দ	অর্থ
আঁচ	আবদ্ধ, শাকের আঁচ, খড়ের আঁচ।
আঁতর	কষিত ভূমির মধ্যবর্তী স্থান
আওড়ান	পাটকরা, পরা।
আবাল	অগুহীন পুংগোরু।
আদাড়	আন্তাকুড়।
আগড়	বেড়া।
আচরা	ভূমি পরিষ্কার করা যন্ত্রবিশেষ।
আললা	অঞ্জলি।
আকাড়া	প্রকাণ্ড, অপরিষ্কৃত, যথা—আকাড়া বগু, আকাড়া চাউল।
আছাড়	পড়িয়া যাওয়া।
আতাড়	তাড়াইয়া দেওয়া, যেমন—আতাড় দিবেনা।
আতুড়া	অস্থির।
আক্রা	হুমুয়া, বেশী দাম।
আদলা	অর্দ্ধ।
আখানো	বিকট, ভয়ানক।
আনুচান্	অস্থির।
আংকিয়া উঠা	চমকিয়া উঠা।
অজ	আসল, মূল, যেমন—গাছের অজ গোড়ায়।
অজীবী	প্রকৃত, সত্য, উচিত।
অকা	মৃত্যু, সে অকা পাইল।
অস্তজ	নীচ জাতি, ক্ষুদ্র।
অদিন	মন্দ সময়।
আলানো	অল্পযুক্ত, ভাতি আলাইয়া গিয়াছে।
আড়	বজ্রাদি রাখিবার লিখিত বংশধণ্ড।
আস্তানা	সন্ন্যাসী ও ফকিরের বাসস্থান।
আলগা	আবদ্ধ নহে।
আলসে	অলস
আঙলে	অগ্রবর্তী।
আংঠা, আকড়া	দ্রব্য আবদ্ধ রাখিবার যন্ত্র বিশেষ।

শব্দ	অর্থ
আতেলা	ভৈলহীন।
আয়ুনে	খালি বিং।
আউমে	খালি বিং।
আসিদে	অফুটন্ত।
আকেল	জ্ঞান, বুদ্ধি।
আই	আয়ু, মাতার মা।
আপজ্যানা	অপরিষ্কার।
আমআদা	আদ্রকবৎ কন্দ বিং।
আঠিকুঠি	আছোপান্ত, তিরস্কার, যেমন—তোর আঠি- কুঠি ধরে দিব।
আষলি	আসক্ত।
আটিকুড়ি	তিরস্কার বিং।
আজব	প্রকৃত।
আস্কারা	বাহির করা, প্রকাশ।
আগড়ম বাগড়ম	বুথা বাক্য।
আন্ধুয়া	কালো—অন্ধকারাবৃত।
আমল	সময়।
আয়াম	উপযুক্ত সময়।
আটাশে	আট মাসের গর্ভস্থ পুত্র।
আমা	অর্দ্ধদধু ইট।
আমাজা	অমার্জিত।
আখড়া	রঙ্গস্থল—বৈঠক। বৈষ্ণবগণের বাসস্থান।
আবদার	আহ্লাদযুক্ত প্রার্থনা।
আগাও	অগ্রিম।
আনাগে	অন্নাত।
আড়েত	গর্ভিনী মাতার ছদ্মসেবী শিশু।
আমটে	আমিশ।
আষল	অন্ন।
আলকুশি	কলের গায়ের শুড়।
আস্তর	পরদা।
আমঠেল	বৃক্ষবিশেষ।

শব্দ	অর্থ
আমশি	শুষ্ক কচি আম।
আঘা	উত্তম, যথা আঘা দেখ।
আকাটা	কর্তৃত্ব নয়।
আছোলা	পরিষ্কার করা নয়, যেমন আছোলা নারিকেল।
আদাম	প্রার্থনা, প্রণাম গ্রহণ। যথা—আমার আদাম নিন্।
আক্কেল	জ্ঞান, বুদ্ধি।
আমঝুন	বহুফলবিশেষ।
আরমাল	ঢেকির ছিদ্রস্থ ক্ষুদ্র গোল কাঠবিশেষ।
আড়চে	শক্ত করে।
আখা	উন্মূ।
আকছা আলেনি	খাল চাউল ঢেকীতে পরিষ্কার সময় আটির বা কাঠের গোলাকার ছিদ্রযুক্ত দ্রব্য।

ই

ইন্দেয়া	ক্ষুদ্র জলাশয়।
ইস	লাঙ্গলের লম্বা কাঠাংশ। উচ্চারণভেদে তুচ্ছার্থে ব্যবহার্য শব্দ।
ইংরেনী	অসম্ভাব্যতা।
ইতুপুজা, ইংরেল	বালিকাগণের ব্রত।
ইতুক	পর্যাপ্ত। তাস খেলিবার সময়ের ক্রিয়া।

ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে দ্রব্যাদির উপর “ই” বড় ব্যবহার। ইটে দেও, ইটে কর, ইটা নাই।

উ

উঠান	আঙ্গিনা, চত্বর।
উড়নচড়ুই, উনপাজুড়ে	গালাগালিবিশেষ।
উনকুটি	আত্মোপাস্ত।
উকড়বাস্ত	নষ্ট হওয়া।
উজান	স্রোতের বিপরীত দিক্।
উদিশ	অনুসন্ধান।
উছোট	আঘাত। যথা—পায়ে উছোট লেগেছে।

শব্দ	অর্থ
উসকান	উদ্বেজিত করা।
উংরে	উত্তীর্ণ।
উচকো	বাড়ন্ত। অস্থির, যথা উচকো মেয়ে।
উত্তে	উৎসাহ।
উথো	মিষ্ট প্রভৃতির অন্ন।
উমোখুমো	এলোমেলো।
উপরি	অতিরিক্ত, অতিথি।
উড়কী, উলকী	জীগপের গায়ে হুচীবিদ্ধ করিয়া চিহ্ন দেওয়া।
উঝঝলি	উজ্জলকারিণী।
উধোইছে	উদয় হইয়াছে।
উড়োপাথ	উড়িবার শক্তি।
উপড়োখাবড়ো	অসমান।
উব্রে যান	অতিরিক্ত হয়।
উবরো	নাড়াচাড়া করা। যথা—উবরো তেল।
উগোয়	উৎপন্ন হয়।
উপস্	উপবাস।
উমোখুমো	বিমর্ষভাবে পরস্পর মুখোমুখী অবস্থান।
উংরে	অতীত, উত্তীর্ণ।
উদঙ	ছরস্ত।
উলে	নাবিয়া আইসে।
উগ্ধো	উচ্চ।
উনয়ে	গলাহিয়া।

ইহা ছাড়া উকার যোগে অনেক নির্দিষ্ট বাক্য প্রয়োগ হয়। যথা—উও দেও।
উও আন। ইত্যাদি।

এ

একবার	স্বীকার।
একসা	একত্র। যথা মেয়ে একসা করেছে।
একানে	একাকী।
এলেক	অক্ষরের মাত্রা।
একষেয়ে	গুণারিত সংখ্যা। যথা—১০টায় এক ষা হয়।

ও

শব্দ	অর্থ
ওলান	অবতরণ।
ওলা	খেজুর রসের শেবাংশ। যথা—ওলাঙ্গ।
ওলাবিবি	কলেরা ব্যাধি।
ওয়াড়	বিছানার আবরণ।
ওড়ামোড়া	আপত্তি, অনিচ্ছা।
ওড়ষা	কুচরিত্র।
ওয়াঙ্কা	নির্ভর, সম্মান।
ওয়ালে	অসারভাগ।
ওদানে	নাসিক, নাপক। যথা—ভাত ওদামে গিয়াছে।
ওলান	গাভীর স্তন।

ক

কুরো	কোয়াশা। কূপ। কর্ণমল।
কুরে	শত্ৰিত। পচা।
কুকড়ে, কুকচে	একত্র।
কুপেচ	ক্রুর। কদর্যা।
কাচলা	তৃণ বিং।
কুলো	পাখী বিং।
কতুর	পায়রা।
কস্তুর	অপরোধ।
ক্যাপা	কাঁথা।
ক্যাদা	কর্দম।
ক্যানো	কীট বিং।
ক্যাছো	মহিলতা।
কাছিম	কচ্ছপ।
কুটো	খড়। গল বিছানি।
কাচি	কাস্তে। ধোতকরা।
কাচা	বংশনির্মিত ঘরের বেড়ার দ্রব্য।
কাছি	মোটাদড়ি।
কাছা	কাছা নিকটস্থ। পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের শেষ।

শব্দ	অর্থ
কাজল	অঞ্জলি।
কাও	কাক।
কুঁড়ে	অলস।
কাকো	সন্ধিহল।
কোদা	খোকা।
কুদি	খুকি।
কুচি	টুকরা।
কুলো	চাউল ছাটা যন্ত্র।
কুশি	ভরকারী বিং। কোশার কুশি।
কুড়ে	কুটির।
কনে	কোথায়।
কটা	ধূসরবর্ণ।
কোরণ	নারিকেল খুড়িবার যন্ত্র।
কাটারি	দাড়াকার ক্ষুদ্র অস্ত্র।
কচ	জিওলবৃক্ষের ডাল।
কড়মা	চিনির মুড়কী
কাতারি	সারি।
কবে	কষায়ে। নির্ঘ্যাসে। দৃঢ়ভাবে বাঞ্চে।
কলো	কহিল।
কলমী	দাম, শাক বা লতা বিং, কলমী।
কুচকুরে	ক্রুরমতি।
কাঠো	কচ্ছপ। কাঠেরবাটী।
কুজ্‌ড়ো	কুচক্রী।
কসম	প্রতিজ্ঞা। যথা খোদার কসম।
কাছোড়	কাকুড় ফুটী।
কাবির	কোতুক।
ক্যাথায়	কিন্নাপে।
ক্যাথ্যালায়	কি প্রকারে।
কুটরো	টুকড়া, খণ্ড।
কসলাম	কহিলাম।
কনি, কনা	হুট। হুশীলা।

শব্দ	অর্থ
কসবী	দ্রুশ্চারিণী।
কৈলেতা	কলিকাতা।
কৈলেডা	কলিকাটি।
কন্তে	কোথাহতে।
কবিনা	কহিবনা।
কশি	রেখা। ধারা।
কা'জে	বিবাদ। লগুড়যুদ্ধ।
কাঙ্ক্ষা	কার্যের।
কা'জে যাওয়া	নষ্ট হইয়া যাওয়া। ডিমগুলি কা'জে গিয়াছে।
কাশে	ফণ বিং।
ক'ব্লে	জী। যথা, হারাগউল্যার ক'ব্লে বা কবিল।
কতি	কহিতে।
কালো	কাল।
কাপঠে	কুশ, দুর্বল। কপণ।
কুৎকুতে	ছোট ছোট চক্ষে। যেমন কুৎকুতে চো'খে চায়।
কোথ, কুণে, কুধি	বেগ। শক্তিদেওয়া।
কছু	লাউ।
কচড়া	পাটের মোটা দড়ি।
কাজলা	খড়ুয়া ঘরের কয়াদ্বয়ের মধ্যস্থলের বান্ধন।
কমা	ককশ। কক্ষ। অল্প হওয়া।
কবা	কহিবে।
কচুড়ি	কচু বিং। খাত্ত বিং।
কাহার	বেহারা। কোন ব্যক্তির।
কিষণ	কৃষাণ।
কেডা	কে।
কাহিল, কাবু	দুর্বল।
কেছা	গল্প।
কেলা	সমূহ। দুর্গ।
কয়েছেলাম	কহিয়াছিলাম।
কিস্তি	নৌকা।
কাতলা	হাড়িকাট, পাঠা বলি দিবার যন্ত্র। মৎস্ত বিং।

শব্দ	অর্থ
কাঁওল	কামলা ব্যাধি।
কেড়কী	ইক্ষুভাঙ্গিবার যন্ত্র।
কান্দা, কান্দা	কান্দা, ক্রন্দন করা, মেটেঘড়ার কান্দা বা ধারি।
কলকিমাছ	তপস্বীমাছবত্ মৎস্ত।
কাপাল	নদীরভাঙ্গন।
কাকঠা	কর্কশ। যথা—কাকঠা কোঠা।
কুড়ো	চাউলের ময়লা। দ্রব্যাদির অগ্রভাগ। যথা— ছাতির কুড়ো, কাঁড়ের কুড়ো। তুষকুড়ো গাভীকে দেও।
কুমো	বড় বড় তেলের আধার যথা—তেলের কুমো দাও।
কুশো, কোশলা	বিকৃত পদ ব্যক্তি।
কেকা কেকি, কেতা কেক্তি	চিংকার করা। জড়াজড়ি করা।
ক্যাচক্যাচি	বিবাদ করা। যথা—ক্যাচক্যাচি করিওনা।
কপুকপি	কুল কুল করা। শব্দকরা।
কান্তিকান্তি	কান্দিতে কান্দিতে।
কাণাকাপি	পরামর্শ করা।
কোণা	শেষ অংশ, ধার। যথা কাপড়ের কোণা।
কাস্তা	খুটির মাথার কোটির বিং যথা—কাস্তার মধ্যে পাইড় দেও।
কদর	গরিমাপ। যথা—কদর বুঝে চল।
কোতকা	ভয়প্রদর্শন। লাঠি।
খেচোড়	খ
খাজল	অশ্লীল বাক্যপ্রিয়।
খয়েরা	মৎস্ত ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।
খালুই	পাখীবিশেষ। নৃত্যবিশেষ। মৎস্ত বিং
খাসা	মাছ ধুইবার পাত্র।
খামি	উত্তম।
খচখচে	অলঙ্কারের মধ্যমণি। মিঠাইপ্রস্তুতের দ্রব্য।
খিটখিটে	বিরক্তশীল।
	রক্ষস্বভাব।

শব্দ	অর্থ
খবিস	অপরিষ্কৃত ।
খ'ড়কে	তৃণ, ঘাসের অগ্র ।
খোরা, খাদা	পাথরের বড় বাটি ।
খাঁদা	নাসিকাহীন ।
খাম খুটি	গৃহ বান্ধিবার বড় কাষ্ঠ ।
খামাকা	সহসা ।
খামচা	কতকটা ।
খমক	বাত্তযন্ত্র ।
খাজা	মিঠাইবিশেষ ।
খাষা	খাম, শুভ ।
খাল্লা	মাথার হাড় বা খুলি ।
খুরি	মেটে ক্ষুদ্র বাটি ।
ক্ষিরেই	শশাবিশেষ ।
খানা	গর্ত । ডাব নারিকেলের খোসার অভ্যন্তরস্থ কোমলাংশ ।
খাস্তা	অবশিষ্ট, দোষিত শেষ পদার্থ । উৎকৃষ্ট, পরিষ্কার । যেমন খাস্তা লুচি ।
খোসা, খোলা	ফলের অথবা বৃক্ষের গাত্রাবরণ । যথা—আমের খোসা, কলার খোলা ইত্যাদি ।
খলবল, খিচ্খিচ, খিলখিল	হাস্তধ্বনিবিশেষ, কর্কশ, গতিশীল । যথা—খিলখিল হাসি । খিচ্খিচে বালি । মাছ খলবল করিতেছে ।
খেদামে	তাড়িয়ে ।
খেদামে দে	তাড়িয়ে দে ।
খাদা	জমির মাপের পরিমাণ, ষোল বিঘা কিম্বা ষোল পাখী জমি । অল্প রাখিবার পাত্র বিং ।
খেলকা	অঙ্গাবরণ ।
খলসে	ক্ষুদ্র মৎস্তবিশেষ । যথা—বর্ষার খলসে ভাল ।
খুটে	কুড়িয়ে । যথা—খুটে তোল ।
খুদ	চাউলের ক্ষুদ্রাংশ ।
খুনে	হত্যাকারী ।

শব্দ	অর্থ
খুব	অতিরিক্ত।
খড়ি	শুষ্ক কাষ্ঠ। চক। গণিবার নিদর্শন। যথা— রাক্ষার খড়ি নাই। খড়ি গুলে রং কর। খড়ি পেতে গুলে দেখ।
খতি, কুতি	টাকাপয়সা রাখিবার দ্রব্য। যথা—খতিতে চারি টাকা ছিল।
খোস্তা	মাটি খুড়িবার যন্ত্র, খস্তা।
খৈল	তিসি ইত্যাদির অনারাম্ভ।
খ্যাড়, খড়	তৃণ, বিচালি। যথা—ঘর বান্ধিবার খ্যাড় চাই। গোবর খাবার খ্যাড় নাই।
খে'ড়ো	খেলওয়ার, খেলার সঙ্গী বা পক্ষ।
খেতা	কাছা। যথা—শীত লাগিয়াছে, খেতা খানা দেও।
খাটাস	জন্তুবিশেষ।
খা'লো	ভাল নহে। যথা—খা'লো জিনিষ। খাইল, ভক্ষণ করিল।
খ'লো	ছুট।
খ'লেন	শস্ত্র মাড়াই করিবার স্থান। যথা—খুলেনে ধান আনা হইয়াছে।
খাকারি	দ্রব্যের অপরিষ্কারাম্ভ। যথা—নারিকেলের খাকারি খাইতেছে।
খুতখুতে	বিরক্তশীল। সন্দ্বিগ্ধচিত্ত।
খামারে	মন্দ, অপরিষ্কার। যথা, খামারে কার্য্য কর কেন।
খামার	নিজ আয়ত্তাধীন, খাস। যথা—চারি বিঘা জমী আমার খামার।
খানাখুন্দি	গর্ত। জলে খানাখুন্দি ভরে গেছে।
খাট	পালঙ্গ, খট্টাঙ্গ।
খাটা	অন্ন।
খপাং	সহসা। যথা, খপাং করে দিল বা বসিল ইত্যাদি

ইহা ছাড়া “খ” ও “ক্ষ” যুক্ত অনেক দেশজ শব্দ আছে। উহা আরব্য ও পারস্য ভাষা
হইতে গৃহীত।

শব্দ	গ	অর্থ
গতোর	শরীর।	
গাং	গঙ্গা, নদী।	
গুণ্ডল	গোশালা।	
গুধজ	গোলাকৃতি চূড়া বা শীর্ষ।	
গুড়োদারঘাট	ফেরীঘাট, পারের ঘাট।	
গুধি	বিচি, গোলাকার।	
গোষা	ক্রোধ। গোষা করিও না।	
গুরোল	ক্ষুদ্র মাটির গোলাকার পদার্থ। যথা—এক গুরোলে দুই পাখী।	
গুমো	অর্দ্ধপচা। গরম হইতে নষ্ট হওয়া। যথা—ধান গুমে গেছে, গুমো খড়ে ঘর বাক্ষা হয় না।	
গোলা	ধান ও চাউল রাখিবার আধার। বন্দুকের গোলা। প্রমাণ—ধানের গোলা লুটে নিম্নেছে।	
গাফিল	তাচ্ছল্য, অবহেলা।	
গাফিল	শরীর। যথা—গা গরম হইয়াছে।	
গাছা	প্রদীপ রাখিবার অধার। দেব উদ্দেশে ভাবাবেশ। সংখ্যাবাচক বাক্য। যথা—প্রদীপের গাছাখানা দেও। তাহার কানির হইয়াছে, বেতগাছা আন ইত্যাদি।	
গালা	তরল। পত্র আটিবার বস্তু। যথা—সোণা গালাও, গালা দিয়ে পত্র এঁটে দাও।	
গোলাই	অধঃপাতে।	
গুণ্ডি	বংশ।	
গোছা	থোপা। গুছিয়ে নেওয়া। বন্দোবস্ত করা। যথা—গোছা ধরে আন। পত্রগুলি গোছাও।	
গোদারঘাট	অধঃপাতে। যথা তুই গোদারঘাটে যা। ইহা জীদিগের তিরস্কারবিশেষ।	
গছে, গংছে	গ্রহণ করে। গ্রহণ করিয়া।	
গফ্কে, গফ্কে	গল্পকারী। গল্পে।	
গাঘো	ভুচ্ছার্থ বাক্য।	

শব্দ	অর্থ
গাছি	খজুর বৃক্ষ হইতে রস বাহিরকারী।
গিলি	গিয়াছিলি। গলাধঃকরণ করিলি।
গোছলা	গুচ্ছ, স্বল্প রাশি। যথা—গোছলা গোছলা ধরে খড়গুলি টান।
গজগজ, গমগম, গনগম	অল্পকর অব্যয়। বাক্যের অর্থ বিশেষ-রূপ বোঝা।
গিরে	বন্ধন। গেরো।
গোবর	গোময়।
গাব	ফলবিশেষ।
গাবগোবর	নৌকার ছিদ্র আবদ্ধ করণের জন্ত গাবের রস ও চাউলের কুড়া দিয়া প্রস্তুত তরল দ্রব্য-বিশেষ। যথা—নৌকার গাবগোবর দেও।
গজ্জে	উত্তেজিত। যেন গজ্জে গজ্জে উঠিতেছে।
গন্নাকাটা	কণ্ঠিত অধর।
গন্না	আবদ্ধ। বৃহৎ। —একগন্না খড়। গন্নাচিংড়ি।
গা'লোও	তিরস্কার কর। গালাগালি দেও।
গুতে	মৎস্তবিশেষ।
গুতো	আঘাত।
গলুই	নৌকার অগ্রভাগ।
গলুয়ে	অগ্রভাগের মাঝি, দাঁড়ি।
গলো ভরে নাই	পেট ভরে নাই।
গাড়া	গর্ভ।
গাড়োল	জন্তুবিশেষ।
গোদানি	উল্কা, স্ত্রীদিগের অঙ্গের স্ত্রীবিদ্ধ কাল দাগ।
গোদাড়ী	যথা—কপাল ভরা গোদানি।
	স্ত্রীলোকের তিরস্কার। যেমন, ছেদাড়ী-গোদাড়ী।
গদে	বালকের খেলবার গর্ত।
গদেন	গদিয়ান। ব্যবসায়ীগণের কারবার স্থানের প্রধান ব্যক্তি। স্থলকায়। যথা—উনি আড়-তের গদেন, ও যেন গদেন বসিয়া আছে।

শব্দ	অর্থ
গজাড়	বড় কাঠ। শক্ত শুষ্ক কাঠ। বড় লৌহ বা পেরেক। যথা—গজাড় মারিয়া আটরা দাও।
গজাল	মৎস্যবিশেষ।
গজগীর	জলের মধ্যস্থ ধনের পাত্র।
গড়ান	প্রস্তুত করা।
গুফো	গুফযুক্ত। যথা—ছোড়া গুফো হইয়াছে।
গাঁড়	স্ফোটক। মলদ্বার।
গাঙ্গের কুলে	নদীর তীরস্থ। জ্বীদিগের তিরস্কারবিশেষ।
গামাল	ফেরি করা। পণ্যদ্রব্য লইয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করা। যথা—গামাল না করিলে চলে কই।
গয়াল	তৃণের ফলবিশেষ। যাত্ন সঙ্গে অবস্থিত থাকে।
গয়ে	পিয়রা।
গবরাট	চোকাট। বংশনির্মিত চোকাবেড়া রক্ষার দ্রব্য। যথা—বেড়ার নীচের গবরাট দাও।
গাফিল	তাচ্ছিল্য।
গাভ	ধৃতগর্ভ। যথা—গরু গাভ হয়েছে।
গেয়েলাম	গিয়াছিলাম।
গোল	পাত্রবিশেষ। বিবাদ। বিতণ্ডা।
গউরি	বিলম্ব করা।
গোছান	সংবদ্ধ।
গুণগারি	জরিমানা প্রভৃতি দণ্ড। যেমন গরুটা ধোয়াড়ে দিয়া আমার গুণগারি লাগাইয়াছে।
গুজুরী	অলঙ্কারবিশেষ। উপার্জন।
গুমর	অহঙ্কার।
গোম	গোপন। যথা—মানুষ গোম ক'রেছে। ফলবিং
গাঁতি	মোরসি জমা। যথা—গাঁতিদার।
গেলা	অধঃকরণ।
গঁদ	শেষ। আঠা। যথা—পেটে গঁদ আছে।
গরদান	গ্রীবা, ঘাড়।
গিধোড়	অপরিস্কৃত, শেয়াল।
গোফাল	গবাষাদির, পুচ্ছসন্নিবিষ্ট চুল।

শব্দ

অর্থ

গোগু

মরা নদীর মধ্যস্থ জল।

গোঙ্গান

গৌ গৌ শব্দ করা।

ঘ

ঘড়েল

ঘড়িযুক্ত ব্যক্তি। জন্তুবিশেষ, গোধিকা।

ঘরামি

গৃহপ্রস্তুতকারী।

ঘড়ঘড়

তদম্বরূপ শব্দ বিশেষ।

ঘেরা

বেষ্টন করা।

ঘাম

ঘর্ষ।

ঘেরা

ঘৃণা।

ঘেদঘেদে

অতিরিক্ত বাক্যশীল। যথা—বড় খেদ-
খেদে লোক।

ঘোলা

আবর্তন বা মছন। আবর্ত, পাক। ময়লা,
কলুষিত। যথা—হুদ্ ঘোলায়ে নেও। ঘোলার
মধ্যে নোকা দিও না। ঘোলা জল খাইও না।
ঘুটে, শুক গোময়।

ঘশি

গালাগালি দেওয়া বা মারার। যথা, ঘাপাও কেন?
দাগ করা। যথা—ঘাই কাটিয়া লও।

ঘাপানি

ঘাইকাটা

চন্দ্ররোগবিশেষ।

ঘামাচি

ঘুলঘুলে

মুহু মুহু।

ঘষা

ঘর্ষণ।

ঘলঘলে, ঘমঘমে

আলগা, অসংবদ্ধ।

ঘড়া

কলসি।

ঘটা

জাক জমক। ঘটনা হওয়া। যেমন, বিবাহে
বড় ঘটা করিয়াছে। সেটা ঘটাই হুফর।

ঘা'ড়ে।

একপুয়ে। মৎসবিশেষ।

ঘাতোমি

আলস্ত করা।

ঘুরো

বাঁকা। যথা—ঘুরোপথ।

ঘুনি

মৎস্ত ধরবার যন্ত্রবিশেষ। জমির বক্র আইল
বা সীমা। যেমন জমিধানিতে ঘুনি আছে।

ঘুগুরো

পোকাবিশেষ।

ঘাইদিছি

বেশী লাভ করিয়াছি। মারিয়াছি, ঘা দিয়াছি।

শব্দ	অর্থ
আই	আঘাত, দাগ।
ঘুনসি	কোমরের স্তম্ভ। যথা—মাজার ঘুনসী।
আ'য়েল [ন]	বৃহৎ। যথা—বায়েল মাছ পাইয়াছি।
ঘাল্	ক্ষত, দাগ করা, ঐ পক্ষে দুইটে ঘাল হইয়াছে।
ঘুন্নি	ঘাল কাটিয়া লও।
ঘোনা	ঘুড়ি। যথা—ঘুড়ি উড়িয়ে দাও।
	ঘুনি বা জমির বক্র অংশ। মশারি। যথা—
	বড় মশা ঘোনা টানাও।
ঝান্	তৈলপ্রস্তুত যন্ত্র।
ঝাখাওয়া	আঘাত পাওয়া।
ঝাসেড়া	ঘাসবিক্রেতা।
ঘেচু	কচুজাতীয় কন্দবিশেষ।
ঘাটকোল	ঘেচুফুল।
ঝালোর	তৈলাধার।
ঝাঘোর	যুগ্মুর।
ঝাঙ্গ'রাণ	পাখিবিশেষ।
ঘুন্	উৎকোচ।
ঘুসো	ঘুসি।
এতদ্ব্যতীত “ঘ” ষোণে অনেক বাক্যের অন্তর্করণ অব্যয়শব্দে প্রকাশ হয়।	
ঝাতিমেয়ে	নিরবে।
ঘুসড়ে	ব্যর্থ, বুথা। যথা—ঘুসড়ে গিয়াছে।
ঘেটেদাও	নাড়িয়া দাও। যথা—তরকারী ঘেটে দাও।
ঘোণা	বোবা, অস্পষ্টভাবী।
ঘেউ ঘেউ	শব্দবিশেষ।
ঘিচড়েমো	ক্রুরতা।
ঘিচড়ে	ছুট, কলহপ্রিয়।
ঘসড়ে	সরিয়া আইস।
ঘিলু	মস্তিষ্ক।
ঘাবরে যাওয়া	ভীত হওয়া।
ঝাটাল	পাটনি।
• ঝাটলা	বান্ধা ঘাট।

শব্দ	অর্থ
ষাড়	গ্রীবা।
ঘ'রো	বাড়ীতে থাকা লোক।
ঘরকান্না	গৃহস্থালী।
ঘোনাইয়া	নিকটবর্তী হইয়া।
ঘোম	নিদ্রা, ঘুম।
চ	
চান্দড়	গৃহের বাহিরদ্বিগের কোণ। যথা—পূর্বের চান্দড়ে জল পড়ে।
চিপে	গৃহের বাথারি।
চটকান	রগড়াইয়া দেওয়া।
চিমড়ে	শুদ্ধ হইয়া এক হওয়া।
চিমঠে গন্ধ	একরূপ দুর্গন্ধবিশেষ।
চিটে	তামাক মাথিবার শুঁড়। তণ্ডুলাবিরহিত কঁ অজাত তণ্ডুল ধাত্য।
চিৎলেমে	চিৎ করিয়া বা উত্তান ভাবে।
চামড়ে	সঙ্কোচিত।
চালা	উত্তেজিত। গরম হওয়া।
চান্দ	খণ্ড। অংশ।
চুচ্‌ড়োমুখো	স্বপ্ন মুখ।
চুবলো	নিরব হওয়া, জলে তলিয়ে রাখা।
চুলো	উন্নত।
চিচ্‌চিড়ে	উগ্র প্রকৃতি, শরীরের গতিবিশেষ। যথা— লোকটা বড় চিচ্‌চিড়ে, আখার হাত চিচ্‌চিড় করে।
চিক্‌চিক্‌	উজ্জ্বলতা।
চিলবিল	নড়াচড়া।
চর্চা পিপড়ে	কাল পিপিলিকা।
চখো	চক্ষুযুক্ত।
চানকে	নড়িয়া। চালা হইয়া।
চসমখোর	অকৃতজ্ঞ। চক্ষুলজ্জা হীন।
চালি	নৌকার বংশনির্দ্ভিত বসিবার আধার, কাপড়-

শব্দ

অর্থ

চরাট্

চচচড়ি, চাট্

চাপড়া, চাপলা

চোয়াস দেওয়া

চালন

চোপলা

চুমকি

চুস্‌ড়ি

চুমরি

চুনরি

চ্যাচাড়ি

চাঙ্গরি

চাঁওসা, চান্দসা

চান্দি

চাকলি

চটে, চট্

চাছা

চাঙ্গনী

চড়্‌চড়্‌

চপ্‌সে

ইহা ব্যতীত এই অক্ষরে “ছ” উচ্চারণে অনেক স্থানে “চ” বাহির হয়।

ছতুন

• ছাৎকুরা

ছেদলা

পত্র রাখিবার আধার। যথা—পুঁথিগুলি চালির উপর রাখ। চালিতে বিছানা পাতিয়া রাখ।

নৌকার অগ্রবর্তী বসিবার স্থান।

ধাত্তবিশেষ।

খণ্ড, চাপ্‌।

প্রভাত হওয়া, আলো বাহির। যথা—রাত্রি চোয়াস্‌ দিয়াছে।

ঐ ছাকিবার বা ময়দা প্রভৃতি চালিবার যন্ত্র।

ফলের গাত্রাবরণ।

কাংস্যনির্মিত ক্ষুদ্র চাক বা জলখাবার পাত্র।

চুঘন।

মুকুল।

জাতি বিশেষের উপাধি। বঙ্গবিশেষের নাম।

বাথারির গাত্রস্থ অসার অংশ।

ক্ষুদ্র ডালা।

রোগ বা শোকাদিতে অট্টেতত্ত্বের পূর্ব লক্ষণ।

মস্তকের উপরিভাগ। খাটি রূপার নাম।

আশ্বাদ করা।

ছালার চাদর।

পরিস্কার করা।

জ্যোৎস্না, মণ্ডপগৃহের সম্মুখস্থ চতুষ্কোণ স্থান।

যথা—চান্দি রাত্রে কি চুরি হয়, চান্দিতে গান হইবে।

শব্দবিশেষ।

অর্ধ মুছিয়া।

ছ

প্রধান, ক্ষমতাশালী।

ময়লাভেদ।

পিচ্ছলাকৃতি ময়লা।

শব্দ	অর্থ
ছেচা	আঘাত দ্বারা নিষ্পেষণ। যেমন, পান ছেচা, ঐষধের বকাল ছেচা।
ছেমড়া	ছোকরা।
ছেমড়ি	বালিকা।
ছেহড়া	ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গী।
ছেপলা	অন্নবুদ্ধিশালী।
ছালনা	বিবাহ-সভাদিতে ব্যবহার্য চান্দোয়া।
ছমক	বাহার, অহঙ্কার।
ছুচল	ভীক্ষাগ্র। স্তম্ভাগ্র।
ছোন্	খড়, তৃণ।
ছোবা, ছিবড়ে	ফলের গাত্রাবরণ।
ছোরাচে, ছোয়ানে	স্পর্শাক্রোমক।
ছিম	শিম, শিখী।
ছেওচ	নৌকার জল ফেলিবার পাত্র, সেউতি।
ছালামাটা	নাপিত, প্রামাণিক।
ছল, ছওয়াল	পুত্র।
ছালা	থলে।
ছাটন	গৃহের চালের ছোট বাথারি।
ছান্দ	বন্ধন। আকার। যথা, ছান্দ ভালনইলে অক্ষর ভাল হয় না। ঘোড়াটা ছান্দে দেও।
ছেনাল	কুচরিজা।
ছেক্টি	খাত্তবিশেষ।
ছিলুম	হুকা।
ছাপ	পরিষ্কার।
ছাচ্	আদর্শ।
ছাকানা	ছাকিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে; শিক্ত, শিটি।
ছালোট	বড় কাঠের কন্ঠিতাংশ। যথা—ঐ ছালোটখানা দিয়া প্রস্তুত কর।
ছিলকে উঠা	বেগে বাহির হওয়া। যথা—ছিলকে রক্ত পড়িতেছে।

শব্দ
ছিচকে

ছেও
ছেরমো
ছেন্দা
ছিটছিটে
ছেলোমো
ছলওয়াল
ছয়লাগ
ছালনচাকা

ছরকোট

ছারবুটি
ছোলোম
চছেড়ে
ছই
ছকা
ছতোর
ছিলকে
ছিলে

জাওন

জাপ

জামলা
জাবড়া
জড়ানঘড়ান

অর্থ
ছকা। পরিকারের শলাকা। ফোটা ফোটা।
যথা—ছকায় ছিচকে দেও। ছিচকে বুটিতে
বড় উৎপাত করে।
ভাগ, অংশ, খণ্ড, টুকরা।
পরিশ্রম।
ছিদ্র।
ফোট ফোট।
বালমূলত।
জবাব। তর্ক।
বুথা গল্প। বাগাড়ম্বর।
অকৃতজ্ঞ। সুবিধাসম্ভেও যে কখন এক কাজে
ব্রতী থাকিতে পারে না।
মফঃস্বল। নানাহান। নানা গোলযোগ।
যেমন, এ কাজে ভারি ছরকোট লাগিয়াছে।
বুথা গল্প।
লেবুবিশেষ।
ফোটা ফোটা।
নৌকা প্রভৃতির ছাদ।
ডালানা অর্থাৎ খাত্তবিশেষ।
লাইন, লিখনরেখা।
একটুকু।
কাপড়ের শেষাংশ।

জ

নৌকার নিম্নস্থ অংশে জব্যাদি রাখিবার জন্ত
যাহা পাতিয়া রাখে। যথা—জাওনগুলি
ভিজে গিয়াছে।

খড় বিচালি ও খইল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত
গরুর খাত্তসমষ্টি।

চরিত্রহীন। জাত্ম।

অস্পষ্ট।

একত্রিত।

শব্দ	অর্থ
জড়সড়	সঙ্কোচ ।
জাজিম	বিছানার উপরিস্থ আবরণ ।
জাবেদা	অবশিষ্ট ।
জঙ্গ	শাসিত ।
জলমো	জলযুক্ত ।
জাঁহাঁবাজ	কৃতিমান্ ।
জয়কা'থে	খোঁষামুদে । যে দিকের জয় সেই পক্ষ অবলম্বনকারী ।
জালামি	জলন্ত, জালিবার উপযুক্ত দ্রব্য ।
জলেলাজল	নীলজল ।
জলটোবা	জলভরা ।
জ'লো	জলবৎ ।
জয়জোকার	জয়শব্দবিশেষ ।
জবান	বাক্য ।
জাগরকাটা	রোমহন ।
জুজু	বাগকের ভীতিপ্রদ বস্তু ।
জুনিক	জোনাকি ।
জোয়ান	বলশালী ।
জাগা	স্থান ।
জোত	আবদ্ধ করা ।
জুতে নেওয়া	যৎযোগ করা ।
জুড়ে থাকা	আটকাইয়া রাখা ।
জা, যা	খ্রীদিগের ব্যবহার্য শব্দ, স্বামীর ভ্রাতৃ- বধূ; যাতা ।
জোটে	দলে, সম্প্রদায়ে । মেলে, পাওয়া যায় ।
জা'মুরো	শক্ত মাংসপিণ্ড ।
জলেঙ্গা	নীলবর্ণ ।
জালা	মাটির বড় জলপাত্রবিশেষ । যথা—জালা ভরা জল ।
জা'লো	খেজুরের রস জালাইবার পাত্র বিশেষ ।
জেয়া	মাছবিশেষ ।

শব্দ	অর্থ
জিয়েল	মৎস্তবিশেষ।
জিয়াজিত্	বাজি জিনিয়া লওয়া।
জোগাল	নিয়মিত।
জমজম	অনুকরণ অব্যয়, পত্নবাক্যের স্বার্থকতাবোধক। যথা—আসর জমজম করে।

জিযো—জিহ্বা। জাইতি—সুপারি কাঠিগার অন্ত্র।
জালতি—উতুন ধরাইবার অগ্রবর্তী দ্রব্য। যথা—জালতি এনে দাও।
জিয়েনী—মৎস্ত শিকারী বা ব্যবসায়ী। জিয়ন—বাচাইয়া রাখা।
জিয়িস—গোপন করা। জামাই—জামাতা। জুগ্গী—উপযুক্ত।
জোঙ্গাল—লাঙ্গলের অংশবিশেষ। জুজুলে—জঙ্গলবাসী, বনবাসী।
জেঠী—জ্যেষ্ঠী, টিক্‌টিকি। জ্যেষ্ঠ মাতৃ, জেঠাই মা।
জটো—জটযুক্ত। জোটবন্দি—একত্রিত দলবদ্ধ। জটলা—গোলযোগ।
জেলা—উজ্জলতা। জুওয়ন—জোয়ান, যুবক।
জোগানে—দ্রব্যাদির সাহায্যকারী। যোগানদার। জালি—কচি, কোমল।
জাওয়ালি—ধানের চারা। জাগদি—জাগরণ। জাংলা—লতা উঠাইবার উচ্চ মাচা।
জায়—তালিকা, আদর্শ। যথা—জায়জিনিস ও জায় কর।
জিড়েন—বিশ্রাম। জলুনি—জালা। জাপসা—অস্পষ্ট।
জামিন—প্রতিভূ। প্রতিনিধিস্বরূপ, দায়িত্ব স্বীকারকারী।
জাঘু—গুলিখোরের খাদ্যবিশেষ। জুড়ন, জুড়ল—শীতল। শীতল হইল।
জিনে—জয় করে।

ইহা ছাড়া “জ” উচ্চারণে এই প্রদেশে জিহ্বাবিকাশ অতিরিক্ত বলিয়া শুনিতে “দ্ব”
উচ্চারণ হয়। যথা—অজানদি। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য

* ইহাতে ভিন্নদেশীয় যে সকল প্রচলিত শব্দ আছে তাহা বাহিয়া পড়িতে হইবে। বস্তুতঃ পুষ্টিমবন্ধে
নিত্য ব্যবহৃত শব্দ ব্যতীত আর বড় অন্তর্দেশীয় শব্দ নাই। ক্রিয়াপদের শেষে ইকার যোগে যশোহরে গ্রামজ শব্দ
বেশী ব্যবহৃত হয়। যথা—দিত্তি, খাত্তি, নাতি ইত্যাদি।

খনিজবিজ্ঞান পরিভাষা

শ্রদ্ধাঙ্গদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র হুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় Mineralogy শব্দের পরিবর্তে গৈরিক-বিজ্ঞা শব্দ ব্যবহার করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন (১)। আমরা “গৈরিকবিজ্ঞা” এই শব্দের পরিবর্তে “খনিজবিজ্ঞা” শব্দপ্রয়োগের পক্ষপাতী।

খনিজবিজ্ঞাতে যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহাদিগকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাউতে পারে। এক শ্রেণীর শব্দগুলি গুণবাচক অপর শ্রেণীর শব্দগুলি নামবাচক। খনিজবিজ্ঞা এবং জীববিজ্ঞা ও উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখা-প্রাশা-থাকে প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural history) আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে, সেই সমস্ত শাখা প্রাশাখাতে প্রচলিত সহস্র সহস্র নামবাচক শব্দের বাঙ্গলা-ভাষায় অনুবাদ করিবার প্রয়াস বাতুলতা এবং প্রকৃতবিজ্ঞানালোচনার পক্ষে বিঘ্নকর। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের সময় ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে না এরূপ নহে, তবে প্রধান ও মুখ্যদৃষ্টি রাখিতে হইবে বিজ্ঞানালোচনার প্রতি। এবিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পূর্বে বলিয়াছি (২)।

খনিজবিজ্ঞান প্রকাশিত যে সমস্ত গুণবাচক শব্দ আমরা বাঙ্গলাভাষাতে ব্যবহার করিতে পারি তাহার এক তালিকা এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল। প্রধানতঃ E. S. DANA প্রণীত খনিজবিজ্ঞান (৩) বর্ণালুক্রমিক সূচী অনুসারে এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। অপর যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তন্মধ্যে Miers প্রণীত খনিজবিজ্ঞান (৪) উল্লেখ করা যাউতে পারে। এই প্রবন্ধে লিখিত অনেক শব্দের পরিভাষা শ্রদ্ধের ত্রিবেদী মহাশয় অতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৫)। যে সমস্ত শব্দের পার্শ্বে (রা) এই চিহ্ন থাকিবে সে সমস্ত শব্দ শ্রদ্ধের ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবিত বলিষ্ঠা বুদ্ধিতে হইবে। আবার যে সমস্ত স্থলে তৎপ্রস্তাবিত শব্দের সহিত এই প্রবন্ধে প্রস্তাবিত শব্দের ঐক্য না থাকিবে সে সমস্ত স্থলে আমাদের প্রস্তাবিত শব্দের দক্ষিণে শ্রদ্ধের ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রদত্ত শব্দ থাকিবে ও সেই সমস্ত শব্দের পার্শ্বে (রা) এই চিহ্ন থাকিবে। শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনেকগুলি শব্দ প্রণয়ন করিয়াছেন (৬)। বর্তমান প্রবন্ধে (রা) চিহ্নের স্থায় (যো) চিহ্ন শ্রদ্ধের রায় মহাশয়ের পক্ষে ব্যবহৃত হইবে।

(১) সা-প-প ৬।৪ (পৃঃ ৩১৮)

(২) সা-প-প ১৩।৪ (পৃঃ ২৪৮—২৫৩)

(৩) A text-book of Mineralogy by E. S. DANA.

(৪) Mineralogy by H. A. MIERS.

(৫) সা-প-প ৬।৪ (পৃঃ ৩০২—৩২৩)।

(৬) ‘রত্ন-পরীক্ষা’—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত।

আমাদের বোধ হয় যে পাশ্চাত্য ভাষাতে গুণবাচক যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ আছে তাহাদের প্রত্যেকটির পরিবর্তে একটি শব্দ প্রয়োগের আবশ্যিকতা নাই। দৃষ্টান্তস্বলে glimmering শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। খনিজবিজ্ঞানে এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা কেবল মাত্র অক্ষরাস্তরিত করিয়া গ্রহণ করাই কর্তব্য :—যথা dome। একতপক্ষে বলিতে গেলে আমাদের বিশ্বাস যে বিজ্ঞানের কোনও বিশেষ বিভাগের পরিভাষার সহিত প্রচলিত ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে কিনা অথবা রক্ষিত হইতে পারে কিনা তাহা বিজ্ঞানের সেই বিভাগের কোনও গ্রন্থ না লিখিলে ঠিক ধরিতে পারা যায় না। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত শব্দগুলি অত্যন্ত ব্যাপক না হইলেও ইহাতে খনিজজ্ঞানে সাধারণতঃ প্রচলিত প্রায় সমস্ত গুণবাচক শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। সম্প্রতি আমাদের দেশে খনিজবিদ্যার আলোচনাতে লোকের কিছু কিছু উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত খনিজবিজ্ঞানবিদগণ স্থিরভাবে এই প্রবন্ধে প্রদত্ত শব্দগুলির সুবিচার করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

Abbreviation—সংক্ষেপ

Absorption—শোষণ

Acicular—সূচীনিভ

Acid—অম্ল

Adamantine—হৈরিক (যে)

Aggregate—সমষ্টি

Alkali—ক্ষার (রা)

Alliaceous—লগুনবৎ

Amorphous—নিরাকার, অনাকর্ষিক (রা)

অর্কতাহিত

অনিয়তাকার (যে)

সর্বাকার

Amplitude—কম্পনপ্রদায় (রা)

Amygdaloidal—বাদামাকার

Analyser—বিশ্লেষক, ব্যাসকরিক (রা)

Analysis—বিশ্লেষণ, ব্যাসক্রিয়া (রা)

Anisometric—অসমাকার

Anisotropic—বিষম সংহত (রা)

Arborescent—পত্রনিভ

Astringent—কষায়

Axis, crystallographic—ক্যাটিকরেখা

Basal plane—ভৌমিক ক্ষেত্র

Bevelment—বিচ্ছন্ন

Biaxial—দ্বিমার্গণ

Binary—দ্বিকোণিক

Bisectrix—বিভাজক

Bladed—শীর্ষনিভ

Botryoidal—বদরীনিভ

Brachy axis—হ্রস্বরেখা

" dome—ডোম

" pinacoid " পিনাকিড্

" prism " পরিজম্

" pyramid " পিরামিড্

Brittle—ভঙ্গুর (রা)

Calculation—গণনা

Cleavage—সত্ত্বদ (যে)

Capillary—কেশনিভ

Composition-plane—যোগক্ষেত্র

Clino-axis—নতরেখা

Cline dome—নতডোম্	Dichroism—দ্বিবর্ণত্ব
Columnar—স্তম্ভনিভ	Dichroscope—দ্বিবর্ণবীক্ষণ
Contact goniometer—সংস্পর্শ, কোণমাপক	দ্বিরাগদর্শনযন্ত্র (যো)
Coralloidal—প্রবালনিভ	Diffraction—স্ফটিবর্তন (রট)
Concentric—সমকেন্দ্রিক	Dihexagonal—দ্বিষট্‌কোণিক
Conchoidal—শঙ্করঙ্গ	Dimorphism—দ্বিরূপত্ব
Conoscope—কোণবীক্ষণ	Dimorphous—দ্বিরূপ
Contact twin—সংযুক্তযমক	Diploid—ডিপ্লিড
Corrosion—ক্ষয়	Distorted—হুটে
Cryptocrystalline—গুপ্তক্ষাটিক	Ditetragonal—দ্বিচতুর্কোণিক
গুপ্তাকার (যো)	Ditrional—বিক্রিকোণিক
Crystal—ক্ষটিক, অর্ক (রা)	Dodecahedron—দ্বাদশপত্রী
Crystalline—ক্ষটিকাকার, নিয়তাকার	দ্বাদশপার্শ্ব (যো)
Crystallisation—ক্ষাটিকীভবন	Dome—ডোম্
অর্কতাপত্রি (রা)	Double refraction—দ্বিবক্রীকরণ
Crystallite—উপক্ষটিক (যো)	Drusy—গহ্বরযুক্ত
Crystallogeny—ক্ষটিকতত্ত্ব	Dyakisdodecahedron—দ্বিষাদশপত্রী
Crystallography—ক্ষটিকবিজ্ঞান	Earthy—মৃত্তিকাময়
অর্কবিজ্ঞা (:রা)	Enantiomorphous—বিরূপাকার
Cube—ঘটপত্রী	Etching—ক্ষয়
Cubic—সমমাপক ঘন বা	Even—সমান
একমাত্রিক (যো)	Exfoliation—আকুঞ্জন
Decrepitation—ফাটন	Extinction—লোপ
Deltoid dodecahedron—ডেল্টোনিভ	Extraordinary—অনিয়মিত
দ্বাদশপত্রী	Fibrous—তন্তুনিভ, অংশুময় (রা)
Dendritic—পত্রকল্প	Foliated—কুঞ্চিত
Diagonal—ব্যাধ	Filiform—কেশনিভ
Diamagnetic—চুম্বকভেদ	First order—প্রথম শ্রেণী
Diaphaneity—আলোবাহিতা	Flexible—নমনশীল
Diathermaney—তাপবাহিতা	Fracture—বিভঙ্গ (যো)
Dichroic—দ্বিবর্ণ	Fundamental form—মুখ্য আকার
	Fusibility—জ্বলন

Globular—গোলাকার
 Globulite—উপগোলক
 Goniometer—কোণমাপক
 Granular—শর্করাবৎ
 Greasy—পিচ্ছণ
 Gyroidal—আবর্তিত
 Habit—স্বভাব
 Hackly—কঙ্কতবৎ
 Hardness—দাঢ়া; কঠোরতা (ঘো)
 Hexagonal—ষট্‌কোণিক
 চতুরক্ষ (ঘো)
 Hexakistetrahedron—ষট্‌চতুষ্পত্রী
 Hemihedral—অর্দ্ধপত্রল
 অর্দ্ধাংশ (ঘো)
 Hemimorphic—অর্দ্ধাকৃতি
 Hexakisoctahedron—ষড়ষ্টপত্রী
 Holohedral—পূর্ণপত্রল
 Icositetrahedron—চতুর্বিংশপত্রী
 Idiophanous—স্বোৎপাদক
 Index—চিহ্ন
 Inclusion—অন্তর্নিবেশ
 Isodiametric—সমবাহু
 Isometric—সমমাপক
 Isomorphous—সমপত্রল
 Isomorphism—সমপত্রতা
 Isotropic—সমসংহত (রা)
 Left handed—বামাবর্ত
 Lustre—কাস্তি (ঘো)
 Macro axis—দীর্ঘরেখা
 Malleable—ঘাতসহক
 Mammillary—বদরীনিভ
 Massive—পিণ্ডাকার (ঘো)

Meanline—মধ্যরেখা
 Mimetic—উপন্যাসমিতিক
 Mineral—খনিজ
 Mossy—শৈবালনিভ
 Mineralogy—খনিজবিজ্ঞান, মণিবিজ্ঞান
 (ঘো) গৈরিকবিজ্ঞান (রা)
 Monoclinic—একনতিক, বক্রায়ত বা
 একনত (ঘো)
 Negative—ঋণক
 Nodular—গ্রন্থিভ
 Normal angle—লম্বকোণ
 Octahedron—অষ্টপত্রী
 Octant—অষ্টাঙ্গ
 Opaque—অস্বচ্ছ
 Optic axis—সমকল্প রেখা
 Ordinary—নিয়মিত
 Ortho axis—কুটীজরেখা
 Paragenic—
 Paramagnetic—চুম্বকাত্ম
 Paramorphism—পরাকৃতিত্ব
 Pentagonal dodecahedron—পঞ্চ-
 কোণিক দ্বাদশপত্রী
 Percussion figure—ঘাতচিহ্ন
 Phanerocrystalline—ব্যক্তাকৃতিক,
 স্পষ্টাকার (ঘো)
 Pyro-electricity—তাপতড়িৎ
 Piezo-electricity—চাপতড়িৎ
 Plagihedral—আবর্তিত
 Pleochrism—বহুবর্ণত্ব বহুরাগত্ব (ঘো)
 Pleomorphism—বহুরূপিত্ব
 Polarisation—প্রবর্তাপত্তি (রা)
 সমতাপাদন (ঘো)

Polysynthetic—পৌনঃপুনিক	Sphenoidal group—স্ফিনিড শ্রেণী
Positive—আকৃষ্টমান	Spherulite—পরিগোলক
Prism—পরিভ্রম, স্তম্ভ (যো)	Splendent—উজ্জ্বল
Pycnometer—গুরুত্বমাপক	Spherical projection—বার্তুল, প্রতিক্ষেপ (রা)
Pyramid—পিরামিড, শিখর (যো)	Stauroscope—লোপবীক্ষণ
Radiated—চক্রনিভ	Streak—কষ (যো)
Reflecting goniometer—প্রতিফল-মান কোণমাপক	Symmetry—সমমিতি
Reflection—পরাবর্তন (রা)	“ axis of—সমমিতিক রেখা
“ মুচ্ছন (যো)	“ group of— “ শ্রেণী
Reflectometer—পরাবর্তমাপক	“ plane of— “ ক্ষেত্র
Refraction—তিরোবর্তন (রা)	System—শ্রেণী
Refractive index—তিরোবর্তমান	Stellated—নক্ষত্রনিভ
Refractometer—তিরোবর্তমাপক	Tarnish—বিমর্ষতা
Relief—উদ্ধৃতি	Tetartohedral—অর্ধাঙ্গপত্রল
Reniform—	Tetragonal—চতুষ্কোণিক, চতুরঙ্গ, দ্বিমাত্রিক (যো)
Resinous—গন্ধকনিভ	Tetrahedral—চতুষ্পত্রল
Reticulated—আনাঘনিভ	Tetrahedron—চতুষ্পত্রী
Rhombic—রম্বিক	Thermoelectricity—তাপতড়িৎ
Rhombohedral—রম্বপত্রল	Transparent—বহু
Right-handed—দক্ষিণাবর্ত	Translucent—অচ্ছ প্রায় (যো)
Roasting—দাহন	Triclinic—ত্ৰিনতিক, ত্ৰিনত (যো)
Scale of fusibility—দ্রবণমান	Trigonal—ত্রিকোণিক
“ hardness—দাঢ়মান	Trimorphism—ত্রিরূপত্ব
Scalenohedron—বিষমপত্রীণ	Trisooctahedron—ত্র্যষ্টপত্রী
Sclerometer—দাঢ়মাপক	Twin—সমজ
Secondary—গৌণ	Twin axis—সামজ রেখা
Silky—কৌশিক (যো)	“ plane—সামজ ক্ষেত্র
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব, গুরুত্ব (যো)	Uneven—অসমান
Spectroscope—লেখাবীক্ষণ (রা)	Uniaxial—একনাল
Sphenoid—স্ফিনিড	Unit form—মূল আকার

Vitreous—কাচনিভ কাটিক (বো)

Wave—তরঙ্গ (রা)

Waxy—সিক্তিক (বো)

Zone—বলয় (রা)

শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য*

(আবির্ভাবকাল-নিরূপণ)

অপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে অধ্যাত্মবিজ্ঞার আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। পূর্বে ঐকিঞ্চ বিশেষ বিশেষ পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাপূর্ব্বক মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণসাধন করিতেন। ফলে—উপনিষদ্ পুরাণ প্রভৃতির অমূল্যলেক্ষ্য নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তৎপরে বৃহস্পতির লোকাশ্রম-মত, কপিলের সাংখ্যমত, পতঞ্জলির যোগদর্শন, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা, বাদরায়ণের বেদান্ত-মত প্রভৃতি দার্শনিকমতের আলোচনা হয়। বিশিষ্ট জ্ঞানিগণ ঐ সকল মতের আলোচনা করিতেন। কিন্তু সমাজ শ্রুতি ও শ্রুতির বিধি-অনুসারে চলিত।

তারপর বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা। যদিও এই দর্শন সাংখ্যদর্শন হইতে সংগৃহীত, তথাপি বৌদ্ধদিগের আচার-ব্যবহার বেদবিধির বিরোধী ছিল। বৌদ্ধগণ, ষাণ্মজ্জের উপযোগিতা জানিতেন না। প্রায় ১৫০০ বৎসর বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের সংঘর্ষ চলে। সম্রাট অশোকের সময় ভারত, তিব্বত, চীন, জাপান, শ্রাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ বৌদ্ধভাবে প্রাবৃত হইয়াছিল।

অতঃপর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধ-প্রাবৃত ভারতে পুনরায় অবৈতবাদ ও বৈদিকধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্তনের জন্ত বহুপন্থিকর হন। প্রচার-কার্য্য স্বাধী করিবার জন্ত তিনি ভারতের চারিদিকে চারিটা মঠও প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্বীয় অনৌকিক জ্ঞান ও প্রতিভাবলে ভারতবাসীদিগকে অবৈতবাদামৃত দান করিয়া বিরূপ জ্ঞানোন্মত্ত করিয়াছিলেন তাহা কাহাকেও নুতন করিয়া বলিতে হইবে না। ইহার অভূজ্য ও অসাধারণ প্রতিভাদর্শনে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ ইহাকে “শঙ্করাবতার” বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তিনি যে সনাতন আর্থ্যধর্ম্মের মঙ্গলসাধনোদ্দেশে স্নগভীর তুরীধ্বনি

* সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত।

করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও ভারতীয়গণের কর্ণকূহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই পূজ্যপাদ শঙ্করের অশেষ করুণা এবং ধর্ম-সংরক্ষণের জন্ত বিশেষ চেষ্টা বা যত্নের কথা ভারত-বাসিগণ কখনই বিস্মৃত হইবে না। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় যে একরূপ হিতব্রত ব্যক্তির আবির্ভাবকালে কেহই তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তবে, তাঁহার কৃতজ্ঞহৃদয় শিষ্যগণ তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠসমূহে ভগবান্ গুরুদেবের জীবনসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মিহ ভগবানের আবির্ভাবকালাবধি তাঁহার জীবনের অত্যাম্ভ্যচর্য্য ঘটনা সম্বন্ধেও অনেক প্রবাদ ভারতের নানাহানে আজও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। অধিকন্তু, প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থেও তাঁহার জন্মবিবরণাদিসম্বন্ধে হ'একটি শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এ সমস্ত উক্তিতে তাঁহার জন্মকালসম্বন্ধে একরূপ মতভেদ দেখা যায় যে সেগুলি হইতে তাঁহার আবির্ভাবের প্রকৃত কালনিরূপণ বড়ই সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীন ও বর্তমান কয়েকজন দেশীয় পণ্ডিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্য্যের কালনিরূপণ-সম্বন্ধে বিশেষ বা বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এদিকে যুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদগণও নিজ নিজ গবেষণাবলে বহু প্রমাণদ্বারা শঙ্করাবির্ভাবকাল স্থির করিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। উল্লিখিত গ্রন্থ, প্রবাদ এবং দেশীয় ও যুরোপীয় পুরাবিদগণের প্রমাণাদি আলোচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতের গুরুত্ব বিচারপূর্ব্বক আমরা শঙ্করাবির্ভাবকাল নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতের সকল প্রধান স্থানে শঙ্করের পদার্পণ ঘটিলেও এবং সর্ব্বস্থানই তাঁহার অমরকৃত ভক্ত ও শিষ্যানুশিষ্যে পরিব্যাপ্ত হইলেও আচার্য্যপ্রবরের প্রকৃত জীবনীর অভাব ঘটয়াছে।

জীবনী গ্রন্থ।

পরবর্ত্তিকালে কএকখানি চরিতাখ্যায়িকা রচিত হইলেও তদ্বারা

ইহার প্রকৃত জীবনী নির্দ্ধারণ করা কঠিন। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত

শঙ্করের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া যে কয়খানি জীবনী-পুস্তক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদিগ্বিজয়, চিদিলাস যতিবিরচিত শঙ্করবিজয় এবং মাধবাচার্য্যাকৃত সংক্ষেপশঙ্করজয় নামক গ্রন্থত্রয়ই প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। তন্মিহ নীলকণ্ঠ, সদানন্দ, পরমহংস বালকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ বিরচিত লঘুশঙ্করবিজয়, তিরুমল দীক্ষিতের শঙ্করাভ্যাস ও পুরুষোত্তম ভারতীকৃত শঙ্কর-বিজয়সংগ্রহও বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

মাধবাচার্য্যের সংক্ষেপ শঙ্করজয় বা “শঙ্করবিজয়”।

মাধবের শঙ্করবিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য মলবের অন্তর্গত কালাদি নামক স্থানে শিবগুরুর ঔরসে ও সতী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার জন্মকালে মেঘে রবি, তুলায় শনি এবং মকরে মঙ্গলসংস্থিত ছিল।* বৃহস্পতি কেন্দ্রে অবস্থিত লিখিত থাকায় এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে বৃহস্পতি লগ্নে ছিলেন, অথবা

সেই চিহ্ন হইতে ৪র্থ, ৭ম বা ১০ম ঘরে ছিলেন; শঙ্করের জন্মকালে অজ্ঞাত গ্রহসংস্থান ইহাতে উল্লিখিত নাই। তৎপরে † তিনি অষ্টমবর্ষে গৃহত্যাগ পূর্বক উত্তর ভারতে গমন করেন এবং নন্দ্যাদিত্যের গোবিন্দ যোগীর (গোবিন্দাচার্য) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এইরূপে আহ্বান করেন*—

“আপনি প্রথমে আদিশেষ ছিলেন, তৎপরে পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ হন এবং এক্ষণে আপনি গোবিন্দযোগী।”

অতঃপর তিনি নীলকণ্ঠ, হরদত্ত ও ভট্ট ভাস্করকে তর্কে পরাজয় করেন এবং তাঁহাদের ভাষ্যেরও যথেষ্ট নিন্দা করেন। ইহার পর ‡ তিনি বাণ, দণ্ডী ও ময়ূরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার দর্শন বিষয়ে উপদেশ দেন। § তিনি খণ্ডন-খণ্ড-খাণ্ড-রচয়িতা হর্ষ || অভিনব গুপ্ত ** মুরারিমিশ্র †† উদয়নাচার্য ‡‡ কুমারিল §§ মণ্ডনমিশ্র ও ||| প্রভাকরকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে এই নন্দ্যদেহ ত্যাগ করিয়া কৈলাসে শিবের সহিত মিলিত হন।

উক্ত গ্রন্থ খানি মাধবাচার্য-বিরচিত বলিয়া প্রখ্যাত। কিন্তু সায়ণাচার্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য ইহার রচয়িতা কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বলা যায় না। মাধবাচার্যের সমস্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে বা শেষে নিজ পরিচয়, স্বীয় গুরু নাম ইত্যাদি লিখিত আছে, কিন্তু সায়ণ-শঙ্করজয়ে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, ইহা মাধবাচার্যনামা অপর কোন শূদ্রের মঠাবলম্বী আধুনিক ব্যক্তির রচিত। তারপর এ পুস্তকের রচনা-প্রণালী মাধবাচার্যের অজ্ঞাত রচনাপদ্ধতি হইতে একবারে পৃথক। এই গ্রন্থলেখক লিখিয়াছেন, তিনি এই পুস্তক পূর্ববর্তী কোন ‘শঙ্কর-বিজয়’ অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান-বিষয় শঙ্করজন্ম সম্বন্ধে শঙ্করবিজয়ের কোন সময়ের কথা ইহাতে উদ্ধৃত বা উল্লিখিতও হয় নাই। গ্রন্থনিহিত ব্যক্তি-বর্ণের নাম ইহাতেও গ্রন্থখানির আধুনিকত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে, সুতরাং এই পুস্তকের মত অনেক স্থলেই গ্রাহ্য নহে। তবে সম্প্রদায়বিদ্‌গণের ইহা প্রধান গ্রন্থ বলিয়া কোন কোন বিশেষ বিষয়ে ইহার প্রামাণিকতা গৃহীত হইতে পারে। এই গ্রন্থে যে সকল আচার্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের কালনির্ণয় আবশ্যক।

নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য নামেও পরিচিত ছিলেন। ইহার লিখিত ব্রহ্মসংক্রান্ত্যো তিনি

১। নীলকণ্ঠ। রামানুজের বচনাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইনি খৃঃ দ্বাদশ

শতাব্দীর পরবর্তী, রামানুজের* কখনই পূর্ববর্তী নহেন। কাজেই

শঙ্করের সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ অসম্ভব।

+ ২য় সর্গ। * ৫।৫।২৫। † ১৫।৫।৫৩, ৪২, ৯০। ‡ ১৫।৫।১৪১।

\$ ১৫।৫।১৫৬। || ১২।৮।১৫৭। ** ১৫।৫।১৫৮

†† ১৫।৫।১৩। ‡‡ ২য় সর্গ। §§ ১-ম সর্গ। ||| ১২।৫।৪৩।

হরদত্ত আপস্তম্ব ও গোতম ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকাকার। ইনি কাশিকাবৃত্তির পদমঞ্জরী নামী টীকা রচনা করেন। কাশিকাবৃত্তি জয়াদিত্য ও বামন কর্তৃক লিখিত। বামন ও জয়াদিত্যের কাল স্থির হইয়া গিয়াছে। জয়াদিত্য ৫৯৫ সংবতে বিত্তমান ছিলেন; ২ হরদত্ত। বামন সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন। হরদত্ত ইহাদের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যে নবম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নন, তাহা প্রমাণ করা বাইতে পারে।

ভট্ট ভাস্কর জ্ঞানযজ্ঞ নামে কৃষ্ণ যজুর্বেদের ভাষ্যকার। ইনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইনিও একখানি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি শঙ্করকে বহুবার আক্রমণ করিয়াছেন। ৩ ভট্ট ভাস্কর।

শাক্ত ধরপদ্ধতি পাঠে জানা যায় যে, বাণ ও ময়ুর শ্রীহর্ষের রাজসভায় বিত্তমান ছিলেন। ৪ বাণ, দণ্ডী ও ময়ুর। বাণ নিজেই তাঁহার শ্রীহর্ষচরিতে (২য় উচ্ছ্বাসে) বলিয়াছেন যে, তিনি ময়ুর। রাজসভায় শ্রীহর্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের অনুমান, ময়ুর ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং বাণ শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। দণ্ডী ইহাদের পরে অষ্টম শতাব্দীতে বিত্তমান ছিলেন। ম্যাকডোনাল, বার্থ, বেবের ও ম্যাকসমুলার ইহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বাণ, দণ্ডী ও ময়ুরের কাল এখনও প্রকৃত-রূপে নিরূপিত হয় নাই।

শঙ্করবিজয়ের শ্রীহর্ষ শ্রীহীর ও মামল্ল দেবীর পুত্র। জৈন কবি রাজশেখর তাঁহার প্রবন্ধকোষে লিখিয়াছেন, শ্রীহর্ষ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ শ্রীহর্ষ। অত্রত্য রাজা জয়ন্তচন্দ্রের আদেশে তিনি নৈষধচরিত লেখেন। জয়ন্তচন্দ্র ১১০৩ ও ১১২৯ সংবতের মধ্যে বারাণসী ও কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। স্মতরাং শ্রীহর্ষও এই সময়ের লোক।

অভিনবগুপ্ত—ডাঃ বুল্লরের মতে অভিনবগুপ্ত প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

মুরারিমিশ্র—কবি মুরারি মিশ্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি নীমাংসাশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত। ১১৮৫ সংবতের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী সময়ে ইনি বিত্তমান ছিলেন।

উদয়নাচার্য্য—ইনি বাচস্পতি মিশ্রের ত্রায়বাস্তিকতাংপর্য্য নামক গ্রন্থের ‘তাংপর্য্যপরিণুক্তি’ নামী টীকা লেখেন। ভট্টরাধব ১১৯৬ সংবতে “ত্রায়সারবিজয়” গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের গৃহ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করেন। স্মতরাং উদয়ন ১০৩২ ও ১১৯৬ সংবতের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

ধর্ম্মগুপ্ত—খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পরবর্তী নহেন।

কুমারিল, মণ্ডনমিশ্র, প্রভাকর—ইহাদের সময় পরে বিচার করা হইয়াছে। ইহারা শঙ্করের সমসাময়িক বটে।

এখন দেখা বাইতেছে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ শঙ্করের পূর্ববর্তী, কেহ

যা পরবর্ত্তী এবং আবার কেহ কেহ শঙ্করের সমসাময়িক ; সুতরাং এইরূপ গ্রন্থকারের উক্তির উপর নির্ভর করা কতদূর আশাশ্রয়, তাহা সহজেই অনুমেয় ।

চিদিলাস যতির গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

কেরল দেশান্তর্গত কালাদি নামক স্থানে শিবগুরুর ঔরসে আধ্যাত্ম্য গর্ভে বসন্ত ঋতুর মধ্যাহ্নকালে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে আদ্রী নামক নক্ষত্রে শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার জন্ম-

চিদিলাস যতির শঙ্কর বিজয়

কালে পাঁচটা গ্রহ তুলাস্থানে ছিল । ঐ পাঁচটা গ্রহের নাম গ্রন্থে উল্লিখিত নাই । পঞ্চম বর্ষ বয়সে শঙ্করের উপনয়ন হয় । তার

পর তিনি একদিন নদীতে অবগাহন করিতে গিয়া কুস্তীর কর্তৃক আক্রান্ত হন ; কিন্তু কৌশলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন । অতঃপর সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়া হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন । তথায় তিনি তপোনিরত গোবিন্দপাদের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট যথাবিধি সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন । ইহার পর তিনি ভট্টপাদের (কুমারিলের) সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কাশ্মীরে গমনপূর্ব্বক মণ্ডনমিশ্রের সহিত তর্কযুক্ত করেন । অনন্তর শঙ্করাচার্য শৃঙ্গগিরি ও জগন্নাথে দুইটী মঠ স্থাপন করিয়া সুরেশ্বর ও পদ্মপাদকে মঠরক্ষার নিযুক্ত করিলেন । ইহার পরে তিনি গুজ্জরের অন্তর্গত দ্বারকায় মঠস্থাপনপূর্ব্বক হস্তামলককে এবং বদরিকাশ্রমে আর একটী মঠস্থাপন-পূর্ব্বক তোটকাচার্যকে তত্ত্ব স্থানের আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । পরিশেষে শঙ্করাচার্যের বদরিকাশ্রমে অবস্থিতিকালে বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার দত্তাত্রেয় শঙ্করের নিকট গমন করিয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক হিমালয় গল্বরে প্রবেশ করেন । এই স্থান হইতে শঙ্কর শিবের সহিত সম্মিলনার্থ কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন ।

আনন্দগিরির শঙ্করবিখিঞ্জয় ।

আনন্দগিরি-লিখিত পুস্তকে শঙ্করের পূর্ব্ববিবরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, সর্ব্বজ্ঞ নামক এক ব্রাহ্মণ কামাক্ষীনাম্নী নিজ

পত্নীর সহিত চিদম্বরে বাস করিতেন । বিশিষ্টা নাম্নী তাঁহার এক পরমা স্নহরী কন্যা জন্মে ; বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয় । বিশ্বজিৎ কিম্বৎকাল গৃহে থাকিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক বনগমন করিয়া তথায় তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন । এদিকে বিশিষ্টা দুঃখিতান্তরুণে চিদম্বরেশ্বর মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন । মহাদেবের রূপায় বিশিষ্টা এক পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হন । এই পুত্র পরে শঙ্করাচার্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন । এই পুস্তকের একস্থানে লিখিত আছে যে, লক্ষণ ও হস্তামলককে শঙ্কর বৈষ্ণবমত প্রচার করিতে আদেশ করেন ; তদনুসারে কাঞ্চীপুর হইতে একজন পূর্ব্বদিকে এবং অপর ব্যক্তি উত্তর দিকে গমন করেন । তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দ্বৈতবাদ প্রচার-পূর্ব্বক বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন । এই গ্রন্থের আর এক স্থানে লিখিত আছে যে, শঙ্কর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও চন্দ্রের মত খণ্ডনপূর্ব্বক স্বীয় মত স্থাপন করেন ।

বালকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ বিব্রচিত (মহিম্ময়ে প্রচলিত ১৭২৮ শকে লিখিত) “লঘুশঙ্করবিজয়” মতে শঙ্করাচার্য্যদয়কাল ৭৭৮ খৃঃ প্রবৃত্ত হইয়াছে ।

সদানন্দের পুস্তকে শঙ্করের কাল এইরূপ লিখিত আছে। বৃহত্তিরাঙ্ক ২৭২২, সর্বজিৎ নামক সংবৎসরে শুভলগ্নে পাঁচটা গ্রহ তুঙ্গী হয়। এই সময়ে শঙ্করের জন্ম অর্থাৎ ৩৭৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে শঙ্কর আবির্ভূত হন। কিন্তু পণ্ডিত গুরুনাথের আবিষ্কৃত সদানন্দ বিবরণিত “শঙ্করবিজয়সার” গ্রন্থের পাঠ কিছু স্বতন্ত্র। পণ্ডিত গুরুনাথের পাঠ নিয়ে প্রদত্ত হইল—

“প্রাসুততিষাশরদামতিবাতবত্যা-মেকাদশাদিকশতেনচতুঃসহস্রাম্।

সংবৎসরে বিভবনাম্মি শুভে মুহূর্ত্তে রাধে সিতে শিবশুরোগৃহিণী দশমাম্॥”

অর্থাৎ ৪০০০—১১১ = ৩৮৮৯ কলিগন্তবর্ষে বিভব নামক শুভ মুহূর্ত্তে শঙ্করের জন্ম হয়।

অপর প্রবাদ ও প্রাচীন মতামত।

শঙ্কর সম্বন্ধে কয়েকটা প্রবাদ দৃষ্ট হয়; ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে—

১ম প্রবাদ।—শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব আধ্যাত্মিক অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে যে প্রবাদ আছে, তদনুসারে শঙ্করের গুরু গোবিন্দভট্ট জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া চারিটা রমণীকে বিবাহ করেন। ইহার চারি পত্নীর গর্ভে চারিটা পুত্র হয়। ব্রাহ্মণীর গর্ভে বরকচি, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উজ্জয়িনীশ্বর বিক্রমাদিত্য, বৈশ্যার গর্ভে ভট্ট এবং শূদ্রার গর্ভে ভর্তৃহরি জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দভট্ট বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া গোবিন্দযোগী নামে বিখ্যাত হ'ন। শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদ নামক এক ব্যক্তিকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইনি বিক্রমের নবরত্নের এক রত্ন।

এক্ষণে দেখা যাক প্রবাদটা কতদূর সত্য। প্রবাদানুসারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে—

(১) শঙ্করাচার্য্য, ভট্টপাদ ও বিক্রমাদিত্য সমসাময়িক;

(২) ভট্ট ও ভর্তৃহরি সেই সময়ে জীবিত ছিলেন;

(৩) বিক্রমাদিত্যের পিতা ও শঙ্করের গুরু গোবিন্দভট্ট।

এক্ষণে এই প্রবাদনিহিত উল্লিখিত তিনটা সিদ্ধান্তের কোনরূপ সারবত্তা আছে কি না দেখা যাক। প্রথমতঃ শঙ্কর শারীরকভাষ্যের স্থানে স্থানে ভট্টপাদের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিশ্চয়ই শঙ্করের পূর্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক বলিতে হয়।

বোয়াইএ ভট্টিকাব্যের যে সংস্করণ প্রচলিত আছে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, আমি শ্রীধরসেন-নরেন্দ্রপালিত বলভী নগরীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম। * গ্রন্থকর্ত্তার

* “কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরসেন-নরেন্দ্রপালিতাম্।

কীর্ত্তিরতো ভবতাম্ নৃপতঃ তন্ত্ৰ কেমকরং ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্।”

ভট্ট ২২শ সর্গ, ৩৫ শ্লোক। বঙ্গদেশীয় সংস্করণে “শ্রীধরহর” পাঠ আছে; তাহা লিপি করপ্রমাদ।

নিজের এই উক্তি অনুসারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীধরসেন নরেন্দ্রের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। বলভীরাজবংশে চারিজন শ্রীধরের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫১৫ হইতে ৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীধরের রাজত্বকাল। দ্বিতীয় শ্রীধর ৫৭১ হইতে ৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৃতীয় শ্রীধর ৬২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জীবিত ছিলেন। চতুর্থ শ্রীধর ৬৪১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইহাদের মধ্যে কোন শ্রীধরের সময় “ভট্টিকাব্য”-র রচয়িতা জীবিত ছিলেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। এখানকার রাজগণ আপনাদিগকে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র-লবের সম্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং কবি যে বলভীপুরে থাকিয়া রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিবেন তাহা সম্ভব হইতে পারে। তিনি এই বলভীপুরে কোন সময়ে ছিলেন? তাহা স্থির করা কঠিন।

২য়।—“কেরলোগপন্ডি” নামক গ্রন্থের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্য ৩৫০১ কলিগতাব্দে (= ৩২২ শকাব্দে = ৩৯২ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসের আর্দ্রানক্ষত্রে জন্মিষ্ট হ’ন। এই মহাত্মা কেরল দেশের অন্তর্গত “কালাদী” (কালাদী) বিভাগের ‘কৈপল্ল’ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। চেরুমান পেরুমাল রাজার রাজত্বকালে ইহার জন্ম। ইনি ৬৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

৩য়।—চেরুমান পেরুমাল রাজার সমাধি-মন্দিরে যে শিলালিপি ছিল, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, ঐ নরপতির রাজত্বকালে ২১৬ শকে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এটা “কোঙ্গু-দেশ-রাজ-কাল” নামক গ্রন্থের মত। ডাউসন্ সাহেবের মতে দ্বিবিক্রম নামে দুইজন রাজা ছিলেন; প্রথম দ্বিবিক্রম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং দ্বিতীয় দ্বিবিক্রম অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার বলেন, কয়েকখানি তাম্রশাসন হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রথম ব্যক্তি খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন; কিন্তু দ্বীট সাহেব এই মত স্বীকার করেন না।

৪র্থ।—পদ্মপুরাণের ৪২ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য্যের কথা আছে। কিন্তু ইহাতে কোন সময়ের উল্লেখ নাই। শ্লোকগুলিও খাঁটি বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

৫ম।—তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে নাগার্জুন শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্তিত ধর্ম্মমত খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধদিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। শঙ্করাজ কণিঙ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসভ্যের অধিবেশন হয়। মহাত্মা পার্শ্ব এই সভ্য সভাপতি হইয়াছিলেন। এই পার্শ্বের প্রধান শিষ্য অশ্ববোধ এবং অশ্ববোধের শিষ্য নাগার্জুন। অভিমত্যা কণিঙ্ক, হুব্বি ও বাসুদেবের পরবর্তী রাজা এবং নাগার্জুন ইহার সময়ে বর্তমান ছিলেন, খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নাগার্জুন জীবিত ছিলেন; অতএব শঙ্করাচার্য্য ইহার পরবর্তী। এই উক্তিতে বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। (Life and Legends of Nagarjuna B. A. S. B. No 117)

৬ষ্ঠ।—বুদ্ধদেব সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। নেপালের ইতিহাসে লিখিত আছে

যে উক্ত রাজার শাসনকালে শঙ্করাচার্য্য নেপালে স্মরণপূর্ব্বক বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন। এই ইতিহাসমতে বুঘদেব ৪০০ শকাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। পণ্ডিত ভগবান্দাল ইন্দ্রজীর মতে বুঘদেব ১৮২ শকাব্দে জীবিত ছিলেন। কিন্তু ফ্লীট সাহেবের মতে বুঘদেব খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। তেলাঙ্ মহাশয় নেপালের ইতিহাসের মত অগ্রাহ্য মনে করেন। বস্তুতঃ ইহাতে ঘটনা-পরম্পরার সামঞ্জস্য অতি কম।

৭ম।—কুর্ম্মপুরাণের ২৮২২ অধ্যায়ে শঙ্করগ্রন্থ আছে—

“গতে নারায়ণে কৃষ্ণে স্বয়মেব পরং পদম্।

* * *

করিয়্যত্ববতারিণি শঙ্করো নীললোহিতঃ।”

এই পুরাণের শ্লোকাবলী হইতে শঙ্করের সময় জানিবার কোনও উপায় নাই।

৮ম।—ভক্তমালগ্রন্থেও শঙ্করের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহা আধুনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করের কালনিরূপণ অসম্ভব।

৯ম ও ১০ম।—বায়ুপুরাণে* ও ভবিষ্যপুরাণে† শঙ্করের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা প্রকিণ্ড শ্লোক বলিয়া গণ্য। ইহা হইতে শঙ্করের সময়-নিরূপণে কোন সুবিধা হইবে না।

১১শ।—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সরস্বতী তাঁহার “মত্যাথপ্রকাশ” নামক গ্রন্থে শঙ্করকে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোনও যুক্তির উল্লেখ নাই।

১২শ।—কাশীধামস্থিত কৃষ্ণানন্দ স্বামী ভাস্কর রায়ের “দীক্ষামীমাংসা” নামক পুস্তকে একটা শ্লোক আছে। তদনুসারে ৬০০ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হয়; কিন্তু কোনও অন্যের ছয়শত বৎসর পরে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। “শঙ্করের সময়” নামক এই পুস্তকের গুজরাটী অনুবাদে কলির ৬০০ বৎসর বলা হইয়াছে।

১৩শ।—স্কন্দপুরাণের শিবরহস্তে কলির ২০০০ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হইবে ইত্যাদি উক্তির উল্লেখ আছে—

“কলাবিগে মহাদেবি সহস্রদ্বিতয়াৎ পরম্।

* * *

কেরলে শশলগ্রামে বিপত্র্যাং মদংশ শতঃ।

ভবিষ্যতি মহাদেবি শঙ্করাখ্য-দ্বিজোক্তমঃ॥” (৯ম হইতে বোড়শ অঃ)

১৪শ।—রঘুনাথ ভাস্কর গোড়বেলে নামক পণ্ডিত অরুণাচীন কোষে “জিনবিজয়” হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদনুসারে ২১৫৭ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের অন্তর অন্তর আর একটা শ্লোকে ইহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে মাত্র।

১৫শ।—মলবর দেশে শঙ্করের জন্ম সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। মলবরবাসিগণ

* “চতুর্ভিঃ সহ শিবৈশ্চ শঙ্কর অবতরিষ্যতি।”

† প্রতিনর্গপর্ব্ব ১০ম ও ১১শ অধ্যায়।

ইহার জন্মবৎসর বুঝাইতে একটা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। শব্দটী “আচার্য্যবাগতত্ত্বা” অর্থ ২৮০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং দেখা যাউতেছে অত্রিত্য প্রবাদানুসারে ২৮০ খৃষ্টাব্দে শব্দরের জন্ম হয়। ৮ অক্ষরকুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের পরিণিষ্টে লিখিয়াছেন যে, “আচার্য্যবাগতত্ত্বা” নামক একটা অক্ষর প্রচলিত আছে। আমাদের মনে হয়, অক্ষরহানে শব্দ বুলিলেই অর্থবদ্ধতি হয়, কেন না ঐ নামে কোন অক্ষর ভারতের কোত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এটা শব্দ ধরিলে ইহার অর্থ ৮৩২ খৃষ্টাব্দ হয়।

১৬শ।—মুনি আত্মারামজী তাঁহার “অজ্ঞানভিমিরভাস্কর” নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বলিয়াছেন যে শব্দরচাৰ্য্য প্রায় ব্ঃ ৪৪৩ অব্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ২য় সংস্করণের ১১ ও ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে শব্দর অনুমান স্ং ৬০০।৭০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন।

১৭শ।—কাবলি রামস্বামী “Biographical sketches of Deccan Poet” * নামক পুস্তকে শব্দরকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পুস্তকে সায়নাচার্য্য প্রভৃতির বিষয়েও অনেক অদ্ভুত কথার অবতারণা আছে। ইহার উপর আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না।

১৮শ।—জনর্দিন রামচন্দ্রজী তাঁহার “Lives of Eminent Hindu authors” নামক গ্রন্থে শব্দরচাৰ্য্যকে ২৫০০ বর্ষের পূর্ববর্তী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাও একটা উনবিংশ শতাব্দীর প্রবাদ—তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্যও নয়।

১৯শ।—কাহারও কাহারও মতে শব্দরকীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্মই কোলম্ শব্দের প্রবর্তন হইয়াছে। ৮২৪ খৃষ্টাব্দে কোলম্ অক্ষর প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং এই মতানুসারে শব্দরও নবম শতাব্দীর লোক।

২০শ।—তিব্বতীয়ভাষায় লিখিত ভারনাথের “ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্‌তিহাস” নামক গ্রন্থে রাজা “শ্রোঙ্‌স্‌ন্‌ গম্‌-পো” ৬২৯ হইতে ৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া লিখিত আছে। ইনি নেপালাধিপতি জ্যোতিবর্ম্মার কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রোঙ্‌স্‌ন্‌-গম্‌-পো” শব্দরচাৰ্য্যের সমসাময়িক।

২১শ।—মহর্ষিজমুনির মতে মহুকুলের আদিভ্য রাজার সময় সুরেশ্বর জীবিত ছিলেন। সুরেশ্বর শব্দরের সাক্ষাৎ শিষ্য। সুতরাং শব্দরও ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন।

২২শ।—নেপালের পার্বত্য বংশাবলীর মধ্যে—শব্দরদেব খৃষ্টপূর্বাব্দ ৫৪৫ হইতে ৫৭৬ মধ্যে এবং শব্দরচাৰ্য্য—৫২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিজ্ঞমান ছিলেন।

২৩শ।—পারস্ত্রগ্রন্থ দরিস্তানের মতানুসারে শব্দরচাৰ্য্য ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হ’ন। দরিস্তান গ্রন্থের উক্তি ত্রিতান্ত্রই অপ্রকৃত।

* এই পুস্তকখানি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ইহার ৬ পৃষ্ঠায় শব্দর-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

কালনির্ণয় সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মত ।

উইলসন সাহেব বহু পণ্ডিতের মত প্রদর্শন করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন ।

উইলসন ১৮৩২ খৃঃ। তিনি বলেন—

(১) কদলী ব্রাহ্মণদিগের মতে আচার্য্য ২০০০ বর্ষ পূর্বে জীবিত ছিলেন ।

(২) কাহারও কাহারও মতে তিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হ'ন ।

(৩) শঙ্কর দক্ষিণদেশস্থ স্বন্দপুরনৃপতি বিক্রমদেব চক্রবর্তীর সমকালীন । বিক্রমের কাল ১৭৮ খৃষ্টাব্দ । ইহা কোঙ্গুদেশেজিহ্বাসে পাওয়া যায় ।

(৪) শৃঙ্গেরীবাসীদিগের মতে শঙ্করাবতারকাল হইতে ১৬০০ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে ।

(৫) কোন সম্প্রদায়ের মতে শঙ্করাবতার হইতে ১২০০ বৎসর কাটয়া গিয়াছে ।

(৬) ভোজ প্রবন্ধে শঙ্করের নাম পাওয়া যায় । ইহাতে লিখিত আছে, ভোজরাজের সময় তিনি পৃথ্বী হইয়াছিলেন । এতদ্বারা সংবতের ৮০০ কি ৯০০ বর্ষ পূর্বে তাঁহার আবির্ভাবকাল স্থির হইতেছে ।

(৭৮) ডাক্তার টেলারের মতে ৯০০ বর্ষ পূর্বে এবং কোলক্কের মতে ১০০০ বর্ষ পূর্বে শঙ্করাভ্যুদয় হইয়াছিল ।

(৯) রাজা রামমোহন রায়ের মতে তিনি খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর লোক ।

উইলসন সাহেব দেখিলেন যে সকলেই ১০০০ বর্ষ পূর্বে শঙ্করের কাল স্বীকার করিয়াছেন । অতঃপর ইনিও সিদ্ধান্ত করিলেন যে শঙ্কর ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে এবং ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন *

বিজিষ্মান তাঁহার “শঙ্কর” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শঙ্কর ৫০০ খৃষ্টাব্দ

বিজিষ্মান ১৮৩৩ খৃঃ

হইতে ৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । অবশ্য তিনি তাঁহার মতসমর্থনের জন্য কোন যুক্তির অবতারণা করেন নাই ।†

টেলার সাহেব ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শঙ্করাচার্য্যের বিষয় সংসামান্য আলোচনা

টেলার ১৮৩৮ খৃঃ।

করেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই ।‡

* Sanskrit Dictionary, Preface, p. XVII ; Essays. Vol. I. p. 194.

† Fr. Windischmann's 'Sankara' I. p. 42.

‡ J. A. S. B. VII. (1) 513

ক্রিশ্চিয়ান লাসেন ১৮৫১ খৃঃ তাঁহার “ভারতীয় পুরাতত্ত্ব” নামক গ্রন্থে* শঙ্করসম্বন্ধে বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শঙ্করের সময় লাসেন ১৮৫১। সম্বন্ধে সামান্যই বলিয়াছেন। ইহার মতে চেরুমাল ও পেরুমালের রাজত্বকালে শঙ্করাচার্য জীবিত ছিলেন।

ওয়েবর ১৮৫২ খৃঃ তাঁহার সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে প্রসঙ্গক্রমে একস্থানে লিখিয়াছেন যে শঙ্করের আবির্ভাবকাল আজ পর্যন্ত যথার্থরূপে স্থিরীকৃত হয় ওয়েবর ১৮৫২। নাই। তবে সম্ভবতঃ শঙ্কর অনূন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। (History of Indian Literature, 1882. p. 51 and foot-note.)

ম্যানিঙ্ মহোদয় ১৮৬৯ খৃঃ “তাঁহার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত” নামক পুস্তকে† লিখিয়াছেন যে অধ্যাত্ততত্ত্বোপদেষ্টা শঙ্করাচার্য বা শঙ্কর দেশীয় প্রবাদ অনুসারে অনূন ম্যানিঙ্ ১৮৬৯। ২০০ পূঃ খৃঃ লোক। কিন্তু উইল্‌সন সাহেব তাঁহাকে খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। M. Néve তাঁহার আত্মবোধের অনুবাদে‡ শঙ্করের উক্ত সময়ই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

কোলব্রুক সাহেব ১৮৭২ খৃঃ তাঁহার “বিবিধ প্রবন্ধের” এক স্থলে§ লিখিয়াছেন যে শঙ্কর তাঁহার বেদান্তভাষ্যের ৩২।৫৩ সূত্রে শবরস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে কুমারিলের নাম না করিলেও এই সূত্রে কুমারিলকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বি সিউরিস্ রাইসের মতে শঙ্কর ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরে ৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন রাইস্ ১৮৭৬। এবং চত্বারিংশৎ বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করেন ‥। বর্ণেল সাহেব শঙ্কর-সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কোন আলোচনা করেন নাই। তবে তিনি বর্ণেল ১৮৭৮। প্রসঙ্গতঃ শঙ্করাবির্ভাবের কালসম্বন্ধে ১৮৭৮ খৃঃ যে ধুক্তি দিয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

তিনি বলেন, মাজ্জাজের আশপাশে একই মন্দিরে যে বিষ্ণু ও শিবের এক সঙ্গে পূজা

* Indische Alterthumskunde, IV.

† Ancient and Mediaeval India, by Mrs Manning. Vol. I. p. 210.

‡ “Atmabodha ou de la Connaissance de l’Esprit. Version Commentée du poème Vedantique de Cankara Achharya”.

§ Miscelanious Essays. Vol. I. p. 298 foot-note.

¶ Mysore Gazetteer Compiled for Government. Revised Ed. (1897), Vol I. p. 471.

হইয়া থাকে, তাহা শঙ্করের বেদান্তমত-প্রচারের ফল, এ কথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। এই শঙ্করাচার্য্য প্রায় ৬৫০-৭০০ খৃষ্টাব্দের ব্যক্তি না হইয়া যায় না।* এতৎপক্ষে তিনি দুইটা যুক্তি দিয়াছেন।

প্রথম যুক্তি†—মাক্সমুলারের সপ্তপ্যাগোডায় (ইহা এক্ষণে গণেশমন্দির বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে) যে সমস্ত লিপি পাওয়া গিয়াছে তৎসমুদায় যে প্রায় ৭০০ খৃষ্টাব্দের, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। এই লিপির প্রথম চারিপঙক্তিতে যেরূপে শিবের বর্ণনা আছে,‡ তৎপাঠে বলা যায় যে শঙ্করের বেদান্তমত পরিস্ফুট না হইলে এ বর্ণনা সম্ভব হইতে পারে না। এই লিপির অবশিষ্ট পঙক্তিপাঠে জানা যায় যে একজন পল্লব-নৃপতি এই “শম্ভুবেশ্ব” নির্মাণ করিয়া দেন। (“শম্ভোন্তেনেনং বেশ্ব কারিতম্”)। সুতরাং ইহা কিছুতেই অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী হইতে পারে না; কেন না চোলগণ প্রায় এই সময়ে তোণ্ডইনাড়ু অর করেন, আর তাহারা যে পূর্ববংশীয় নৃপতির প্রশংসাসূচক লিপি অঙ্কিত করিবে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই যুক্তি অনুসারে শঙ্কর ৭০০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

দ্বিতীয় যুক্তি§—কুমারিল ভট্ট যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ এই তারনাথ তাঁহার তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত “ভারতীয় বৌদ্ধধর্মোতিহাস” নামক গ্রন্থে (২৬শ অধ্যায়) বলিয়াছেন যে বৌদ্ধভ্রমগ্রন্থকার ধর্মকীর্তি যে সময়ে জীবিত ছিলেন কুমারলীল (অর্থাৎ কুমারিল) সেই সময়ে বর্তমান ছিলেন। এখন দেখা যায় যে ইয়রলঙের রাজা “স্রোঙ-সন-গম-পো” ৬১৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২৯ হইতে ৬৯৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজার সময় সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না; কারণ, ইনি যে চীনরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার সময়ঃ পুরীকৃত রহিয়াছে। তিব্বতীয়দিগের মতে, “স্রোঙ-সন-গম-পো” রাজার রাজত্বকালে ধর্মকীর্তি জীবিত ছিলেন। আর য়ুন-চুয়ঙ ৬৪৫ খৃঃ ভারত হইতে চলিয়া যান। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধদিগের একজন পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণশত্রু কুমারিল বিজয়মান থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার গ্রন্থে ইহার নাম থাকিত। সুতরাং কুমারিল ৬৪৫ খৃঃ পূর্ববর্তী নন; আর তিনি যে ৭০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী নন তাহারও অনেক প্রমাণ আছে।

* S. I. P. p. 37 foot-note.

† S. I. P. p. 38

‡ সম্ভবস্থিতিসংহারকাণ্ডে বীতকারণঃ। হৃদ্যদভাস্তকাম্যর জগতা (৫) কামমর্দনঃ।

২ অমায়চ্চিত্রমায়োহসারগুণো গুণভাজনঃ ন ব (৭) নিরন্তরে জোয়াৎ * * * *।

৩ যজ্ঞাদৃষ্টভরাক্রান্তকৈলাসঃ সদশাননঃ (৭) চান্দ্রমগময় * * শ্রীনিধিত * * * *।

৪ ভক্তিপ্রসঙ্গং যনসা ভবং ভূষণলীলয়া দোষা চ যো ভূমৌ * * জোয়াৎ শ্রীভরচ্চিত্রম।

§ The Sāmavidhānabrāhmaṇa & by A. C. Burnell, Vol I. (1873) p. VI.

¶ Schlagintweit, Die Könige von Tibet, p. 47. and T. 1.

বার্থ তাঁহার “ভারত-ধর্ম” নামক পুস্তকে ভারতীয় দর্শন ও পুস্তকের আলোচনার
প্রসঙ্গতঃ শঙ্করের সময়ের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। তিনি বলেন,
বার্থ ১৮৮১।

সাধারণতঃ শঙ্করাচার্যকে লোকে অষ্টম শতাব্দীতে ফেলিয়া
থাকে; তবে তিনি নবম শতাব্দীর পঞ্চপাত্রী। ইহার মতে, মাধব (April-May)
মাসের ১০ই, ৭৮৮ খৃঃ এই তারিখটী শঙ্করজন্ম সম্বন্ধীয় প্রবাদ মধ্যে বিখ্যাত।[†] অতীত
প্রবাদানুসারে শঙ্কর ২য় ও ৩য় শতাব্দীর লোক। এবং দবিস্তানের গাঙ্করের মতে তিনি
চতুর্দশশতাব্দীর লোক তাহাও ইনি উল্লেখ করিয়াছেন। বার্থসাহেবের নির্দিষ্ট কালই
ম্যাক্সমুলার, ওয়েবর প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

Indian Antiquaryর একাদশভাগে কে, বি, পাঠক লিখিয়াছেন যে Weberএর
মতে শঙ্করাচার্য খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতীত
পণ্ডিতের মতে ইনি সপ্তম বা নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

এ বিষয়ে অমেক মতভেদ আছে। পাঠক মহাশয় একখানি হস্তলিখিত ত্রিপত্রের ক্ষুদ্র সংস্কৃত
গ্রন্থ হইতে শঙ্করের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন। বালবোধ অক্ষরে লিখিত এই
ত্রিপত্রখানি তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত “বেলগ্রাম”-নিবাসী গোবিন্দভট্টের নিকট পাইয়া-
ছেন। ইহার একস্থানে লিখিত আছে—

“দুষ্টাচারবিনাশায় প্রাচ্যভূতো মহীতলে।

স এ শঙ্করাচার্যঃ সাক্ষাৎ কৈবল্যানায়কঃ ॥

নিধিনাগেন্দ্ৰভবহৃদ্যে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ।

অষ্টবর্ষে চতুর্কেদান্ বাদশে সর্বশাস্ত্রকৃৎ ॥

ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যাগাৎ ॥

কল্যাণে চন্দ্রেন্দ্রাঙ্কবহৃদ্যে গুহাপ্রবেশঃ।

বৈশাখে পূর্ণিমাস্তু শঙ্করঃ শিবতামগাৎ ॥”

এই ‘নিধিনাগেন্দ্ৰভবহৃদ্যে’র অর্থ ৩৮৮৯ কল্যাণ; ‘চন্দ্রেন্দ্রাঙ্কবহৃদ্যে’র অর্থ ৩৯২১।
৩৮৮৯ কল্যাণ = ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ। নিধি = ৯, নাগ = ৮, ইন্দ্ৰ = ৮, বহি = ৩। চন্দ্র = ১,
নেন্দ্র = ২, অঙ্ক = ৯, বহি = ৩। এতদনুসারে শঙ্কর ৭৮৮ খৃঃ অব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন
বলিয়া কতিপয় পণ্ডিত বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই ত্রিপত্রগ্রন্থের মূল কি? আর কোথা
হইতেই বা ইহার বিবরণ সংগৃহীত তাহার কোন সম্ভাবজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

* The Religions of India—By A. Barth and translated by I. Wood, 1882.
p. 59 foot-note.

† Ind Studien. t, XIV. p. 353.

• † Ind. Ant. I, 361, VII, 282.

¶ Dabistan—141.

ইহাতে গুরুপরম্পরার কথা আছে বটে, কিন্তু ইহা শঙ্করাচার্য্যস্থাপিত কোন মঠের বিবরণ তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা শৃঙ্গেরী মঠ বা ইহার কোনও শাখামঠের সম্প্রদায়িক গ্রন্থ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত শৃঙ্গেরী বা কুদালী অথবা কুন্তকোণমের বিবরণের সহিত ইহার কোনও ঐক্য নাই। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙও এই প্রমাণে বিশ্বাস করেন নাই।* Indian Antiquaryর সম্পাদক পাঠক মহাশয়ের প্রদত্ত প্রমাণের সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনায় তিনি বলিয়াছেন যে অধ্যাপক টীল ১৮৭৭ খৃঃ তঁহার “প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে” উক্ত সময়ের কথা উল্লেখ করেন। তেলাঙ মহাশয় বলেন, টীল পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রীর “আর্য্যবিজ্ঞানস্থানিধি” নামক গ্রন্থ হইতে উক্ত সময়টি গ্রহণ করেন। এদিকে আর্য্যবিজ্ঞানস্থানিধির প্রদত্ত শ্লোক ও পণ্ডিত পাঠকের প্রকাশিত শ্লোকে কোনই পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্করমন্দিরসৌরভ হইতেও উক্ত সময় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তিনি কোনও গ্রন্থের নাম করেন নাই, “সম্প্রদায়বিদঃ” বলিয়াই থামিয়া গিয়াছেন।

কাউয়েল সাহেব ১৮৮২ খৃঃ তঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহাল্লবাদের উপক্রমণিকায়† শঙ্করকে কাউয়েল ১৮৮২। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন।

গফ্, ১৮৮২।

গফ্‌ও শঙ্করকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।‡

হণ্টর সাহেব ১৮৮২ খৃঃ তঁহার “ভারতসাম্রাজ্য” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে কুমারিল ভট্ট খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণভারত পর্য্যটন করেন, হণ্টর ১৮৮২।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কুমারিল তঁহার প্রসিদ্ধি শিষ্য শঙ্করাচার্য্যকে স্বীয় কর্তব্যভার সমর্পণপূর্বক স্বয়ং শঙ্করের সম্মুখে জলন্ত অগ্নিমুখে নিজ দেহ বিসর্জন করেন। শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মলবর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি কাশ্মীর পর্য্যন্ত ধর্ম প্রচার করিয়া অবশেষে হিমালয়ে কেদারনাথে দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন। (The Indian Empire, p. I95)

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগের ১৯৩ পৃষ্ঠায় শঙ্করাচার্য্যের সময় ৮ম বা ৯ম শতাব্দী বলিয়া উল্লেখ স্থির করিয়া- অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৮২।

ছেন। পরে পরিশিষ্টে (২৮৫-২৯১ পৃঃ) কয়েকটি প্রমাণ বলে স্থির করেন যে শঙ্কর খৃষ্টাব্দের ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাজ্ঞ হন। অক্ষয় বাবু প্রথমতঃ স্মৃতি দ্বারা প্রমাণ করেন যে মাধবাচার্য্য খৃষ্টাব্দের চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

* Sacred books of the East Series. Bhagabadgita, p. 27.

† Prof Tiele's History of Ancient Religions, 1877.

‡ Translation of Sarvadaršana-Saṅgraha, praface, p. viii.

§ Philosophy of Upanishads, praface, p. viii.

জীবিত ছিলেন। ‘সেই মাধবাচার্য্য নিজকৃত শঙ্করদ্বিখণ্ড উপক্রমে লিখিয়াছেন, “প্রাচীন শঙ্করজয়ে সারঃ সংগৃহ্যতে স্কট্‌ন।” অর্থাৎ প্রাচীন শঙ্করজয়গ্রন্থের সারসংগ্রহ হইল এবং “স্ততোহপি সম্যক্ কবিত্তিঃ পুরাণৈঃ।” অর্থাৎ অল্প অল্প প্রাচীন কবি শঙ্করাচার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য তিন চারি শত বৎসর পূর্বের লোক না হইলে প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না। - অতএব শঙ্করের চরিত্রচরিত্রতা পণ্ডিতগণ যদি এইরূপ প্রাচীন হইলেন, তাহা হইলে, তিনি ৮৯ শত বৎসর অপেক্ষা অপ্রাচীন নহেন। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজ অবৈতবাদের প্রতিবাদ করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। এ প্রমাণে ও শঙ্কর ১১শ শতাব্দীর লোক অপেক্ষা অপ্রাচীন হইতে পারেন না। শঙ্করের সমকালবর্তী আনন্দগিরি ভট্টের অর্থাৎ কুমারিল ভট্টের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর কুমারিলের উত্তর কালীন লোক। কিন্তু, আনন্দগিরি ভট্ট ও শঙ্করকে সমকাল-বর্তী বলিয়া বর্ণন করেন।

চীন দেশীয় ভীর্থবাঙ্গী হিউন্‌ সঙ্ (যুয়ন-চুয়ঙ্) যখন শঙ্করের উল্লেখ করেন নাই, তখন শঙ্কর তাঁহার উত্তরকালীন। অতএব প্রতীয়মান হইল, শঙ্কর এক দিকে খৃষ্টাব্দের ৭ম শতাব্দী ও অপর দিকে ১১শ শতাব্দী এই উভয় কালের মধ্যবর্তী।

(২য়) অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন যে শঙ্কর সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে খ্রীঃ মতে প্রচার করেন, এটা মলবারের একটা প্রবাদ।

(৩) তিনি আরও লিখিয়াছেন যে কেরলোংগড়ির মতে মলবারের শাসনকর্তা শিশু-রাম যে সময় কৃষ্ণরাওকে পরাজয় করেন, সে সময়ে শঙ্করাচার্য্য বিজয়মান ছিলেন। এটা নূনাধিক সহস্র বর্ষপূর্বের ঘটনা। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যও ঐ সময়ের ব্যক্তি।

(৪) রামমোহন রায় শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যপরম্পরার সংখ্যা গণনা করিয়া তাঁহাকে ঐ সময়ের লোক বলিয়া বিবেচনা করেন।

(৫) অতঃপর, তিনি লিখিয়াছেন যে কেরলোংগড়ির অনুবাদগ্রন্থে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য মলবারের অধিপতি চেরমান পেরুমালের সময়ে বর্তমান ছিলেন। Asseman-mus এর মতে চেরমান-পেরুমাল মলবারের অন্তর্গত কোলকোহু (Calicut) নগর পত্তন করেন। Scaliger এর মতে ৯০৭ এবং Vischerus এর মতে ৮২৫ খৃষ্টাব্দে ঐ নগর নির্মিত হয়। তিনি বলেন যে অপরূপ যুক্তিবিচার করিয়া এই শেথোক্ত সময়ের সহিত শঙ্করকালের ঐক্য আছে।

(৬) শঙ্করদ্বিখণ্ডে লিখিত আছে, শঙ্কর কাশ্মীর গমন করিয়া বিপক্ষদিগকে জয় করিয়া সরস্বতীপীঠে বাস করেন। রাজতরঙ্গিনীতেও ইহার অনুরূপ একটা বিবরণ আছে। ললিতাদিত্যের রাজত্বের (৭১৫-৭৫১ খৃষ্টাব্দ) শেষ ভাগে কতকগুলি ভীর্থবাঙ্গী সরস্বতীপীঠ দেখিবার জন্ত এবং ধর্মমতের অনৈক্যবশতঃ ঘোরতর যুদ্ধ করেন। সম্ভবতঃ শঙ্কর ও তৎশিষ্য সম্প্রদায় বিবাদের এক পক্ষ। রাজতরঙ্গিনীতে ইহার “গৌড়োপজীবী

বলিয়া খ্যাত। বোধ হয় শঙ্করের সঙ্গে অনেক গোড়ীয় শিষ্য ছিল, অথবা অল্প কোন কারণে তাঁহাদের জাতীয় নাম পরিবর্তিত হইয়া লেখকের কর্ণগোচর হয়। বলিতাদিত্য যখন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজ্য করেন, তখন শঙ্করাচার্য্যও সেই সময়ে বর্তমান ছিলেন। অতীত প্রমাণ ও ইহার অস্বকূল।

(৭) অক্ষয় বাবু মলবর দেশে প্রচলিত এবং শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত একটা শঙ্কর উল্লেখ করিয়াছেন, শঙ্করীর নাম “আচার্য্যবাগভেজা”। প্রবাদ আছে, মলবরে শঙ্করাচার্য্য নুতন আচার ব্যবহারপ্রণালী সংস্থাপন করেন, তৎকালে ঐ শঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ শঙ্কর অনুমান সাড়ে দশ শত বৎসর অতীত হইয়াছে ; সুতরাং, শঙ্কর ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন।

মাননীয় কাম্বিনাথ ত্রাযক তেলাঙ, একজন অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ইনি ১৮৮৪ খৃঃ Indian Antiquaryতে* শঙ্কর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ম্যাক্সমুলার,† পাঠক, বার্থ,‡ বিটানে বলিয়াছেন ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ভারতভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন। পণ্ডিত তেলাঙ, তাঁহাদের প্রমাণ যে সমস্ত যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, সে গুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

(১) ব্যাসপ্রণীত বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের সপ্তদশ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—“নহি দেবদত্তঃ ক্ষয়ে সন্নিধীয়মানস্তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিধীয়তে যুগপদনেকজবুত্তাবনেকত্র প্রসজাদেবদত্তবজ্জদত্তয়োরিব ক্ষয়পাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ।” অর্থাৎ যে দিন দেবদত্ত নামক পুরুষ ক্ষয়ে বিজ্ঞমান ছিলেন, সেই দিন সেই পুরুষই কখনও পাটলিপুত্রে থাকিতে পারেন না। কেন না, একই সময়ে একাধিক স্থানে বাস হইলে পুরুষও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন হইবে, যেমন দেবদত্ত ও বজ্জদত্ত ক্ষয় ও পাটলিপুত্রে বাস করেন। এই দৃষ্টান্ত হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে ক্ষয় ও পাটলিপুত্র নামে দুইটা নগর শঙ্করের সময়ে বিজ্ঞমান ছিল। আর এই দুইটা নগরের দূরত্বও অনেক বেশী ; এক ব্যক্তি এক দিনে এক স্থান হইতে গিয়া অন্য স্থানে থাকিতে পারে না। তাঁহার সময়ে এই দুইটা নগরের প্রকৃত অস্তিত্ব না থাকিলে তিনি এরূপ ভাবে কখনই উল্লেখ করিতেন না।§

* Ind. Ant. Vol xiii (1884), pp 95-103.

+ India, what can it teach us, pp 354-360

‡ Ind. Ant. Vol. xi, p 263.

§ শঙ্কর, শারীরকভাবে অজ্ঞ (Bibl. Ind. ed. p. 1093) ক্ষয়, পাটলিপুত্র ও মথুরার উল্লেখ এক সঙ্গে করিয়াছেন। ইহা দ্বারা উপরি উক্ত যুক্তি বলবত্তর হইয়াছে। অবশ্য, এরূপও বলিতে পারা যায় যে পতঞ্জলি যেমন তাঁহার মহাভাষ্যে ক্ষয়, পাটলিপুত্র ও মথুরার উল্লেখ করিয়াছেন (Ind Ant. Vol IV. p. 245 ত্রুটব্য) শঙ্করও দৃষ্টান্তরূপে তাহাই করিয়াছেন। (মহাভাষ্যের উদাহরণ সম্বন্ধে Ind. Ant. Vol VI, p. 353 ত্রুটব্য)। কিন্তু, উপরি উক্ত দৃষ্টান্তটা পতঞ্জলির অনুসরণে উদ্ধৃত হয় নাই—এটা শঙ্করের বিশেষ যুক্তির প্রয়োজনের উপযোগী বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ পতঞ্জলির সময়ে পাটলিপুত্রের অস্তিত্ব ছিল (Ind. Ant. Vol. I, p. 311) কিন্তু শঙ্করের সময়ে ছিল না।

আমরা ইতিহাস পাঠে অবগত আছি যে পাটলিপুত্র ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বন্টার জলে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই ইতিহাস-প্রমাণ হইতে স্থির হইতেছে যে শঙ্করাচার্য্য ৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে যে শঙ্করের আবির্ভাব হইতে পারে না তাহাও ইহা দ্বারা নির্ণীত হইতেছে। কেন না, তাহা হইলে শঙ্করের সময়ে পাটলিপুত্রের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না।

(২) শঙ্করের সময় নিরূপণপক্ষে তেলাঙ্ আরও বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“সতো হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ন সদসতো-রসতোৰী। অভাবস্ত চ নিরূপাখ্যাত্বং প্রাপ্তংপত্তেরিত মর্যাদাকরণমুপপন্নম্। সত্যং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীমাং মর্যাদাদৃষ্টা নাভাবস্ত। ন হি বক্ষ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্-পূৰ্ণবর্ষগোহভিষেকাদিত্যেবং জাতীরকেন মর্যাদাকরণেন নিরূপাখ্যো বক্ষ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি ভবিষ্যতীতি বা বিশেষ্যতে।”* অর্থাৎ দুইটি সম্বন্ধের সম্বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু সম্বন্ধের সহিত অসম্বন্ধ কিংবা দুইটি অসম্বন্ধের সম্বন্ধ অসম্ভব। অতএব প্রাপ্তংপত্তির মর্যাদাকরণ সম্ভব নয়। সংসারে (সদস্য) কৃষিগৃহাদিরই মর্যাদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অভাব পদার্থের মর্যাদা নাই। পূর্ণবর্ষ্যার অভিষেকের পূর্বে বক্ষ্যাপুত্র রাজা হন নাই, হইতেছে না বা হবেনও না।†

শঙ্করাচার্য্য এই উদাহরণটি দিয়াছেন; অবশ্য এখানে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে পূর্ণবর্ষ্য নামে তৎকালে একজন রাজা ছিলেন। ইনি দেবদত্ত প্রভৃতির দ্বারা সামান্য লোক ছিলেন না। যদি বর্ষ্যনামাখ্য রাজাদের তালিকা দেখা যায় তাহা হইলে বনবাসি-কদম্ব, বেঙ্গিপুত্র-শল্লব, মহোদ-চন্দেল, মগধ-মৌখরি, কাশ্মীরোৎপল এবং অন্যান্য বংশের একরূপ নামের অপরপর রাজাদের নামের তালিকায় পূর্ণবর্ষ্য নামধেয় দুইজনমাত্র পাওয়া যায়। দুইখানি ‘মবদীপের’ তাম্রলিপিতে এক পূর্ণবর্ষ্যার নাম দেখা যায়। ইনি অল্প কোন পূর্ণবর্ষ্য। কেননা, ভারতবর্ষীয় কোনও ভাষ্যাদিতে এই রাজার নামগন্ধ পাওয়া যায় না। অপর পূর্ণবর্ষ্যার নাম চৈনিক তীর্থযাত্রী য়ুন-চুয়ঙ্ উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি পশ্চিম-

* বিখ্যাত চৈনিক পুরাতত্ত্ববিদ মার্তোয়ালীলের লিখিত ভারতবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার প্রবল স্রোতঃপ্রবাহে পাটলিপুত্র গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায় :—

Burgess এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রমাণ দিয়াছেন, সেগুলি এই—Cunningham's Arch. Surv. Rep. vol viii, pp Xiii, 20ff; vol XI, p. 154ff; J. R. A. S. vol, vi.p. 449; J. A. S. B. vol. xvii, p. 35. অল্প সম্বন্ধে Cunningham's A. S. R. vol I, p. 162; vol II, p 226; his Ancient Geogrophy, p. 345, 452; Barhut Stupa, pp 3, 15; গাণিনি, ১৭২৫; ২১১২৪; ৪৩২৫, ৮৬; বরাহমিহির-বৃহৎসংহিতা—১৩২১; Hall's Vasavadatta, p. 51; Beal's Buddh. Record of the West: world, vol. I.p. 189.

† শারীরকভাষ্য P. 53. (Bibl. Ind., Ed.).

মগধের নরপতি ছিলেন। আর মাধবাচার্য্যের ‘শঙ্করদ্বিধিজয়’ হইতেও জানা যায় যে ‘ভাষ্য’ রচনার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে শঙ্কর বারাণসীতে অবস্থিতি করিতেন—নির্জন বদরিকাশ্রমে কেবল তিনি ভাষ্য লিখিবার জন্তই বাস করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই শঙ্করের পূর্ণবর্ষ্যার উল্লেখের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। প্রায়ই ইহার সহিত দ্বিতীয় পূর্ণবর্ষ্যার আলাপ হইত; আর কাশী বিদ্যার আদ্য পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত থাকায় ভগবানের এইখানে বাস করাও সম্ভব হইতে পারে। আপাততঃ দৃষ্টিতে বোধ হয়, আনন্দগিরি শঙ্করদ্বিধিজয়ে লিখিয়াছেন যে শঙ্কর দক্ষিণদেশে পরিত্যাগের পূর্বে ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হইতে গমনের কথায় তাঁহার দ্বিধিজয়যাত্রার কথাই দ্যোতিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য এই বাগ্‌যুদ্ধারম্ভের পূর্বে তাঁহার কাশীধাম দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং আনন্দগিরি বা মাধবের উক্তিতে বিরুদ্ধতাব কিছুই লক্ষিত হয় না। M. Barth তাঁহার পুস্তকে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য রচনা দক্ষিণদেশে সম্ব্যটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার মতের স্বপক্ষে কোন যুক্তি দেন নাই। একরূপ স্থলে যখন দুইখানি গ্রন্থের ঐক্য বিদ্যমান এবং যখন বুকের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত কাশী বিহার আদ্য পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত, তখন ভগবানের এইখানে অবস্থিতিই সম্ভব। বিশেষতঃ, তেলাঙ বলেন যে তিনি যতদূর শঙ্করের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গ্রন্থে কোথাও তিনি দক্ষিণদেশের ব্যক্তি বা স্থানের ইঙ্গিত দেখেন নাই; উপরি লিখিত বাক্য বিদ্যাচলের উত্তরদিকের স্থানকে বুঝাইতেছে। বাহা হউক, এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পূর্ণবর্ষ্যার রাজ্যাভিষেকের পরে শঙ্করভাষ্য লিখিত হইয়াছিল এবং তাঁহার রাজ্যাশাসনকালে ভাষ্য প্রণীত হইয়া সর্বপ্রথম সাধারণে প্রচলিত হয়। তেলাঙ বলেন, তাঁহার নিকট যে সমস্ত প্রমাণ আছে তাহাতে তিনি শঙ্কর ও পূর্ণবর্ষ্যাকে সমকালিক বলিতে পারেন এবং পূর্ণবর্ষ্যার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার ভাষ্যের অন্ততঃ প্রথম অধ্যায়ও যে লিখিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

তিনি বলেন—(১) বর্তমান নরপতিকে ত্যাগ করিয়া বিগত নরপতির উপলব্ধির কোনও নির্দিষ্ট কারণ না থাকায়, ‘পূর্ণবর্ষ্য’ এই নামোল্লেখমাত্রই তিনি উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (২) প্রায় ঐতিহাসিক জ্ঞানবর্জিত ব্যক্তিদিগের নিকট বিদ্যমান নরপতির উপপত্তির জন্ত তিনি যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা নিরুপাখ্যাত্ত্বারা অসম্ভববলীয়তার কারণস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছে। (৩) ঐ সিদ্ধান্তে তেলাঙের তৃতীয় যুক্তি এই, শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্মবিরোধী এবং পূর্ণবর্ষ্য বৌদ্ধধর্মসংরক্ষণে যথেষ্ট যত্নশীল; শঙ্কর যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বীকে ছাড়িয়া পূর্ণবর্ষ্যাকেই দৃষ্টান্ত দিবেন তাহাতে শঙ্করের সতিত পূর্ণবর্ষ্যার যে কোন সংস্রব ছিল তাহা দ্যোতিত হইতেছে। তেলাঙের মতে ইহার রাজত্বকালেও ইহার রাজ্যে শঙ্কর প্রভুত্ব হইয়াছিলেন একরূপ অনুমান করিলে পূর্ণবর্ষ্যার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পাওয়া যায়

পূর্ণবর্ষা-সম্বন্ধে তেলাঙ, চীনতীর্থযাত্রী য়ুন-চুয়ঙের মতের আলোচনা করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক বলেন, রাজা শশাঙ্ক বোধিজ্ঞান নষ্ট করিলে পূর্ণবর্ষা তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই বোধিজ্ঞান নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্ত তিনি তাহার চতুর্দিকে ১৬ হস্ত উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। য়ুন-চুয়ঙ, এই প্রাচীর স্বচক্ষে দেখিয়া পূর্ণবর্ষার কীর্তি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই শশাঙ্কই চীনপরিব্রাজকের কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক। কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনও হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। য়ুন-চুয়ঙ, শিলাদিভোর সভায় ছিলেন। স্মৃত্যায়, পূর্ণবর্ষাও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ পরিব্রাজক পূর্ণবর্ষাকে অশোক-রাজবংশীয় শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মোর্যাবংশের নাম-তালিকায় কিন্তু পূর্ণবর্ষার নাম পাওয়া যায় না। পূর্ণবর্ষাকে মোর্যাবংশের শেষ নৃপতি বলিয়া ধরিলে, তিনি অন্ততঃ ১৮৩ খৃঃ প্রাচীন হইবেন। হইতে পারে চীনপর্বাটকের মোর্যাবংশের পরিচয়টা ভুল।

অতঃপর তেলাঙ, মহোদয় ‘শঙ্করদিগ্విజయ’ গ্রন্থ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে দণ্ডী, বাণ, ময়ূর, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির সহিত শঙ্কর সমকালিক। শ্রীমাদবীয়া শঙ্করদিগ্విజయের লিখিত আছে, শঙ্কর, বাণ, ময়ূর ও দণ্ডীর সমসাময়িক—

“ন কথাভিরবজ্জিমু প্রসিক্কান্ বিবুধান্ বাণময়ূরদণ্ডিমুখ্যান্।

শিখিলীকৃত্তর্মহাত্তিমানান্নিদ্ধভাষ্যশ্রবণোৎসুকাস্চকার।”

(নং ১৫-১৪১ শ্লোক)

Weber (ওয়েবের), Bühler (বুল্লার), Maxmuller (ম্যাক্সমুল্লার) প্রমুখ পণ্ডিতগণ দণ্ডী খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু তেলাঙ বলেন, প্রমাণান্তর দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে বাণ ও ময়ূর সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন ; ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তর্ভাগে ইহাদের চরিত্র খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তেলাঙ, বীলসাংহেবের মতাবলম্বন করিয়া বলেন, চেন (ch'en) বংশীয় রাজগণ ৫৫৭ বর্ষ হইতে ৫৮০ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যাশাসন করিয়াছিলেন। তৎকালে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যাকারিকার উপর শ্রীগোড়পাদাচার্য লিখিত ভাষ্য চীনদেশে চীনভাষায় অনূদিত হয়। এই ভাষান্তর প্রায় ৫৭০ বর্ষে সংঘটিত হয়। সেই সময়ে ভারতবর্ষে জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থের চীনদেশে ভাষান্তর সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ, গোড়পাদের দেহত্যাগের এবং তাহার ভাষান্তরের মধ্যে কতক সময় অতীত হইয়াছে ; অতএব গোড়পাদ ৫৭০ খৃঃ পূর্বের দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। গোড়পাদাচার্য ভগবদগোবিন্দযতির গুরু এবং শ্রীশঙ্করাচার্যের আচার্য ছিলেন। শঙ্করও গোড়পাদাচার্যকারিকা সমেত মাণ্ডুক্যোপনিষদের উপর স্বকৃত ভাষ্যে গোবিন্দযতি ও গোড়পাদকে “পরমগুরু পূজ্যভিপূজ্য” এই বিশেষণে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এইরূপে যদি গোবিন্দযতি ৫৭০ খৃঃ জীবিত থাকেন তাহা হইলে ঐ শিষ্য শঙ্করাচার্যকে নিশ্চয়ই সেই সময়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। এক্ষণে এইরূপ বিচারে

তেলাড় শঙ্করকে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের পরে ফেলিতে চান না। ইনি “কোঙ্গদেশ-রাজকাড়” নামক তামিল ইতিহাস হইতে নির্দেশ করিয়াছেন যে তিরুবিক্রম চক্রবর্তী শঙ্করকর্তৃক শৈবমতে দীক্ষিত হ’ন। Dowson (ডাউসন্) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহাকে দ্বিতীয় তিরুবিক্রম বলিয়াছেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকার ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে প্রাপ্ত তাম্রশাসন অবলম্বনে বলেন যে শঙ্করকর্তৃক শৈবমতে দীক্ষিত রাজা যদি প্রথম তিরুবিক্রম হ’ন, তাহা হইলে তিনি ৪র্থ শতাব্দীতে বিজ্ঞমান ছিলেন; আর যদি ইনি দ্বিতীয় তিরুবিক্রম হ’ন তাহা হইলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। আর ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন তামিল ইতিহাসকালের সহিত ঐক্য হইতেছে, তাহাই অধিকতর সঙ্গত।

এখানে দেখা যাইতেছে যে যেরূপেই বিচার করা যাউক না কেন তেলাড়ের সিদ্ধান্ত শঙ্করাচার্য্য ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের পরে কখনই আবির্ভূত হইতে পারেন না।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার কোন যুক্তির উল্লেখ না করিয়া পাঠক মহাশয়ের উদ্ধৃত ত্রিপত্র বচনের উল্লেখ করিয়া ৭৮৮ খৃঃ শঙ্করজন্মকাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন।* কিন্তু ইতঃপূর্বে তিনি শঙ্করকে ৮০০ হইতে ৯৬০ খৃঃ মধ্যবর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন (Maxmuller, Sacred Book of the East, 1884. XV. p. XII)

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ১৮৮৪ খৃঃ গণ্ডাবল্লরী নামক একখানি সংস্কৃত পুথির বিবরণে কোন গোলমালের মধ্যে না গিয়া পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের নির্দ্ধারিত শঙ্করকাল বখাৰ্খ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।† তিনি নিজে কোন সময়ের উল্লেখ করেন নাই।

রেভারেন্ড টমাস ফুলক্স শঙ্করকে ৬৫০ হইতে ৬৭০ খৃঃ মধ্যে ফেলিয়াছেন।‡ কিন্তু ইনি বলেন যে শঙ্করের কাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। ইনি তেলাড় ও ম্যাক্সমুলারের নিরূপিত সময়েরও উল্লেখ করিয়াছেন।

Indian Antiquaryর ষোড়শভাগে ফ্লীট সাহেব লিখিয়াছেন যে নেপালবংশাবলীতে লিখিত আছে—

“স্বর্গ্যবংশীয় বৃষদেবনরপতেরাজ্যশাসনকালেথবা তন্মরগাদুর্জে “কৈশিন্মাটৈঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যো নেপালে প্রাপ্তবন্তঃ। তত্র শ্রীমদাচার্য্যবসতিকালে স্বপুত্রজন্মদ্বাভেন শঙ্কর-দেব ইতি নাম কৃতম্ ইতি।”

এই বৃষদেব ভূপতি ৬১০-৬৫৫ খৃঃ জীবিত ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে শঙ্করাচার্য্য প্রায় সপ্তম শতাব্দীর আভ্যন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তেলাড় নিরূপিত

* ‘India, what can it teach us’ p. 303 “This is no doubt a very moedrn compilation and in many cases quite untrustworthy, still it may come in as confirmatory evidence.”

† Notices of Sanskrit Mss, Vol. vii, p. 17.

‡ “The Pallavas” p. 196 of J. R. A. S. (N. S.) vol XVII.

সময়ের সহিত এই সময়ের ৫০ বৎসর অন্তর দেখা বাইতেছে। ফ্রীটের মতে স্থির হইতেছে যে শঙ্করাচার্যের কাল নেপালভূপতি বুধদেবের সময়ের অপেক্ষা কখনই অধীচীন হইতে পারে না।

W. Logan, Indian Antiquaryতে* ফ্রীটসাহেবের মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে শঙ্করাচার্যের জন্মভূমিতে যে সমস্ত প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে তদনুসারে

তেলাঙ ও ফ্রীট-নির্দ্ধারিত সময় (৫৯০-৬৫৫ খৃঃ) অপেক্ষা
লগান ১৮৮৭ খৃঃ। পাঠক-নিরূপিত সময় (৭৮৮-৮২০ খৃঃ) অধিকতর অনুকূল।

তিনি লিখিয়াছেন যে কেরলোৎপত্তিতে লিখিত আছে—“এই মহাবিজয়সম্বন্ধিত যুদ্ধকালে মহাদেবের (শিবের) পুত্র-বা অবতার) স্বরূপ মহাপুরুষ জনগ্রহণ করেন। ইনি পরে শঙ্করাচার্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।” তিনি বলেন কেরলোৎপত্তি বিরুদ্ধভাবেপন্ন উক্তিতে পরিপূর্ণ। “ইহার রাজ-শাসনকালে এই ‘মহাবিজয়সম্বন্ধিত যুদ্ধ’ ঘটয়াছিল। তিনি ‘চেরমান পেরুমাল’; ইনি খৃষ্টীয় ৪২৭ অব্দে অনন্তাভি-কৃষ্ণরায়কর্তৃক কেরল সিংহাসনে স্থাপিত হ’ন।” কেরলোৎপত্তিতে আবার লিখিত আছে যে, এই চেরমান-পেরুমাল ইসলাম-গ্রহণপূর্বক মক্কাযাত্রা করিয়াছিলেন!! ষোড়শ শতাব্দীর একজন বিজয়নগরের রাজাকেও এইগ্রন্থে মক্কাযাত্রী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার নাকি হিজরার প্রথম বর্ষের প্রথম দিবসে ভবিষ্যদ্বক্তার সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। লগান বলেন যে, কেরলোৎপত্তি এরূপ দূরের গ্রন্থ হইলেও রাজার মক্কাযাত্রা প্রবাদের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয়। আরবদিগের বর্ণিত ঘটনাবলী সাধারণতঃ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা বাইতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত “তহফৎ-উল-মুজাহিদীন” নামক গ্রন্থের রচয়িতা এই প্রবাদটী উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য প্রবাদনির্ণীত কাল ভুল তাহাই দেখান। প্রবাদটী এই :—“ঠিক কোন সময়ে এই ঘটনাটী ঘটয়াছিল তৎসম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ পাওয়া যায় না; তবে এ ঘটনা যে মহম্মদের পলায়নের অনুন দুই শত বৎসর পরে ঘটয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।” তিনি আরও বলেন :—“এক্ষণে সকলেই জ্ঞানেন যে-সেই রাজা ‘জফহার’ (Zafhar) নামক স্থানে কবরিত হন। এইস্থানে তাহার কবর (tomb) সকলেই দেখিতে পাইবে; বস্তুতঃ, ইহার পূর্ণাঙ্গলের নিমিত্ত এখানে বিশেষ জনতা হইয়া থাকে। লোহিতসমুদ্রের আরবীরতীরে ইহার কবর নাই।” তাহার মক্কাগমন-প্রবাদ এখনও স্বল্প প্রবল “তহফৎ-উল-মুজাহিদীন” সময়ও সেইরূপ ছিল; অত্যাধি জিবাকুরের মহারাজকে রাজ্যাভিষেককালে “মক্কাফেত্রাদ্যা মম পিতৃব্য-

* Ind. Ant. XVI, pp 160-161—“The date of Sankaracharya”.

+ ফ্রীট সাহেবের প্রবন্ধ Ind, Antiquary XVI, ভাষ্যকারী মাসে প্রকাশিত হয় এবং লগানের প্রবন্ধ ঐ গ্রন্থে। সে মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়

† উল্লিখিত স্থানের সংস্কৃত কেরলোৎপত্তি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গমনাদিয়মংগি মংসরিধৌ স্থাপয়িষ্যামি”। লগান, জফ্‌হারের সন্নিকটবর্ত্তী স্থাননিবাসী একজন আরবীরের নিকট সংবাদ পান যে, কোন হিন্দুগতস্থ মলবারনৃপতি মহম্মদীয় মন্ত্রীকার করিয়া অবতুল্ল রহিমান্ সামিরি (সামিরি=সমরিতন্=বৎসতরপূজাকারী ; কোরাণ, ২০) এই নাম গ্রহণপূর্ব্বক জফ্‌হারে মৃত ও পোরস্থ হন। আজও তাঁহার সমাধিদানের শিলায় লিখিত আছে, “এই ব্যক্তি হিজরা ২১২ বর্ষে জফ্‌হারে উপস্থিত হন এবং হিজরা ২১৬ বর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়।” এই দুইটি হিজরা বর্ষ ৮২৭-২৮ এবং ৮৩১-৩২ খৃঃ। এই ঘটনাটি সত্য কি না জানিবার জন্য লগান সাহেব এডেন ও অন্যান্য স্থানে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হুঃখের বিষয় কোন ফল হয় নাই। লগান বলেন, এই সংবাদ সত্য হইলে চেরমান-পেরুমাল অনুান ৮২৭ খৃঃ অব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া যান। এই ৮২৭ খৃঃ যে ঠিক সময় তৎসম্বন্ধে তাঁহার অল্প যুক্তি এই যে মলয়ালীদের কোল্লমান্দ ৮=৫ খৃঃ ২৫শে আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হয়। তাঁহার মতে চেরমান-পেরুমালের মত প্রতাপশালী রাজার সিংহাসনত্যাগের ছাত্র বিশেষ ঘটনায় এই অবসারস্থ হইয়াছিল। অধিকন্তু, “তহফৎ-উল্ল-মুজহিদীন” এবং যে কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি লগান সাহেব দেখিয়াছেন, সকল গুলিতেই লিখিত আছে যে চেরমান-পেরুমাল জফ্‌হারে গমন করিবার পূর্বে কয়েকদিন আরবীয়-ভীরস্থ জফ্‌হারে অবস্থান করিয়াছিলেন। লগান বলেন যে ইহা হইতে স্বতঃ অসূমান যে খৃষ্টীয় ৮২৫ অব্দের শেষভাগ ও খৃষ্টীয় ৮২৭ অব্দের মধ্যে তিনি শহরে বাস করেন।

এখন অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, মলয়ালী প্রবাদ অনুসারে শঙ্করাচার্য্য যখন চেরমান-পেরুমালের সমসাময়িক, তখন তিনি নবম শতাব্দীর প্রথমাংশে বিজয়মান ছিলেন।

পণ্ডিত এন্‌ ভাষ্যাচার্য্য তাঁহার মৃত্যুর একমাস পূর্বে বহু পরিশ্রমসহকারে শঙ্করের কালনির্ণায়ক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ ‘থিওসফিষ্ট’-নামক* পত্রে প্রকাশ করেন। এই

প্রবন্ধের প্রথমাংশে তিনি শঙ্করবিষয়ক কয়েকটি প্রচলিত প্রা-

ভাষ্যাচার্য্য ১৮৮২।

দের সত্যাসত্য বিচার করিয়া স্থির করেন যে প্রবাদগুলির

উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করের কালনির্ণয় অসম্ভব। তবে অধিকাংশ প্রবাদই যখন মল-বরের অন্তর্গত কালাডীকে এই অদ্বিতীয় দার্শনিকের জন্মভূমি বলিয়াছে, তিনিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহার দ্বিতীয়াংশে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে শ্রীরামানুজা-চার্য্যের সময়কে গণনার ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তিনি দেখাহতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শঙ্করকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের কখনই পরবর্ত্তী হইতে পারে না। তৃতীয়াংশে তিনি শঙ্করভাষ্যাদি-বর্ণিত উপবর্ষ, দ্রমিডাচার্য্য, হৃত্তিকার, প্রভাকর, ও জৈথরকৃষ্ণের কাল-নিরূপণ দ্বারা স্থির করেন যে শঙ্কর কখনই ৬৫০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী ন’ন। অতঃপর, তিনি তেলাঙ্কর্ভূক শঙ্করভাষ্যোদ্ধৃত বচন অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করেন যে শঙ্কর কখনই ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের (অর্থাৎ ৫৯০ খৃষ্টাব্দের) পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

* Theosophist, Nov, 1880, Jan.—Feb, 1890.

মনির উইলিয়মস তাঁহার “ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দুধর্ম” নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন
 মনির উইলিয়মস ১৮৯১ খ্রিঃ যে শঙ্করাচার্য্যই ব্রাহ্মণ্য মতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা—তিনি কেরল-
 (মলবর) বাসী এবং খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।* তাঁহার আর এক
 খানি পুস্তকে তিনি শঙ্করের সময় দিয়াছেন ৬৫০-৭৪০ খৃষ্টাব্দ।†

পুণ্যপতনে ভোম দিবসে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৬ শে এপ্রেল তারিখে “পিনাকি” নাম চিহ্নিত
 ‘কেশরী’ ১৮৯৮ একটা লিপি দেখা যায়। ইহাতে শঙ্করস্থাপিত মঠবৃত্তান্ত
 প্রদত্ত হইয়াছে এবং জন্মকালও লিখিত হইয়াছে। দ্বারাবতী মঠে প্রাচীন লিপিকত-
 বৃত্তান্ত :—

“যুধিষ্ঠিরশকে ২৬০১ বৈশাখতরুপকমাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ।

যুধিষ্ঠিরশকে ২৬০৬ চৈত্রশুক্লনবম্যাং তিথিবৃন্দনয়নম্।

“ “ ২৬০৯ কার্তিক শুক্লৈকাদশ্যাং চতুর্থাশ্রমস্বীকরঃ।

“ “ ২৬৪০ ফাল্গুন-শুক্লদ্বিতীয়ায়্যাং গোবিন্দপাদাঙ্গপদেশঃ।

তত আরভ্য ২৬৪৬ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ ৩০ পর্য্যন্তঃ বদর্য্যশ্রমে ষোড়শভাষ্যপ্রণয়নম্।

যুধিষ্ঠিরশকে ২৬৪৭ মার্গ কৃষ্ণদ্বিতীয়ায়্যাং মণ্ডনেন সহ বাদারম্ভঃ।

“ “ ২৬৪৮ চৈ, শু, ৪ মণ্ডনপরাজয়ঃ।

“ “ ২৬৪৯ চৈ, শু, ৯ মণ্ডনমিশ্রতোত্তমশ্রমগ্রহণম্।

“ “ ২৬৫০ চৈ, শু, ৩ দ্বিধ্বজয়মহোৎসবারম্ভঃ।

“ “ ২৬৫৪ পৌ, শু, ১৫ হস্তামলকাচার্য্যায়্য শৃঙ্গপুরীঠেহভিষেচনম্।

... ..

“ “ ২৬৬৩ কা, শু, ২৫ নিখিলজগৎস্বাক্ষরকো ভগবান্ শঙ্করো ব্রহ্মদ্ব্যতীর্থ্যে
 নিজ শরীরেণৈব বিমানমাস্থায় কৈলাসং জগান। ইত্যাদি”

... ..

এই বৃত্তান্তানুসারে দেখা যাইতেছে—যে, শঙ্করাচার্য্য ২৬০১ যুধিষ্ঠির-শকে অবতীর্ণ হইয়া-
 ছিলেন অর্থাৎ শালিবাহন শকারন্তের ৫৫৭ বর্ষ পূর্বে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

কেরল-কোকিল নামক মাসিক পুস্তকের পঞ্চম ভাগ পঞ্চম অঙ্কে লিখিত আছে যে
 কেরল-কোকিল। শঙ্করাচার্য্য ২২ সংবতে শৃঙ্গগিরিতে সুন্দর মঠ নিৰ্ম্মাণ করিয়া-
 ছিলেন। সংবৎ ৩০ বিজয় সংবৎসরে চৈত্র শুক্ল পৌর্ণমাসীতে মণ্ডনের সন্ন্যাস হয়।
 শালিবাহন শকে প্রমাধি সংবৎসরে মাঘশুক্ল দ্বাদশীতে সুরেশ্বরের সমাধি হয়।

বিজ্ঞাবিলাস ‘বিজ্ঞাবিলাস’ নামক শৃঙ্গগিরি-মঠ বৃত্তান্তপুস্তকে লিখিত আছে
 যে সুরেশ্বরাচার্য্য ৭২৫ বর্ষে সিংহাসনাধিগতি ছিলেন।

* Brahmanism and Hinduism by Sir Monier Williams, 1891, p. 55.
 Indian Wisdom, p. 58.

শূদ্রেরী মঠের একটা ছোট বাক্সে এক খানি অতি প্রাচীন পুঁথি আছে। ইহাতে একখানি পুঁথি। লিখিত আছে যে শঙ্কর গুরু বৈশাখ চান্দ্রমাসে ৫ম দিবসে ঈশ্বর সংবৎসরে ১৪ বিক্রম শকে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুঁথির মতে ৬৯৫ শক = ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণের মৃত্যু হয়।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় শারদামঠের বর্তমান আচার্য্য জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য নিখিলনাথ রায় শ্রীরাজরাজেশ্বর শঙ্করাশ্রম স্বামীর নিকট হইতে শারদামঠের আচার্য্যপদপ্রাপ্তির বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া ১৩০৬ বঙ্গাব্দে চৈত্রমাসে “সাহিত্য”* পত্রে প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বেঙ্গলীর জিপত্রোন্নিধিত† ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ভগবানের আবির্ভাব কাল তাহা খণ্ডনপূর্বক ২৬৩১-খৃষ্টিয় শকে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্ম প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৎসংগৃহীত বংশতালিকায় লিখিত আছে—“খৃষ্টিয়শকে ২৬৩১ বৈশাখগুরুপঞ্চম্যাঃ শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ।” ইত্যাদি। নিখিল বাবুর যুক্তিগুলি একে একে নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

১। উক্ত বংশাবলীর সমর্থনার্থ রাজা সুধদাপ্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন অস্তাধি স্বাক্ষরকার শারদামঠে আছে। রাজা সুধদা ভগবানের শিষ্য। তাঁহার মঠান্নগ্রাহ্যে, শঙ্করদিগ্ভজনে এবং পূর্বোক্ত বংশাবলীতেও সুধদার উল্লেখ আছে। এই তাম্রশাসনদর্শনে নিখিলবাবুর প্রতীতি হইয়াছে যে ভগবানের কৈলাসপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বেই ইহা মঠে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে ভগবানের সময় পাওয়া যাইতেছে।

২। রাজা সুধদা উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া কথিত হ'ন। সংবৎপ্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য তাঁহারই বংশের দৌহিত্র-সন্তান। রাজতরঙ্গিণীতেও এইরূপ লিখিত আছে—“তত্রৈব তরঙ্গিণ্যাং সুধদনস্তুভব পরম্পরায়াম্ নবমস্ত হি মহারাজস্তাবন্তিকায় দৌহিত্রতয়া সমা রতে বিক্রমাদিত্যঃ।”—বিমর্শ।

৩। নেপালের পার্বত্য বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা বৃষদেবের সময় শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্য হইতে নেপালে উপস্থিত হ'ন এবং বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন।† ভূমিবন্দ্য এই সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে প্রথম। তিনি ১৩৮৯ কলিযুগে বা খৃঃ পূঃ ১৭১২ অব্দে রাজা ছিলেন। চন্দ্রবন্দ্য হইতে বৃষদেবের রাজত্বকাল ১১৫৯। ভূমিবন্দ্যের রাজত্বকালের কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। যদি তাঁহার রাজত্বকালের পরিমাণ ৯০৯৯ বৎসর ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও আশ্রয় বৃষদেবের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ৯১+১১৫৯= ১২৫০ বৎসর পাই। তাঁহার রাজ্যরন্ত ১৩৮৯ কল্যাদ ধরিলে ২৬৩৯ কল্যাদে বৃষদেবের রাজ্যাবসান স্থির হয়। শারদামঠের বংশাবলীর মতে ভগবান ২৬৩১ কল্যাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে তাঁহার অষ্টম বা নবম বর্ষে নেপালে আসা স্থির হয়। কিন্তু ইহা

* ‘সাহিত্য’, ১৩০৬।

† Indian Antiquary, vol xiii, p 412.

অসম্ভব। তাহার ১০১৫ বৎসর পরে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধ পার্বত্যীয় বংশাবলীর সহিত শারদামঠের বংশাবলীর ১০১৫ বৎসর মাত্র পার্থক্য। এ পার্থক্য অক্লিষ্টকর।

৪। অতঃপর তিনি একটা আত্মমানিক প্রমাণ দিয়াছেন। শারদামঠের বংশাবলীতে এবং শঙ্করদ্বিজিয়ে দেখা যায় যে ভগবান্ কাশ্মীরমণ্ডলে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীতে তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রথম তরঙ্গের দৃষ্টান্ত ততদূর সম্পৃষ্টও নয়। অথচ এই তরঙ্গেই ভগবানের উল্লেখ থাকা সম্ভব। ইহাতে লিখিত আছে রাজা অক্ষ ২৬৪১ কলান্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হ'ন। ইহার রাজত্বকালেই ভগবানের কাশ্মীর যাওয়া সম্ভব। তাহার রাজত্বকালের বিশেষ কোন বিবরণ না পাওয়া গেলেও, তাহার পুত্র গোপাদিত্যের রাজত্বকালে কাশ্মীরের যে আভ্যন্তরীন অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাহার পূর্বে ভগবান্ কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই কয়টা প্রমাণ বলে নিখিল বাবু বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা অষ্টম শতাব্দী কখনই ভগবানের আরিভাব কাল নয়। সম্ভব মঠই এক বাক্যে খৃষ্ট জন্মের পূর্বে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবকাল নির্দেশ করিতেছে। বিশেষতঃ শারদামঠের বংশাবলীর ত্রায় অল্পতম প্রমাণ আর দ্বিতীয় নাই এবং ইহার সহিত সুখার তাম্রশাসন ও নেপালের পার্বত্যীয় বংশাবলীরও ঐক্য আছে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে মলয়ালম্ সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণমেনন* শঙ্করের কথা কৃষ্ণমেনন ১৯০০ তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত আলওয়ে নদীতীরস্থ কালাদি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নম্বুরী অর্থাৎ মলয়ালী বৈদিক ব্রাহ্মণ।

Sir Raymond West স্বর্গীয় বিচারপতি তেলাঙ্গের জীবনী প্রবন্ধে তাঁহার অধ্যয়ন ও ওয়েস্ট ১৮৯৪ বিচারপ্রণালীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন এবং তেলাঙ, যে যে যুক্তিবলে শঙ্করাচার্য্যকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর শেষার্ধ্বে ফেলিয়াছেন তাহা নিতান্ত বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া তিনি মানিয়া লইয়াছেন।†

Surgeon General Edward Balfour ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে লেখেন‡, শঙ্কর ৮ম বা ৯ম যুগোপায়ী কোষকার শতাব্দীতে আবিভূত হ'ন। চেম্বার্স প্রকাশিত কোষ মতে ঐ সময়েই শঙ্করের জন্ম; তবে ইহাতে উল্লেখ আছে যে ইনি প্রবাদানুসারের ২০০ পুঃ

* Notes on Malayalam Literature; by Krisna Menon, B. A. M. R. A. S—J. R. A. S 1900, p. 763.

† Mr Justice Telang—By Sir Raymond West, J. R. A. S. 1894, p 133.

‡ The Cyclopedia of India, and of Eastern and Southern Asia—1858 1st Ed, 1885, vol iii.

খৃষ্টাব্দের ব্যক্তি (১) A. Foucher শঙ্করকে খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করেন। ইহার মতে শঙ্করের কেরলে (মলবরে) জন্ম ও কেদারনাথে ৩২ বর্ষ বয়সে মৃত্যু। (২) Mener প্রকাশিত কোষে (৩) ঐ সময় গ্রহীত হইয়াছে। Encyclopædia Britannica গ্রন্থে শঙ্করের সময় অষ্টম বা নবম শতাব্দী ধরা হইয়াছে। (৪)

আমরা এপর্যন্ত শঙ্কর সম্বন্ধে যে মত গুলির উল্লেখ করিলাম, এই গুলিই প্রধান মত বলিয়া প্রখ্যাত। তদ্বিহ্ন, সিউয়েল (৫), কৃষ্ণস্বামী আয়ার, ভাগবতশাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিত এবং পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ত্রৈলোক্যানাথ ভট্টাচার্য্য, সখারাম গণেশদেউঙ্কর, মহাগোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, নগেন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্রনাথ বিত্তানিধি, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গীয় সুদী, পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক স্বীয় মত নিজগ্রন্থে বা প্রবন্ধাদিতে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে সেই মত গুলির পৃথক সমালোচনা নিম্নয়োজন। খ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউঙ্কর (৬) কৈলাসচন্দ্র সিংহ (৭) বিজয়চন্দ্র মজুমদার (৮) এবং নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের (৯) প্রবন্ধে গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় আছে। অতীত লোকের প্রবন্ধাদিতে স্বীয় মত মাত্র উল্লিখিত আছে।

শঙ্করের প্রকৃতি আবির্ভাবকাল

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ সময়টী শঙ্করের আবির্ভাবকাল তাহা স্থির করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এত আলোচনা করিয়াছেন যে একজন সত্যাত্মসন্ধিৎসুর পক্ষে সত্যনির্ধারণ সহজ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা শঙ্করের কাল-নিরূপণে এই ৪টা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি।

১। কাহারও মতামত প্রমাণ মনো গণ্য হইবে না।

২। যতদূর পারা যায় শঙ্করের সময়ের পুস্তকাদি হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে।

৩। প্রাচীন বা দূরবর্তী কালের পুস্তকাদিলব্ধ উপকরণগুলিকে সহযোগী প্রমাণ মনো গণনা করা হইবে।

(১) Chamber's Encyclopedia, 1895

(২) La Grande Encyclopedia, Tom. xxix,

(৩) Mener's Konversation, Lexikon, vol. 17 on Wedanta system, 1893

(৪) Vol iv, p 420 under Brahmanism 1st vol 1875.

(৫) Sketch of the Dynasties of Southern India, p 57.

(৬) ভবুবোধিনী, ১৩০০

(৭) ভারতী, ১২৯৯

(৮) নব্যভারত, ১৩১০

(৯) কৃষ্ণভূমি, ১২৯৮

৪। বাহা অধিকাংশ স্থলে মিলিবে, তাহাই গ্রাহ্য।

প্রথমতঃ, শঙ্কর ও শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বর নিজ নিজ গ্রন্থে ধর্মকীর্তির নাম ও বাক্য, এবং কুমারিলের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

শঙ্করকৃত উপদেশ-সহস্রীভাষ্য (শ্লোক ১৪২, Bibl. Indica, pp 50, 53, শঙ্করভাষ্য।) —

“অভিনোহপি হি বুধ্যাত্মা বিপর্যাসিতদর্শনৈঃ।

গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥”

আনন্দজ্ঞানভাষ্য—“কীর্তিবাক্যমুদাহরতি। অভিনোহপি হি বুধ্যাত্মা” ইত্যাদি।

কুমারিলের উল্লেখ—উপদেশ-সাহস্রী ১৯০-১৪০ শ্লোক।

সুরেশ্বর—বৃহদারণ্যকবাস্তিক ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধর্মকীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

“তিষ্ঠেব ত্ববিনাভাবানি যদ্ ধর্মকীর্তিনা।” ইত্যাদি

দ্বিতীয়তঃ—কুমারিল নিজ গ্রন্থে দুই বার ভর্তৃহরির “বাক্যপদীয়” হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“অন্ত্যর্থঃ সর্বশব্দানামিতি প্রত্যাখ্যানকণম্।

অপূর্বদেবতাস্বর্গৈঃ সমমাহর্গবাদিষু ॥”

এইটা বাক্যপদীয়ের (১৮৮৭ খৃঃ অব্দে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত) ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কাণ্ডের শ্লোক ও কুমারিলের ‘তত্ত্ববাস্তিকে’র (কাশী হইতে প্রকাশিত) ২৫১ ও ২৫৪ পৃষ্ঠা মিলাইয়া দেখুন।

তৃতীয়তঃ—ইং-সিঙ্ নিজ গ্রন্থে ধর্মকীর্তিকে তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন এবং ভর্তৃহরিকে তিনি তাঁহার অপেক্ষা ৪০ বৎসরের পূর্ববর্তী লোক স্বীকার করিয়াছেন। ইং-সিঙের সময় ৬৯৪ খৃষ্টাব্দ। সুরতাং ভর্তৃহরির সময় ৬৫৪ খৃষ্টাব্দ।

উল্লিখিত কয়টা কথাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এগুলি শঙ্করের সময়ের পুস্তকাদি লক্ষ্য, এগুলি প্রবাদ নয়, কাহারও মতামত নয়। এগুলিতে কল্পনার লেশমাত্র নাই। সুরতাং এ গুলি হইতে যে সত্য বাস্তব হইবে, তাহা প্রবলিয়া মানিয়া লইতে পারি। উল্লিখিত তিনটা উক্তি হইতে আমরা নিঃসন্দেহ রূপে জানিলাম যে,—

(১) শঙ্করের ৩২ বৎসর জীবন। ধর্মকীর্তি, কুমারিল ও ভর্তৃহরি পূর্বে নয়।

(২) এবং ইং-সিঙের সময় ৬৯৪ হইতে ৪০ বৎসর পূর্বে একজনের জীবিতকাল পরিমিত সময়ের পূর্বে নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি—দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে জিনসেন নামে একজন পণ্ডিত বিজ্ঞান ছিলেন। তাঁহার সময় ৭০৫ শকাব্দ বা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ।* তিনি

* “শাক্যবজ্রশক্ত্যুপদেশ দ্বিশং পঞ্চোত্তরেষু ভাষ্যে।

প্রাপ্তঃ জৈনসেনকবিদা লাভায় বোধঃ পুনঃ ॥” (জৈন হরিবংশ)

‘আদিপুরাণ’ নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার ঐ পুস্তকে শ্রীপালের নাম আছে। শ্রীপাল জিনসেনের উক্ত পুস্তকের টীকায় নিজ সময় ৬৫৯ শকাব্দ (বা ৭৩৭ খৃষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন।† সুতরাং, শ্রীপাল ও জিনসেন সমসাময়িক বলিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আর, ৭৩৭ হইতে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে ৪৬ বৎসর তাহার অধিকাংশ সময় যে উভয়ে জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

এই জিনসেন—অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ, ও প্রভাচন্দ্র পণ্ডিতের নাম নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন। যথা—

“ভট্টাকলঙ্কশ্রীপালশাক্তকেশীরিণাং গুণাঃ।

বিদ্বাং হৃদযাকৃতা হারয়ন্তেতি নির্ঘলাঃ॥” আদিপুরাণ।

কিন্তু ইহারা যে তাঁহার সমসাময়িক তাহা কোথাও লেখা নাই, কিংবা অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ বা প্রভাচন্দ্র তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে জিনসেন বা শ্রীপালের নামও করেন নাই। সুতরাং সিদ্ধ হইতে পারে যে, ইহারা জিনসেনের পূর্বে বর্তমান ছিলেন; তবে কত পূর্বে তাহা বলা যায় না।

অতঃপর দেখাইতে হইবে যে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই তিন ব্যক্তি সমসাময়িক। প্রভাচন্দ্র যে অকলঙ্কের শিষ্য তাহা আমরা প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থেই দেখিতে পাই, যথা—

‘বোধঃ কোপ্যসমঃ সমস্তবিষয়প্রাপ্যাকলঙ্কং পদম্।’ (ত্ৰায়কুণ্ডচন্দ্রোদয়)

এ দিকে আবার বিদ্যানন্দের নাম প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রভাচন্দ্র, মাণিক্যানন্দীর “পরীক্ষাপ্রমুখ” গ্রন্থের ‘প্রমের-কমলমার্ভণ্ড’ নামী টীকায় লিখিয়াছেন—

“সিদ্ধিং সর্বজনপ্রবোধজননং সত্ত্বোকলঙ্কাশ্রয়ম্।

বিদ্যানন্দসমস্তভদ্রো গুণতো নিত্যং মনোনন্দনম্॥”

(প্রমেরকমলমার্ভণ্ড, পৃঃ ১১৬।)

বিদ্যানন্দ আবার অকলঙ্কের নাম নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

“শ্রীমদকলঙ্কবিবৃত্যং সমস্তভদ্রোক্তিমাত্র সংক্ষেপাৎ।” (অষ্টসাহস্রী ১৬শ অধ্যায়)

প্রভাচন্দ্র মাণিক্যানন্দীর গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র অকলঙ্কের শিষ্য। বিদ্যানন্দ অকলঙ্কের নাম করিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র বিদ্যানন্দের নাম করিয়াছেন। মাণিক্যানন্দী অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের নাম করিয়াছেন।

† “একোনব্বট্ঠিসমখিকব্বট্ঠশতাব্দেবু শকনরেন্দ্রভ।

সমভীভেষু সমাপ্তা জয়ধবলটীকা প্রাকৃতব্যাখ্যা॥”

* * * শ্রীপাল-সম্পাদিতা জয়ধবলটীকা।

সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত হইল যে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই তিন জনই সমসাময়িক। তা'রপর দেখিতে পাই, নীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে কুমারিল অকলঙ্ককে আক্রমণ করিয়াছেন।

আবার বিদ্যানন্দ কুমারিলকে আক্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, কুমারিল অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের সমসাময়িক।

বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরচাৰ্য্যের বৃহদারণ্যকভাষ্য-বাস্ত্বিক গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরের পূর্ববর্ত্তী হইতে পারে না। এদিকে সুরেশ্বর শঙ্করের শিষ্য। সুতরাং শঙ্করও বিদ্যানন্দের পরে হইতে পারেন না। পূর্বেই বলিয়াছি, শঙ্কর কুমারিলের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন অর্থাৎ শঙ্কর কুমারিলের পূর্ববর্ত্তী ন'ন। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে শঙ্কর, সুরেশ্বর, কুমারিল, অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই ছয় জনই সমসাময়িক। ইহা তাঁহাদের নিজ নিজ পুস্তক হইতে প্রমাণিত। ইহা হইতে বলবত্তর প্রমাণ আর হইতে পারে না। কেবল যে গ্রন্থের শ্লোক দেখিয়া ইহা সিদ্ধ, তাহা নহে। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের নাম পর্য্যন্ত করিয়াছেন। সমসাময়িক না হইলে পরস্পর পরস্পরের নাম কখনই উল্লেখ করিতে পারেন না। এক্ষণে আমরা কি পাইলাম, তাহাই দেখা যাক্। এক দিকে দেখিতেছি, ইং-সিঙ্-ভর্তৃহরির মৃত্যুকাল নিজ গ্রন্থে লিখিয়া যাওয়ায় ভর্তৃহরির সময় ৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতেছে। কুমারিল ভর্তৃহরির বাক্য উদ্ধৃত করায় কুমারিল ৬৪০ খৃষ্টাব্দের যে পূর্ববর্ত্তী ন'ন, তাহাও প্রমাণিত হইল। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি, অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি জিনসেনের পরবর্ত্তী ন'ন। আর জিনসেনের সময় ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় তাঁহাদিগকে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী বলা যায় না। সুতরাং দেখা গেল, ৬৫০ খৃঃ হইতে ৭৮৩ খৃঃ ভিত্তর উক্ত কয়জন ব্যক্তি এককালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন ব্যবধান রহিল প্রায় ১৩৩ বৎসর। আমরা পণ্ডিত কে, বি, পাঠকের প্রবন্ধাবলী হইতে পূর্বোক্ত শ্লোকগুলি পাইয়াছি। ঐ শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে যে কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাঝেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি যে আমাদের ধ্ববাদে পাত্র তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, তিনি উল্লিখিত উপকরণগুলি পাইয়াও একটু অত্যাচার করিয়াছেন। তিনি শঙ্করকে ৭৮৮ খৃঃ দাড় করাইয়াছেন। এটা তাঁহার যুক্তির ভুল। তিনি কুমারিলকে অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের সমসাময়িক বলিয়াও শঙ্করকে কুমারিলের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বলিয়া মনে করেন। তাঁহার যুক্তি এই, কুমারিল প্রসিদ্ধি লাভ না করিলে ত শঙ্কর তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। সুতরাং, কুমারিলের ৫০ বৎসর পরে শঙ্করের কাল অনুমান করা উচিত। পাঠক-নির্দিষ্ট দ্বিতীয় কারণ এই—কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে অকলঙ্ক কৃষ্ণরাজের সমসাময়িক। দস্তিভূর্গের শিলালিপিতে কৃষ্ণরাজের সময় ৭৫৩ খৃঃ পরে এবং ৭৮৩ খৃঃ অব্দের পূর্বে পাওয়া যায়, ইত্যাদি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে গ্রন্থান্তরের তুলনায় কথাসরিৎ-

সাগর অতি আধুনিক পুস্তক। আধুনিক পুস্তকের কথায় ওরূপ সিদ্ধান্তকে অন্তর্গত করা উচিত নহে। শঙ্কর কুমারিলকে খণ্ডন করায় যদি কুমারিল শঙ্করের ৫০ বৎসর পূর্ববর্তী হইয়া পড়েন, তবে বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করায় সুরেশ্বর কেন বিদ্যানন্দকে ৫০ বৎসর পূর্বের লোক হইবেন না? আমাদের বিবেচনায় পণ্ডিত পাঠকের যুক্তির এটি দুর্বল অংশ। যাহা হউক, আমরা আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি; শঙ্কর, কুমারিল ও অকলঙ্ক ইঁহারা সমসাময়িক। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমাদের পূর্বোক্ত ঘটনা ব্যতীত যাহা কিছু এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে এবং যে যুক্তিগুলি আমরা প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলির কোনটাই শঙ্কর যে সময়ের সে সময়ের পুস্তকাদি হইতে লব্ধ নহে, অথবা যুক্তিগুলি লেখকগণের নিজ নিজ অনুমান হইতে মুক্ত নয়। সুতরাং শঙ্করকালনির্ণয়ে আমরা সেগুলির আদৌ আলোচনা করিলাম না। আমাদের সিদ্ধান্তের অন্তর্কূলে আমরা প্রধানতঃ তিনটি যুক্তি দেখিতে পাই; একে একে যুক্তি তিনটি উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম। ভবভূতির সময় স্থির হইয়াছে। তিনি ৬৯৩-৭২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেও যে বিদ্যমান ছিলেন তাহা সর্ববাদিসম্মত। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত একটি অতি প্রাচীন কালের লিখিত “মালতীমাধবে”র পৃথিতে তিনটি বচন পাইয়াছেন। তৎপ্রকাশিত বাক্যপত্রিকৃত “গৌড়বহ” নামক পুস্তকের সংস্করণে লিখিয়াছেন যে ইন্দোরের মহাদেব বেঙ্কটেশ লেনের নিকট তিনি এই পুঁথিখানির বিবরণ পাইয়াছেন। ইহাতে—

(১) ইতি শ্রীভট্টকুমারিলশিষ্যকৃতে মালতীমাধবে তৃতীয়াঙ্কঃ।

(২) ইতি শ্রীকুমারিল স্বামিপ্রসাদপ্রাপ্তবান্ধবশ্রীমহাশঙ্করাচার্য্য বিরচিতো মালতীমাধবে ষষ্ঠোহঙ্কঃ।

(৩) ইতি শ্রীভবভূতিবিরচিতো মালতীমাধবে দশমোহঙ্কঃ।

কুমারিলশিষ্যকৃত, কুমারিলশিষ্য উদ্বেকাচার্য্যকৃত এবং ভবভূতি বিরচিত এই তিন পৃথক পৃথক বচন তিনটি পৃথক পৃথক পরের পর অধ্যায়ের শেষে পাইয়াছেন। শঙ্করবিজয়ে শঙ্করশিষ্য মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরের নাম উদ্বেকাচার্য্য বলিয়া লিখিত আছে। সুতরাং বলিতে হয় শঙ্কর ৬৯৩-৭২৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভবভূতির সময় বিদ্যমান ছিলেন। “মালতীমাধব” ভবভূতিকর্তৃক সমাপ্ত হয় বলিয়াই, উহা ভবভূতির নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। উদ্বেকাচার্য্য উহা আরম্ভ করেন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ উক্ত পুঁথির তৃতীয় অঙ্কে কুমারিলশিষ্য কৃত, ষষ্ঠ অঙ্কে উদ্বেকাচার্য্য কৃত এবং দশম অঙ্কে ভবভূতি কৃত লিখিত আছে। এতদ্বারা এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে শঙ্করের ৩২ বৎসর জীবন সমাপ্তাকীর শেষ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে শেষ হয়।

দ্বিতীয়। এইবার আরও একটু বিশেষভাবে স্থির করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। জৈনগঠের গুরুপরম্পরায় দেখা যায় যে শঙ্কর ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আরও

দেখা যায় যে সুরেশ্বরশিষ্য সর্কজাঅমুন সিংহপশারীরকের শেষে লিখিয়াছেন, মনুকুলের আদিত্যরাজার সময় তিনি উক্ত পুস্তক রচনা করেন। এই দুইটি উক্তি একত্র করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে শঙ্করের উক্ত সময় অর্থাৎ ১৪ বিক্রমার্কাব্দ চালুক্যবংশীয় প্রথম বিক্রমার্কেয়র সময়; কারণ আদিত্য রাজা প্রথম বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। উক্ত প্রথম বিক্রমাদিত্য ৬৭০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ করেন; ইহাতে পূর্বের ১৪ বিক্রমার্কাব্দ যোগ করিলে ৬৮৪ পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে পারা যায়, শঙ্কর ৬৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন।

তৃতীয়। মাধবাচার্য্য একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরিচয় দেওয়া নিম্নপ্রয়োজন। ইনি শঙ্করের একটি গ্রহসংস্থান দিয়াছেন। ইহাতে ৪টা মাত্র গ্রহ নিজ তুলে ও কেন্দ্রে অবস্থিত এইরূপ লিখিত আছে। মাধব জ্যোতিষ শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু, তথাপি তাঁহার এরূপ গ্রহসংস্থানবর্ণনা আমাদের নিকট কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, ইহা বথার্থ জ্যোতিষিক বর্ণনা হইলে মাধবাচার্য্য জন্মসময় ও অগ্রাণ্ড গ্রহস্থিতি বলিতে কখনই বিম্বৃত হইতেন না। যাহা হউক আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে উক্ত চারিটি গ্রহের উক্ত প্রকার স্থিতিতে যাহা যাহা ঘটা উচিত তাহা শঙ্করের বাস্তবজীবনে ঘটা চাই অথবা তাহার সহিত শঙ্করের জীবনের ঐক্য হওয়া চাই। ত্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বোষ মহাশয় এতরূপ অনুমানের বশবর্তী হইয়া উক্ত প্রকার গ্রহসংস্থান কোন সময়ে ঘটয়াছিল, তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শঙ্করের জন্ম-জ্ঞাপক যাবতীয় প্রবাদের এক এক খানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। কিন্তু কোনটিতে তিনি মাধববর্ণিত যোগ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। তবে তিনি যে ষোলখানি কোষ্ঠী লইয়া শ্রম দীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছেন, তদর্শনে বেশ প্রতীয়মান হয় যে ঐ কোষ্ঠীতে শঙ্করের মত একজন বড় লোক জন্মিতে পারে, অপর সমস্ত কোষ্ঠীতে তাহা ঘটে না। ইহাতে বেদান্তজ্যোতিষ, যুক্তিসম্বিত বাগ্মিযোগ, তর্কযুক্তিপরায়ণযোগ, ত্রায়শাস্ত্রবিদ্যোগ, গ্রহকর্তৃকযোগ, মুক্তিযোগ, ভগন্দরযোগ, অজ্ঞানযোগ, জনকজননীবিয়োগযোগ প্রভৃতি শঙ্করের জীবনের অমুকুল সমুদায় যোগ পাওয়া যায়; ইহাতে মাধবের কথিত তিনটি গ্রহ মিলে, একটীমাত্র অমিল থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের নিরূপিত সময়ের সহিত জ্যোতিঃশাস্ত্রেরও সহায়তা রহিয়াছে।

এক্ষণে আমরা শঙ্করের সময় সম্বন্ধে প্রচলিত মত ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ এবং আমাদের নিরূপিত ৬৮৪ বা ৬৮৬ খৃঃ এই দুইটি সময়ের সহিত স্থিরীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার কিরূপ ঐক্য আছে তাহা দেখিব।

১। বাহারা বলেন, য়ুয়ন-চুয়ঙ্ (Yuan-Chuang) ও ইৎসিঙ্ (It-sing) এই চীন-পরিব্রাজকদ্বয় শঙ্করের পূর্ববর্তী, তাঁহারা আমাদের নিরূপিত সিদ্ধান্তের আপত্তি করিতে পারিবেন না; কেন না, ইৎসিঙ্ যে সময়ে ভারতে, শঙ্কর তৎকালে বালকমাত্র। সুতরাং ইৎসিঙের শঙ্কর নামোল্লেখের সম্ভাবনা কোথায়?

২। পূর্ণবর্ষা যুগ-চন্দ্রের সমকালবর্তী এবং শঙ্কর যে ভাবে পূর্ণবর্ষার নাম করিয়াছেন তাহাতে পূর্ণবর্ষা শঙ্করের খুব বেশী পূর্বের বলিয়া বোধ হয় না। ৭৮৮ খৃঃ হইতে আরও ১০০ বৎসর ব্যবধান হয়।

৩। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনী-বর্ণিত ললিতাদিত্যের সময় গোড়ীয় কি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের শারদামন্দিরে শাস্ত্রবাদ কানিংহাম সাহেব শঙ্কর কর্তৃক বলিয়া স্থির করেন। ৬৮৬ খৃঃ হইলে উহা সঙ্গত হয়, ৭৮৮ খৃঃ হইলে আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না।

৪। কোজুদেশরাজকাল মতে বুর্গেল যাহা বলিয়াছেন, ৬৮৬ খৃঃ হইলে মিলে। (Sewell's S. I. D.) ৭৮৮ খৃঃ হইলে বড় দূর হইয়া পড়ে।

৫। সাহেবোক্ত শঙ্কর প্রতিপক্ষের মধ্যে শ্রীহর্ষ, উদয়ন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত অনেকের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎকার ৬৮৬ খৃঃ হইলে সঙ্গত হয়, কিন্তু ৭৮৮ হইলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার সঙ্গত হয় না।

৬। সর্বজ্ঞান্বকথিত আদিত্য রাজাকে ৬৮৬ খৃঃ হইলে পাওয়া যায়,—৭৮৮ খৃঃ হইলে পাওয়া যায় না।

৭। শৃঙ্গেরী-মঠে সুরেশ্বরের যে সময় দেওয়া হইয়াছে, ৬৮৬ হইলে তাহা মিলে, কিন্তু ৭৮৮ খৃঃ হইলে তাহা অমিল হয়।

৮। ৬৮৬ খৃঃ হইলে ঐক্রেস্ত সাহেবোক্ত বঙ্গীয় শঙ্করচার্য্যকে শঙ্কর হইতে পৃথক্ করিতে হয় না। এই বঙ্গীয় শঙ্করের সময়ে শশাঙ্করাজ বৌদ্ধবিতাড়ন করেন।

৯। ভাণ্ডারকার অনেক যুক্তি দেখাইয়া শঙ্করের সময় ৬৮০ খৃঃ অগ্রে স্থির করিয়াছেন। আমাদের নিরূপিত ৬৮০ খৃঃ অগ্রে ভাণ্ডারকারের নিরূপিত সময়ের খুব নিকটবর্তী।

১০। ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইলে শ্রম্পাটলিপুত্রসংক্রান্ত কখনও মিলে, ৭৮৮ খৃঃ হইলে মিলে না। এ কারণ ৬৮৬ খৃঃ অগ্রে শঙ্করের প্রকৃত আবির্ভাবকাল বলিয়া ধরা যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।

বাঙলার উপসর্গ

গত ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসের অধিবেশনে খাঁটি বাঙলার কুৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তখন হইতেই বাঙলার উপসর্গগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। তখনই শুটিকয়েক উপসর্গের নমুনা দিয়াছিলাম। এতদিন অবসরবশতঃ সবগুলিকে জুটাইয়া উঠিতে পারি নাই। আমার এই চেষ্টা দেখিয়া কোন রসিক বন্ধু বলিয়াছিলেন, আগে ধাতুর ঠিক কর, তারপর উপসর্গ জুটাইও। বাঙলার

উপসর্গের অভাব নাই। বস্তু উপসর্গ জুটিয়াইতো বাঙলাটাকে মাটি করিয়াছে। বস্তুবস্তুর কথায় আমি হটি নাই, বরং খুঁজিয়া দেখিলাম খাঁটি বাঙলার উপসর্গ বেশী নাই। বেশী কি, একপ্রকার উপসর্গের অভাবই বলিতে হইবে। দুইচারিটা যা' আছে, তাহাদের বাছিয়া ফেলা বড় দুরূহ ব্যাপার নহে। 'অন্নধন যা' খুঁজিয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, খাঁটি বাঙলার ধাতু স্থির করাই বড় শক্ত কথা। অনেক দিন হইতে ইহার ধাতু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। যখন ইহার বিশেষ বিকার ঘটিয়াছিল, তখন সংস্কৃতজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইহার চিকিৎসা করিতে বসিয়া ইহার ধাতু ঠাহর করিতে পারেন নাই। সেই সময় হইতে এ কাল পর্যন্ত তাঁহারা সংস্কৃতের স্মৃতিভরণ এত বেশী প্রয়োগ করিয়াছেন যে এখন তাহার বিধিক্রিয়া বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবু ইহার এখন যে বেগ দেখা যাইতেছে, যদি শীঘ্র শীঘ্র ইহার ধাতুর গতি স্থির করিয়া দিতে পারা না যায়, তবে সেই বেগই প্রাণঘাতক হইয়া পড়িবে। সেই অজুই বাহাতে উপসর্গগুলি ধরা পড়ে আর ধাতুর ঠিক হয়, তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে।

বাঙলার উপসর্গ বেশী না থাকিলেও যা' দুইচারিটা আছে, তাহারও অধিকাংশ বিদেশী। আমাদের শব্দ ছিল, অলঙ্কার ছিল, অর্থ ছিল, কেবল উপসর্গ ছিল না বলিয়াই যোধ হয়। এখন যে কয়টা জুটিয়াছে, সে কয়টাই বিদেশী, সুতরাং তাহাদের নাম 'উপসর্গ' রাখাই ঠিক হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি খাঁটি বিদেশী, এখনও সাজপোষাক ছাড়িয়া স্বরূপ ভাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে নাই, আগে তাহাদের বাছিয়া লওয়া যাক। সুখের বিষয়, ইহাদের বাছিতে কষ্ট হইবে না, কারণ ইহারা এখনও স্বজাতীয় শব্দের ঘাড়ে চড়িয়াই নিজ মূর্তিতেই বর্তমান আছে, বিদেশী কৃৎ ও তদ্ধিতের দ্বারা বর্ণচোরা হইবার অবকাশ এখনও হয় নাই। বাঙলাটা এক সময়ে কেবল হিন্দুর ভাষা ছিল কি না, তাই ইহাতে মুসলমানী ভাষার উপসর্গগুলি ঢুকিলেও মিশিতে পারে নাই। বাঙলা কোন শব্দ এখনও তাহাদিগকে ঘাড়ে করিয়া লয় নাই। কোন কোনটা হয়ত চুরী করিয়া কোন কোন বাঙলা শব্দের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, কিন্তু সেটা সমাজগ্রাহ্য নহে। এইবার এক একটির পরিচয় দেওয়া যাক—

'লা'—এটি পারস্তভাষার উপসর্গ, নঞর্থপ্রকাশক, এটির পারস্ত শব্দের ঘাড়ে চড়িয়াই ভাষার প্রবেশ করিয়াছেন, আর তাহাদের ঘাড়েই আছে। আজকাল অনেক স্থলে অসতর্কভাবে ইহার বাঙলা মূর্তি দিবার চেষ্টা হইতেছে যথা,—লা-খোজা; লা-দাবি, নাদাবি; লা-বারেস, নাবারেস ইত্যাদি।

'না'—এই মূর্তিতে একটি পারসী উপসর্গ আছে। ইহাও নঞর্থপ্রকাশক, যথা,—না-পসন্দ, না-মনাসিব, না-শায়ো, না-শালগ, না-দোরস্ত, না-হক, না-কস, ইত্যাদি। নামঞ্জুর, নাপাক, নারাজ, নাচার, না-কস, বাঙলা গোষাকে 'নাবালক' 'নাকাচ' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাকারা অকর্মণ্য হিন্দী কথা। নাকাল খাঁটি আরবীর শব্দ, অর্থ উভয়

ভাষায় একই, কেহ যেন ইহাকে 'না' উপসর্গযুক্ত কোন নঞর্থবাচক শব্দ মনে না করেন। নঞর্থ না + কাল এক্রপ করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, কি বাঙলা, কি আরবী কোন ভাষাতেই উক্ত শব্দের সে অর্থ নহে। বাঙলায় বা সংস্কৃত নঞর্থ একটি 'না' উপসর্গ আছে। অনেকের মতে ইহাকে তাহার সহিত এক করিয়া লওয়া হউক। তাহা হইলে দৈতজ্ঞান দূর হয় বটে, কিন্তু সে অদৈতজ্ঞানের বিকাশ হইলে, ভাষাতত্ত্বের একটা জটিল সমস্যার ব্যাখ্যা করা দুঃস্বপ্ন হইয়া পড়িবে। আর একটি পারস্ব উপসর্গ 'বে',—এতৎ-সংযুক্ত পারস্বশব্দগুলি অত্র শুলির অপেক্ষা ভাষায় বেশী পরিচিত, যথা,—বে-বন্দোবস্ত, বে-হিসাব, বে-অকুর্ক, বে-আফেল, বে-তিরবং, বে-দম, বে-কেতা, বে-জায়, বে-মালুম, বে-হায়া, বে-ইজ্জত, বে-আনাজ, বে-দস্তুর, বে-ভমিক্, বে-হাল, বে-কল, বে-হোস্, বে-কায়দা, বে-সিজিল, বে-কিস্মত, বে-রকম, বে-জাম্, বে-জার, বে-দখল, বে-কিস্ম্ ইত্যাদি। এই 'বে'টি বড় 'বে-আদব' তাই স্বজাতীয় শব্দ ছাড়িয়া বাঙলার হালচালের সঙ্গে মিশিয়া কিছু 'বে-সাত' হইয়া পড়িয়াছে যথা,—বে-চাল, বে-নাম, বে-হাত, বে-গোছ, বে-চপ, বে-দিন, বে-জুত, বে-ভাব, বে-দাড়া, বে-সভা, বে-রসিক, বে-হর্দ, বে-লয়, বে-আড়া, বে ঘোর, ইত্যাদি। বে-তাগ, বে-কার, বে-খিরকিচ, বে-গানা, বে-ক'স প্রভৃতি হিন্দী শব্দ মিশ্রিত। বেগার, বে-কল, বেনাম, বেঘোর প্রভৃতি 'বিকল', 'বিনাম' 'বিঘোর' মূর্ত্তিও পরিগ্রহ করিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের 'বিকাল' কথাটির হয়তবা একদিন 'বে-কাল' মূর্ত্তি ছিল।

'বে'—এই পারসী উপসর্গটি আবার বাঙলার মধ্যে দিয়া আজকাল কয়েকটি ইংরাজী শব্দের সহিতও সংযুক্ত হইয়া নঞর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে, যথা—বেহেড, বেটাইম, বেহুটিস্। 'ব'—বনাম, বকলম, ব-হাল, বদস্তুর, বভারিখ, বজাবেদা প্রভৃতির 'ব'কেও উপসর্গ বলা চলে। বিদেশী বঁধুদের পরিচয় এই পর্য্যন্ত।

বস্-খাস্ত, বস্-খেলাপ, গস্-হাজির, গস্-পমন্, হস্-রকম্, হস্-কিস্ম্, দস্-বার, দস-পস্তন, কম-বস্তা, কম-সিন, বদনাম, বদরাগী, বদজাত (বজ্জাত) প্রভৃতি শব্দের প্রথমাংশ-গুলিকে একদিন আমিই উপসর্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা নহে, উহারা সংস্কৃত অন্তর্, প্রাতর, পুনর্ প্রভৃতি শব্দের ছায়।

এইবার ঘরের উপসর্গগুলির পরিচয় দিব। প্রকৃত প্রস্তাবে এ শুলির সমস্তও আবার বাঙলা নহে। সংস্কৃত সৃষ্টিকার্যের বিধিক্রিয়ার ফলে ইহার কতকগুলি আঁঠুলির মত বাঙলা শব্দের গায়ে লাগিয়া গিয়াছে। একে একে তাহা দেখাইতেছি।

'অ'—এটিও নঞর্থ উপসর্গ যথা,—অকথা, অকটকিনা, অকাজ, অকেজো, অকৌশল, অগণ্টি, অচেনা, অজানা, অটুট, অঠেল, অচেল, অথই, অনিমিখ, অপাট, অফুরন্ত, অবুঝ, অবেলা, অবনিবনাও, অচোল, অমাহুব, অমায়িক, অসাড়, অস্বরস, অস্বস্তি প্রভৃতি অর্থ ও প্রয়োগ দেখিয়া যদি ইহাকে সংস্কৃত নঞর্থ "অ"এর সহিত অভিন্ন বলিয়া

ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বৈয়াকরণ-ও-শাস্তিকেরা হয়ত কোন আপত্তি করিবেন না; কিন্তু সামাজিকেরা বলিবেন যে যখন আমরা সংস্কৃতের ধার ধারিতাম না, তখন কি আমাদের মধ্যে যাহারা ‘অব্’ ছিল, তাহারা অকাজ, অপাট করিত না, পাড়াপড়সীর সহিত তাহাদের অশ্বরস ঘটিত না কিয়া আমাদের পুত্রে ‘অথই’ জল থাকিত না অথবা আমাদের মধ্যে ‘অমায়িক’ লোকের অভাব ছিল? এ সকল কথাই তুষ্টিজনক উত্তর দিয়া এই উপসর্গের বাঙ্গালীরা ঘুচান একটু কঠিন হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ‘অটান’ শব্দে উপসর্গের অর্থ—বিশেষ প্রচুর। বাঙালীর সংসারে অটান নিত্যবস্ত। অকোশল, অমায়িক, অশ্বরস, অমায়িক, অশক্তি প্রভৃতি শব্দগুলি আকৃতিতে পুরা ‘সংস্কৃত’ হইলেও অর্থে একেবারে বাঙলা। ‘অশক্তি’ কথাটি আবার যে দুই সংস্কৃত শব্দযোগে লিখিত হয়, তাহার সহিত উহার উৎপত্তির কোন সংশয়ই নাই। উহা ‘অশাস্ত্য’ কথা হইতে অপভ্রংশ হইয়া ঐরূপে বাঙলা হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর আর একটি উপসর্গের নাম ‘অনা’। এত বিপুল ভাষাটার মধ্যে এই উপসর্গটি দুটিমাত্র শব্দ অধিকার করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, যথা—‘অনামুখো’ আর ‘অনাস্থি’। এই উপসর্গের অর্থ কুংসিত বা ঘৃণ্য। ‘সংস্কৃত’ নঞর্থ, ‘অ’স্বরাদি শব্দের আদিতে বসিলে ‘অন্’ হয়। অনেকে এই ‘অনা’কে সেই ‘অন্’ এর জ্যোতিষ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহা হয় না, উভয়ের গোত্র এক নহে, আর অর্থও এক নহে। ‘অনা’—স্বরাদি শব্দের পূর্বে বসে না।

আর একটি উপসর্গ ‘আ’—ইহা একেবারে খাঁটি বাঙলা উপসর্গ। ইহাও নঞর্থ প্রকাশক। নঞর্থ ‘আ’ সংস্কৃতে নাই, সুতরাং ইহার জাতি লইয়া আর কাহারও সহিত গোল নাই। আকাটা, আকাটা, আকাঁড়া, আখোড়া, আগণা, আচোট, আছেলা, আঢাকা, আঢালা, আদেখা, আধোয়া, আশরা, আবণা, আভাঙা, আমাজা, আলেখা প্রভৃতি বিবিধ ধাতুসংযুক্ত পদে এই উপসর্গটির নঞর্থ অতি স্পষ্ট প্রকাশিত হয়।

অনেকে আবার এই প্রয়োগগুলিকে অশুদ্ধ প্রয়োগ বলিয়া ‘অ’ উপসর্গযোগে লিখিয়া থাকেন। অ-চেনা, অজানা, অদেখা, অ বলা প্রভৃতি গুলিকয়েক ধাতুতে ‘আ’ স্থানে ‘অ’ যোগ করিলে অশুদ্ধ বা প্রয়োগ-বিরুদ্ধ হয় না, কিন্তু আধোয়া, আমাজা, আঢাকা, আভাঙা, আকাঁড়া, আকাটা প্রভৃতি হলে ‘আ’র পরিবর্তে ‘অ’ প্রয়োগ একান্ত অসিদ্ধ প্রয়োগ বলিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্তর্য এই উপসর্গটির অর্থও দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—

আকাট—আকাট মূর্খ অর্থাৎ কাষ্ঠবৎ নিরেট মূর্খ। ইহার ঠিক ইংরাজী প্রতিশব্দ Blockhead, ভয়ে আকাট—আড়ষ্ট।

আবাটা—ঘাটশূন্য। আঝালা—ঝালহীন। আঝুণি—লবণাস্বাদ শূন্য। উপসর্গের অর্থ হীনতা।

• আময়দা—প্রচুর।

আচমকা; আচমিত—হঠাৎ। উপসর্গের অর্থ পর্য্যন্ত।

আগাছা—গাছ নহে, অপ্রয়োজনীয় ভূগুণাদি।

আকাঁড়া—আকাঁড়া জ্ঞান।

আকাল—ভুক্তিক। অনেকে ‘অকাল’ ও ‘আকাল’ উভয় শব্দের অর্থগত প্রভেদ লক্ষ্য না করিয়া অসতর্কভাবে একের স্থলে অত্রের প্রয়োগ করেন।

আতেলা—ঈষৎ তৈলাক্ত, পিচ্ছিল বা তৈলাশূন্য। আতিৎ—ঈষৎ তিক্ত। আলোণা—ঈষৎ লবণাক্ত। উপসর্গের অর্থ ঈষৎ।

আদেখ্লে, আদেখ্লেপনা—যে দেখে নাই।

‘উন’—আর একটি উপসর্গ। ইহা হীনার্থপ্রকাশক সংস্কৃত ‘উন’ শব্দজাত বসিয়া মনে হয়, যথা—উনকটি, উনপাঁজুর ইহারও এই দুটি শব্দ বৈ আর নাই। উনত্রিশ, উনচল্লিশ, উনপঞ্চাশ, উনষাট, উনসত্তর, উনষাণী, উননব্বই প্রভৃতি শব্দগুলিকে এই উপসর্গযুক্ত বলিয়াই ধরা উচিত, কেননা ইহার উপসর্গভাগ খাঁটি সংস্কৃত আকারে বর্তমান, কিন্তু আসল শব্দটি অপভ্রংশ হইয়া বাঙালী হইয়া গিয়াছে। ‘উনিশ’ শব্দটি উন-বিশ (হিন্দী উনৈশ) শব্দের অপভ্রংশ বা বাঙ্গালী সমাসে নিপাতন-নিপ্পন্ন শব্দ।

‘না’—বাঙ্গলা উপসর্গটি সংস্কৃত নঞর্থ ‘না’ শব্দেরই সর্গোত্তর। এতৎসংযুক্ত শব্দও ভাষার একটীর বেশী হুঁটি নাই, তাহাও আবার কোতুলজনক শব্দ—নাপার্য্যমান-না পার্য্যমান। (‘পার্য্যমান’ শব্দটি বাঙ্গলা ‘পরিমাণ’ শব্দের উত্তর সংস্কৃত ‘অণ্’ প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন নাকি ?) ‘নাচার’—শব্দটিই হিন্দী শব্দ, তবে বাঙ্গলা ভাষার ‘চারা’ (উপায়) এইরূপ ব্যঙ্গব্যাক্য দিয়া উহার অর্থ করা যায় বা করা হইয়া থাকে, এজন্য উহাকেও এই উপসর্গযুক্ত শব্দের উদাহরণ মধ্যে গ্রহণ করা যায়।

‘নি’—এটিও খাঁটি বাঙ্গলা উপসর্গ। ইহাও নঞর্থবাচী, যথা,—নিকড়ে, নিকষ, নিকাম, নিখরচা, নিখুঁত, নিখাউস্তী, নিছক, নিখাণী, নিখুম, নিখর, নিগড়, নিভাঁজ, নিবড় (নিয়ড়), নিবস্ত, নিরালা, নিরাগী, নিলাজ ইত্যাদি। ‘নিমুড় নিছুড়ে’—বাক্যটির দুইটা অংশই এই ‘নি’ উপসর্গযুক্ত শব্দ, কখনও ভাষায় স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। বাক্যটির অর্থ,—নিমুড়—নিমুণ্ড অর্থাৎ আত্মীয়হীন, নিছুড়ে=নিসঙ্গ (?)। ‘নিহাল’ শব্দটি হিন্দী,—নেহালচাঁদ।

‘পরি’—সংস্কৃত ‘পরি’ উপসর্গেরই ‘নিকটবর্তী’। পরিহার, পরিপাটি, পরিসঙ্গ, পরিমাপ ইত্যাদি। ‘পর্য্যবিত’ অর্থে ‘পরিষ্টি’ কথাটিতেও এই উপসর্গের আশুত থাকিতে পারে।

‘বি’—সংস্কৃত ‘বি’ উপসর্গেরই মত। যথা,—বিভোর, বিজোড়, বিভোল, বিজাতক, বিছড়ন, বিগড়ন।

বাঙ্গলা উপসর্গ এই পর্য্যন্ত, আর তো এখন খুঁজিয়া পাই নাই। ভবিষ্যতে পাই,

আবার আপনাদিগকে উপহার দিব। মুসলমান বাদসাহদিগের কৃপায় আরবী পারসী ভাষার শব্দে সঙ্গে সঙ্গে যেমন কতকগুলি আরবী পারসী উপসর্গ বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, তেমনি, ইংরাজরাজের কৃপায় ইংরাজি ভাষার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি উপসর্গও হু একটি বাঙ্গলা ভাষায় যে প্রবেশ করে নাই, এমন নহে, তবে সেইগুলি এখনও ইংরাজী শব্দের ঘাড়েই আছে, বাঙ্গলা শব্দের সহিত মিশিতে পারে নাই ; যথা—

‘সাব’—সাব্-ইন্স্পেক্টার, সাব্-রেজিষ্ট্রার, সাব্-ডেপুটি, সাব্-ম্যানেজার।

‘ডিস্’—ডিস্-মিস, ডিস্-বার।

‘মিস্’—মিস্-জয়েন্টার, ইত্যাদি।

এই সকল উপসর্গের প্রয়োগ লইয়া বাঙ্গলায় অনেক কথা বলিবার আছে। সংস্কৃত উপসর্গগুলি খাত্তর অর্থের বিকার ঘটাইয়া থাকে, এবং প্রায় সকল উপসর্গই সকল খাত্তর সহিত ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলা উপসর্গগুলির কোনটিই সেরূপ নহে। বাঙ্গলায় যে উপসর্গ যে খাত্তর বা যে শব্দের সঙ্গে যে অর্থসংযুক্ত প্রায় সে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। এক ‘আ’ উপসর্গ ব্যতীত আর কোন উপসর্গ সকল খাত্তর সহিত ব্যবহৃত হয় না। যথা,—অনামুখো কিন্তু ‘অনাচোখো’ হয় না। এবং নঞর্থ ‘অ’ যোগে ‘অঝাড়া’ কিন্তু নঞর্থ ‘বি’ যোগে ‘বিঝাড়া’ হয় না, কিন্তু ‘বিজোড়’ হয়, অথচ ‘অজোড়’ বা ‘আজোড়’ হয় না। এই সকল বিবেচনা করিলে, যে শব্দাংশগুলিকে এই প্রবন্ধে উপসর্গ বলিয়া নির্দেশ করিলাম, সংস্কৃত উপসর্গের লক্ষণ অনুসারে সেইগুলিকে উপসর্গ বলা যায় না। এইগুলিকে উপসর্গ বলিতে হইলে বাঙ্গলার উপযুক্ত উপসর্গের স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দেশ করা আবশ্যক হইবে। বাঙ্গলা উপসর্গ সর্বত্র খাত্তর সহিতেই ব্যবহৃত হয় না—যথা,—আঘাটা, অকেজো ইত্যাদি।

অন্তএব বন্ধুর অমূল্য বাবু, রামেন্দ্র বাবু এবং রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বদর্শীরা বাঙ্গলা উপসর্গের তত্ত্বনিরূপণ করিতে চেষ্টা করিলে সুখী হইব।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

কোচবিহারের হৈয়ালী

কোচবিহারের হৈয়ালী এই প্রথম সংগৃহীত হইল। নিরক্ষর লোকের রচিত বলিয়া হই একটি হৈয়ালির মধ্যে এক আধটু অশ্লীলতা দৃষ্ট হইবে। শুনিতে একটু অশ্লীল বটে, কিন্তু অর্থগত কোন অশ্লীলতা ইহার ভিতর নাই। নিরক্ষর লোকের রচনা বলিয়া ইহাতে বিশেষ একটু সুবিধা এই আছে যে, এই গুলি প্রণয়নকর্তাগণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ও শিক্ষা-দীক্ষার পরিচায়ক এবং প্রাদেশিকতা, গ্রাম্যতা ও স্বভাবজাত কবিত্তে পূর্ণ।

পূর্বকালে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ ছায়াদি শাস্ত্রের তর্কের মধ্যে হৈয়ালি ব্যবহার করিতেন। সে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ হৈয়ালি তাহাদের ছায় পণ্ডিতগণেরই ষোগ্য, এই নিরক্ষর কবিগণ পণ্ডিত নহে, তাহাদের হৈয়ালিতে তদুপযোগী বিচারও পরিচয় নাই। তাই বলিয়া যে কবিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার অভাব আছে, এরূপ নহে।

হৈয়ালি কয়েকটা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১)

আট ঠাং যোল হাঁটু, মাছ মাঝে নালাটু।

ফেলায় জাল তা ভেজেনা, মাঝে মাছ তা ধায়না ॥ (মাকড়সা)

(২)

হাতা আছে মাথা নেই, পেট জল জল করে।

বাঘ না হয় ভালুক না হয়, আস্তর মানষিক ধরে ॥ (জামা)

(৩)

এখি গেছ উখি গেছ, গেছ বাড়িয়ার হাট।

এমনি বস্ত্র দেখে আইছ, ফলের উপর পাত ॥ (আনারস)

(৪)

হলদিয়া বরণ গাও, খাটিকার মতন পাও।

চুটুং করিয়া চুগা খাইল, যমরাজার মাও ॥ (বোলতা)

(৫)

আমসি আমসি টেংসি টেংসি, তুংসি প্রাণ থালু।

নাক যেমটি বোচা নাকি, তুই কেন্তে আলু ॥ (ডউয়া ও ভেক)

(৬)

গাড়াম্ গুড়ম্ খাড়াম্ খুড়ম্ সর্বগায়ে সিং।

তার মধ্যে একটা লিং।

ভাল ভদ্র হল কালে সর করিয়ে ধার ।

চাষা লোকে হলে খালি হাচ্চিনি নাগার ॥ (কাঁটাল)

(৭)

পাতালে ঘর বাড়ী দুয়ের উদাও থাকে,

সুঁধাইলে বিয়াবার না হয় বিধির বিপাকে ।

কম কবিকল্প হৈয়ালির ছন্দ,

এই রকম মুল্লুকি মানুষী হইছে বন্দ ॥ (ভেড়ু)

(৮)

সাত আঙ্গুল খুঁটা নিয়ে গেলাম ছুতারের পাছ,

ছুতার উঠিয়ে বলে কি কি গড়বো মাঞ্জ ।

বারটা লাঙ্গল তেরটা জাট, চরকা গড়বো তিন শ মাট ।

ইয়ারকি কিয়ারকি তুমরা নেও,

সাত আঙ্গুল খুঁটা মাগিয়ে দেও ॥ (সোম, মঙ্গল প্রভৃতি সাতবার)

(৯)

নীলবর্ণ কপিথ বরণ, যার চক্ষু চৌদ্দ চরণ ।

এক লেটু হইকান, বুঝিয়ে দেও পণ্ডিতজান ॥

(শিমালের লেজে কাঁকড়া)

(১০)

এমনিত মরা বা'স ত খা, না খা'স ত বা ।

উপরে আছে খলুয়ার বাপ, কৈলেক বা ॥ (বড়শী)

(১১)

এথি গেলু উথি গেলু গেলু চওড়ার হাট ।

একটা কছা দেখে আইলু, বোল সারে দাত ॥ (অলাবু)

(১২)

অঙ্গলবাড়ী হাতে চিরাইল টিয়া,

সোনার টুপুলি মাথায় দিয়া । (কলার মোচা)

(১৩)

চা'র দিয়া চা'র কানি, মধ্যে হইল কোড়থানি ।

খুধায় চিবায় মাথা কাটা—যায়না জালে তার ছেপচাটা ॥

(দোয়াতকলম)

(১৪)

আলি আলি যায়, উকি মারি চায় ॥ (হুঁচ)

(১৫)

বল দেখি ভাই ।

যর কোণা আছে তার, দুয়ের কোণা নাই ॥ (ডিম)

(১৬)

হাত গোদা গোদা পাও গোদা গোদা,

এই শ্লোক না ভাবিলে গুণ্ডিত্ত্ব ভোঁদা ॥ (হাতী)

(১৭)

হাত পাও সব আছে, একতার নাই ॥

এটা কোন জীব হয় বল দেখি ভাই ॥ (মাছ)

(১৮)

এখান ধে মালাম ভীর, কাপড় হ'ল চৌতির ।

ধোপায় না দেয় ধুইয়া, দরজী না দেয় সিইয়া ।

সেই কাপড় পিন্ধি গেলাম হুর্গাপুর ॥

হুর্গাপুরের জল কুটি টল্ টল্ করে,

রাজা আইসে পরজা আইসে, সগায় সেলাম করে ॥ (মহরমের দাছা)

(১৯)

মুঠু পুঠু মরদটা দেখতে চমৎকার ।

পরগটা চিরাই গেলে মুণ্ডটা হয় সার ॥ (খড়ের পালা)

(২০)

আকাশে জুড়লাম লাজল, পাতালে জুড়লাম রই ।

সাততাল কাউয়ার চিবড়িয়া থায় থই ॥ (বুড়ি)

(২১)

হাটের গোটা গোটা, সন্ধানদীর কোটা,

দুইটা হস্তীর দাঁত, ছয়টা বিরথের পাত ।

এই ছিলকা ভাবি দিতে লাগে গুয়া পান ॥

(তপারি চুন, হুলা ও পান)

(২২)

অপারে পোনা গুটি খুপুয় বুপুয় করে ।

এপারে বুড়া কোনা পুটেৎ চাপড় মারে ॥ (ভাত)

(২৩)

তুড়ৎ তাড়াৎ নাচে, তোমার বাড়ীৎ কি আছে ॥ (ঝাড়)

(২৪)

একটা খড়ে, ঘরটা বেড়ে ॥ (বাতি)

(২৫)

ধুম ঘর এক পই, দাড়িটা তার হাতে লই ॥ (ছাতি)

(২৬)

বল দেখি পণ্ডিত জান, কোন্ বীরের বারটা কান ॥ (ঘর)

(২৭)

হিচিক চিকে খোচে মাটি, দশ ঠ্যাং তিন পুকুটি ॥ (লাঙ্গল)

(২৮)

জানিয়ে তাই জানি, চোখ দিয়া চাইয়া রয় লেল দিয়া খায় পাণি ॥

(বাতি)

(২৯)

মধ্য নদী গঙ্গা খুঁটা, গাই হামলায় ছধ মিঠা ॥ (মৌচাক)

(৩০)

হাত নাই পাও নাই ছল ছলিয়া যায় ।

পিঠের চামড়া নাই সর্বলোকে খায় ॥ (জল)

(৩১)

ওপারে কাশিয়া শুটি লাল টিক্ টিক্ করে ।

কার বাপের সাধ্য আছে কাটি আনতে পারে ॥ (প্রাতঃ সূর্য্য)

(৩২)

ধন্থ ধন্থ কুমড়ার পাত, দেখতে লাগে উৎপাত ॥ (মধ্যাহ্ন সূর্য্য)

(৩৩)

এতটুকু টুকু গাছে, কেটে ঠাকুর নাচে ॥ (বেগুন)

(৩৪)

গাছে আছে তিন নারিকেল পাত বা পুহে খাই ।

তুমরা ছই বাপ পুত, আমরা ছই বাপ পুত গোটে গোটে পাই ॥

(পৌত্রের প্রতি শিতামহ)

(৩৫)

ঠক্ ঠক্ উকিলে ।

বার মাথা বারঠ্যাং কেলটে দেখিলে ॥ (গোনোহন)

(৩৬)

তল গিরি গির উপরে ছাতি, তার ফল খায় আশ্বিন কাতি ॥ (কচ)

(৩৭)

গোড় আগালে ধুতুরা কুলা, মধ্যখান হৈল আচ্ছা,
উপর দিয়া ছাওয়া তার তল দিয়া হয় বাচ্ছা ॥ (কলাগাছ)

(৩৮)

রাজার বাড়ীর মেনি গাই, মেন্ মেনাইতে যায়,
হাজার টাকার মরুচ খাইয়া আরও খাবার চায় ॥ (কেড়কা)

(৩৯)

শুভে আইসে শূন্যে যায় শুভে বান্দে ঘর,
বিধাতার নির্বন্ধ তার গর্দানৎ ভোমর ॥ (মাকড়সা)

(৪০)

ভূই ধল্ ধল্ বিছন কাল, মুখ নাই তার বলে ভাল ।
পাও নাই তার যায় দূর, পিঙ্কি আইসে চাঁপাফুল ॥ (পত্র)

(৪১)

ছিল্ ছিল্ ভাঁড়ি ছিল্ ছিল্ পাত, মালিক ভাঁড়ি চকিশ হাত ॥
(পানের গাছ) ইত্যাদি ।

হৈয়ালি গুলির মধ্যে একপ কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দ আছে, যে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন না। পাঠকগণের বোধনৌকর্য্যার্থ সে গুলির অর্থ নিম্নে দেওয়া হইল। হৈয়ালি গুলি বাহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত, এই অর্থগুলিও আমি তাহাদেরই নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছি।

২। আন্তর—আন্ত, সম্পূর্ণ—Whole, entire.

৩। এখি—এখানে উখি—ওখানে

৪। খাটিকা—খড়কে, খাটিকার মত অর্থাৎ সক্র। চুটুং—ক্রতগতি, খাঁ করে।

৫। টেংসি—টক্। তুংসি—তুই কথার একটি প্রাচীন রূপ।

কথা বার্তায় তুংসি কদাচিত্ ব্যবহৃত হয়। এই শ্লোক তুই না হইয়া তুংসি ব্যবহৃত হওয়াতে একটু অল্পপ্রাসের আভাস পাওয়া যায়।

কেনুতে—কেন ? ডাউয়া—একপ্রকার টক্ ফল বিশেষ।

৬। গাডাম্ গুডম্—গোলমাল, খাডাম্ খুডম্ ও এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

লিং—কাঁঠালের মধ্যে যে দস্তটী থাকে। স'ন্ করিবে—ঠিক্ ঠিক্ করিয়া যেমন কাগড় খানা স'র ক'রে পর। হাকিনি নাগায়—আঁচড়াইতে আরম্ভ করে। ৫ আঁজুল দ্বারা-উঠাইয়া ভাড়াভাড়ি যাইতে লাগে হাকিনি—আঁচড়ানি—খাত্তক্ষেত্র হইতে তৃণাদি সাক্ করিবার যন্ত্রবিশেষ

৭। উদাও—খোলা। সুঁধাইলে—গবেষণ করিলে। চিরবার না হয়—বাহির হওয়া যায় না। মান্ধী—মানুষ। ভেড়ু—এক প্রকার মাছ ধরির যন্ত্র।

৮। খুটা—কাঠ। জাটু—গোশকটে ব্যবহৃত কাঠখণ্ডবিশেষ। ইহার প্রান্ত-দ্বয়ে চাকা দুইটি সংযুক্ত থাকে।

৯। লেটু—লেজ।

১০। থলুয়া—অনিষ্টকারী, এখানে থলুয়ার বাপ অর্থে বড়শীর কাতনাটিকে বুঝাইতেছে। বা—পাদপুরণার্থে।

১১। হাতে—হইতে।

১৩। ছেপচাটা—কাজিল। কোড়ু—ছিদ্র, ধার—যে, তার—সে।

১৫। কোনা—খানা শব্দের diminutive form।

১৭। নাই—নাতি।

১৮। সগায়—সকলে।

২০। সাততাল—সপ্ততাল বৃষ্টির পর মাতীর নীচ হইতে মহীলতা প্রভৃতি যে সকল গোণা উঠিয়া থাকে, এখানে সাততাল শব্দে তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে।

কাউয়া—কাক।

২১। বুড়াকোনা—বালকটী। বাল্লা দেগের প্রায় সর্বত্রই বোধ হয়, ছোট-ছেলেকে বুড়া বলিয়া আদর করিয়া থাকে। এখানেও সেই অর্থে বুড়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৫। পই—ঘরের খুঁটা।

২৭। পুকটী—নিতম্ব।

২৯। গামু—প্রোথিত করিলাম (গাড়িলাম)। হামলায়—রব করে।

এই শ্লোকে মাতীর সঙ্গে নদীর গাছের সঙ্গে খুটার এবং মৌমাছির সঙ্গে গাভীর উপমা করা হইয়াছে।

৩১। কাশিয়—কাশতণ।

৩৪। গোটে গোটে—প্রত্যেকে একটা করিয়া।

৩৬। কাতি—কান্তিক।

৩৮। মরুচ—মরিচ, কেড়কা—কার্পাসতুল্য বীজ ছড়াইবার যন্ত্র।

৪০। ধল্—শ্বেতবর্ণের; বিছন—বীজ।

৪১। ছিল্ ছিল্—চৌরম্; plain। ভাঁড়ি—কাণ্ড।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন পদাবলির পাঠভেদ

প্রাচীন পদাবলির হস্তলিপিগ্রন্থসমূহে নানারূপ পাঠভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনার নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ এই সকল পাঠভেদ ঘটিয়াছে :—

পাঠভেদের কারণ

(১) লিপিকরণের প্রমাদ।—প্রাচীন কবিগণের পদাবলি তাঁহাদিগের দ্বারা সংশোধিত হইয়া মুদ্রাক্ষিত হইতে পারে নাই। সুতরাং “তিন নকলে আসল খাতা” এই অতি সত্য প্রবাদ অনুসারে প্রাচীন কবিগণের রচনা যে প্রাচীন কালের নকল-নবিশগণের হস্তে পড়িয়া প্রতি নকলেই কিছু কিছু বিকৃত না হইয়াছে—ইহা মনে করাই ভুল।

(২) অক্ষরলিখনপ্রণালীর নির্দিষ্ট নিয়মভাব। আমাদের প্রথমোক্ত কারণটি আধুনিক সময়ের নকল সম্বন্ধেও খাটে, কিন্তু এই দ্বিতীয় কারণটি—প্রধানতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা হস্ত-লিখিত গ্রন্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। প্রাচীন বাঙ্গালা হস্তলিপিতে ‘ল’ ও ‘ন’ এর প্রভেদ নাই; ‘ব’ অনেক স্থলেই ‘র’এর জায় এবং ‘র’ ‘ব’এর জায়; ‘তু’ ‘ও’ এর জায় লিখিত হইত। এতদ্বির ‘অ’ এর পরিবর্তে ‘র’, ‘এ’ এর পরিবর্তে ‘রে’, ‘র’ এর পরিবর্তে ‘য’ এবং ‘ব’ এর পরিবর্তে ‘ব’ অনেক স্থলেই ব্যবহৃত হইত।

হিন্দি মৈথিল প্রভৃতি ভাষার অক্ষরকরণে প্রাচীনেরা যে যত্ন, পদ্ধতি মাত্র করেন নাই এবং উচ্চারণ অনুসারে শব্দগুলি লিখিয়াছেন, সে অল্প তাঁহাদিগের দোষ দেওয়া যায় না; মৈথিল বাঙ্গালা প্রভৃতি গোড়ীয় ভাষাগুলিতে অনেক স্থলেই নিরর্থক যত্ন পদ্ধতির প্রভেদ মানিয়া চলার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেক সুপণ্ডিত ভাষাতত্ত্ববিৎ আর্দ্র স্বীকার করিতে চাহেন না। আধুনিক হিন্দি ও মৈথিল প্রভৃতি ভাষার উচ্চারণ অনুসারে বর্ণাবলি লিখিত হইয়া থাকে,—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায়ও অনেক পরিমাণে এই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এইরূপ লিখনপ্রণালীর অপর দোষ গুণ বাহাই থাকুক, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অক্ষরলিখন সম্বন্ধে কোন একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসৃত না হওয়ায় নানারূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে যখন ‘ব’ ‘র’ প্রভৃতি বর্ণগুলির গোলযোগ নিবারণার্থ পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট বর্ণ লিখিত হইতে লাগিল—তখনই প্রাচীন কালের পূর্বোক্ত অক্ষরগুলির পরিচয় লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। সন্দেহহীন একজন যেটি ‘ব’ মনে করেন, অপরের মতে সেটি ‘র’, এইরূপ ‘ল’ ‘ন’ ‘অ’ ‘য’ ‘ব’ ‘ক’ প্রভৃতি বর্ণ লইয়া গোলযোগ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ স্থলে অনেকেই অগত্যা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে প্রাচীন লেখার সত্য সত্য পাঠোদ্ধার করিতে লাগিলেন।

(৩) ছেদের অভাব।—প্রাচীন লেখকেরা অধিকাংশ স্থলেই সমাস-হীন বিভিন্ন

শব্দগুলির মধ্যে বিচ্ছেদশূচক ফাঁক দেন নাই। এই বিস্তীর্ণতা বর্তমান সময়ে অনেক সুদৃষ্টিত হিন্দিপুস্তকেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিভিন্ন শব্দগুলির মধ্যে বিচ্ছেদশূচক ফাঁক বা চিহ্নাদি না থাকিলে অনেক সময়েই শব্দগুলি মিশিয়া বাইতে পারে এবং তাহাতে একজনের মতে যাহা একটি শব্দের শেষ অক্ষর তাহাই অপরের মতে পরবর্তী শব্দের আশ্রয় অক্ষর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কোন ব্যক্তি তাহার কর্মচারীর নিকট পত্র লিখিয়াছেন— ‘ঘটক চুড়ামণিকে সত্বর পাঠাইয়া দিবা’। অল্পকি কর্মচারী প্রভুর নিকট কতকগুলি ঘট ও কচু পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন ‘আপনার আদেশমত ঘট কচু পাঠাইলাম, কিন্তু অনেক তাল্লাস করিয়াও ডামণি পাওয়া গেল না।’ এই জাতীয় পাঠভেদ আমাদের বাল্যকৃত ‘ঘটক চুড়ামণির’ গল্পটি স্মরণ করাইয়া দেয়।

(৪) পাঠভেদের যে তিনটি কারণ উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে বৈষ্ণবকবিগণের পদাবলির সম্বন্ধে আরও একটি কারণ বিশেষরূপে কার্যকর হইয়াছে। পূর্ববর্ণিত কারণ-ত্রয়ে রচয়িতার বহুস্ত-লিখিত গ্রন্থেরও কালক্রমে নানা পাঠভেদ সংঘটিত হইতে পারে; কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলি যে সর্বত্রই রচয়িতৃগণ কর্তৃক লিখিত হইয়া বহু সংরক্ষিত হইয়াছে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। লিখিত হইয়া থাকিলেও যে ঐ সকল গ্রন্থ বর্তমান কালের বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা একরূপ নিশ্চিত। পদকর্তৃগণ গ্রন্থের সংগ্রাহক বৈষ্ণবদাস গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন যে তিনি বহু পর্যটনে নানা স্থান হইতে পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহারই পূর্ববর্তী পদ-কর্তা ও পদ-সংগ্রহকার রাখামোহন ঠাকুর তাহার পদামৃতসমুদ্রের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে প্রাচীন পদকর্তৃগণের কোন কোন পদ সম্পূর্ণ প্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁহাকে অপর্যাপ্ত অংশ নিজে রচনা করিয়া দিতে হইয়াছে। একজ্ঞ তিনি প্রোক্তগণের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে পদকর্তৃগণের বহুস্ত-লিখিত গ্রন্থাবলি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে রাখামোহন ঠাকুরকে এইরূপ অপ্রিয় কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইতে হইত না। সুতরাং দেখা বাইতেছে যে বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলি সাংক্ষেপ সম্বন্ধে পদকর্তৃগণের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই,—উহা প্রাচীন কীর্ত্তিনিগাগণের মুখে মুখে গীত হইয়া নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। কোন রচনার এইরূপ মুখে মুখে আবৃত্তি দ্বারা প্রচার হইতে থাকিলে সময়ে ইহার যে কতরূপ বিভিন্ন পাঠ বটিকা থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণব কবিগণের অনেক পদাবলি ভণিতা লইয়া যে পাঠভেদ মূলক মতভেদ দেখা যায়, আমাদের বিবেচনায় এই শেষোক্ত বিষয়টিই তাহার প্রকৃত কারণ। সকল ব্যক্তিরই কোন কোন কবির পবিতার উপর অধিক শ্রদ্ধা দেখা যায়; তাহারা যে কীর্ত্তিনিগাগণের নিকটে অনেক সময়ে তাহাদিগের প্রিয় কবির রচিত অভিমত বিষয়ের গান গাইবার ফরমাইশ করিবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। এখন যদি কীর্ত্তিনিগাগণের সেই বিষয়ে সেই কবির রচিত গান জানা না থাকে, তাহাইলে ব্যবসাদারী জানিলে তাহাকে অল্প কবির রচিত একটি গান

প্রয়োজন মত ভণিতা বদলাইয়া গাইতে হয়। অথবা শ্রোতৃগণের মধ্যেও দুই একজন এমন গোঁড়া থাকিতে পারেন, যে কোন একটি গান শুনিয়া মোহিত হইলে তাহা তাঁহার প্রিয় কবির রচনা ভিন্ন কিছুতেই অপরের রচনা বলিয়া মনে করিতে পারেন না। বস্তুতঃ এই রকম কারণ হইতেই প্রধানতঃ ভণিতা লইয়া গোলযোগ ঘটিয়াছে। এইরূপ গোলযোগ প্রায়শঃ বিখ্যাত পদ-কর্তৃগণের পদ মধ্যেই অধিক দৃষ্ট হয়।

(৫) পাঠভেদের অত্র একটি কারণ আছে। ইহা পূর্বোক্ত কারণগুলির ত্রাস অজ্ঞান-কৃত নহে—ইহা সজ্ঞান কৃত পাঠ-বিপর্যয়। প্রাচীন কাব্যাদির আধুনিক মুদ্রিত সংস্করণে এইরূপ পাঠ-বিপর্যয় অধিক দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে ঐ সকল গ্রন্থের সম্পাদকগণ অনেক স্থলেই প্রাচীন পাঠ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাহা অস্বাভাবিক পরিবর্তন করত নূতনপাঠ উদ্ভাবন করাতেই এইরূপ পাঠ-বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

(৬) মুদ্রাকরের ভ্রম। অনেক স্থলেই হস্তলিপি-গ্রন্থের পাঠে কোন ভুল দেখা যায় না,—কিন্তু মুদ্রাক্ষর সময়ে মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ পাঠবিপর্যয় ঘটিয়া থাকে,—মুদ্রিত পদাবলি গ্রন্থে এরূপ অনেক ভ্রম থাকা সহজেই অনুমেয়।

হস্তলিপিগ্রন্থের পরিচয়

পূর্বে যে কারণগুলির উল্লেখ করা হইল, আমরা এখন উহাদিগের কতকগুলি প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত দিব। পদাবলিসমূহে সামান্য সামান্য পাঠভেদের দৃষ্টান্তের সংখ্যা করা কঠিন—সেইরূপ সামান্য সামান্য পাঠভেদ না দেখাইয়া যেখানে পাঠভেদবশতঃ অর্থের নিতান্ত বিপর্যয় হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করিব। তৎপূর্বে যে কয়েকখানা হস্তলিপি গ্রন্থ হইতে আমরা পাঠভেদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব, তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

১ম—পদকল্পতরুর হস্তলিপি গ্রন্থখানার স্বত্বাধিকারী কলিকাতা আভিহীটোলা নিবাসী বৈষ্ণবশাস্ত্রাভিজ্ঞ ৬শ্রামকাল গোস্বামী মহাশয়। হস্তলিপি গ্রন্থে সন তারিখ দেওয়া নাই। লেখা দৃষ্টে ৪০৫০ বৎসরের অধিক প্রাচীন বোধ হয় না। ইহাতে আধুনিক রীতি অনুসারে ‘ব’ ‘র’ ‘ন’ ও বিস্মু দেওয়া ‘ন’ দ্বারা যথাক্রমে ‘ব’ ‘র’ ‘ন’ ও ‘ল’ লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহুগতাদির প্রতিও লেখকের অধিক দৃষ্টি। এই পুস্তকখানার অনুযায়ী প্রতিলিপি অবলম্বনেই বটতলার প্রকাশিত পদকল্পতরু মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ—এই হস্তলিপির পাঠের সহিত—বিশেষতঃ এই হস্তলিপির অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলির সঙ্গে বটতলার মুদ্রিত পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত পাঠের অশ্রুত্যা ঐক্য দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ—এই হস্তলিপি গ্রন্থে যে অক্ষরটি ‘কল্পভেদা’ কি একটু অস্পষ্ট—অর্থাৎ যেখানে প্রকৃত অক্ষরটিকে হঠাৎ অত্র মন্তব্য বলিয়া ভুল হয়, তদিকার স্থলেই মুদ্রিত পুস্তকে ঐরূপ ভুলপাঠ দেখা যায়।

অবিধার জন্ত বর্ণিত হস্তলিপি গ্রন্থকে পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে।

২য়—হস্তলিপি গ্রন্থখানা এতদপেক্ষা প্রাচীন। ইহার শেষে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি দৃষ্ট হয়—“ইতি গীতকল্পতরুগ্রন্থ সমাপ্ত। শকাব্দা আঠার শত উনআশী সাল। ১৮৭৯। শ্রীবৃন্দাবনের সংবৎ ১৮৭৯ মাহ আষাঢ় শুক্লাদেজ ॥ সন ১২২৮ সাল বাদলা তারিখ ৭ আষাঢ়। রোজ শুক্রবার। রথযাত্রাসময় চারি দণ্ড দিবস থাকিতে সম্পূর্ণ হইল। শ্রীশ্রীগৌরভক্তগণার্চিতমস্ত। সাক্ষরমিদং শ্রীবংশীদাসাধমস্ত। মোকাম শ্রীশ্রী৬ম। শ্রীগৌরভক্তচরণেভ্যো নমঃ ॥” এই গ্রন্থখানার “ল” ও “ন” ‘ব’ ও ‘র’ অনেক স্থলেই একরূপ। এই গ্রন্থখানা বৃন্দাবন হইতে সংগৃহীত, ইহার স্বত্বাধিকারী কলিকাতানিবাসী পদাবলি-সাহিত্যাভিজ্ঞ ৬কালিদাস নাথ। আমরা এই হস্তলিপি গ্রন্থকে ৬ পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করিব। কালিদাস-বাবু সংকল্পিত পদকল্পতরুর কিয়দংশ প্রকাশিত হওয়া আনিতে পারিয়া অবাচিতভাবে উক্ত ৬ ও ৬ পুস্তক হইতে সমস্ত পাঠ-ভেদ লিখিয়া হওয়ার জন্ত দীর্ঘকাল পর্যন্ত উক্ত গ্রন্থের আমাদিগের নিকট রাখিয়া নিতান্ত অসুগৃহীত করিয়াছিলেন। তদ্রূপ কলিকাতা শিমুলিয়ানিবাসী নিত্যানন্দ-বংশাবতংস প্রাচীন সাহিত্য-পারদর্শী প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত একখানা পদকল্পতরুর পুরাতন মুদ্রিত পুস্তক ও উপদেশদানে আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছিলেন। পাঠভেদ, দ্রুতহস্তের ব্যাখ্যা ও দ্রুতহস্তাবলীর অভিধান-সম্বলিত আমাদিগের অভিপ্সিত পদকল্পতরুর পরিশিষ্ট অনিবার্য কারণে প্রকাশিত না হওয়ার আমরা ইতঃপূর্বে উক্ত মহোদয়দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাই নাই, তজ্জন্তই এস্থলে হস্তলিপিগ্রন্থের প্রায় হওয়ার এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

৩য়—হস্তলিপি পুস্তকের স্বত্বাধিকারী ২৪ পরগণার অন্তর্গত সিরহাটনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। আমরা এই পুস্তকখানা দেখি নাই। কিন্তু নরেন্দ্র বাবু অসুগ্রহ-পূর্বক আমাদিগের মুদ্রিত পুস্তকের সহিত তাঁহার হস্তলিপি পুস্তক মিলাইয়া পদকল্পতরু ১ম ও ২য় শাখার সমস্ত পাঠভেদ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমরা এই হস্তলিপি গ্রন্থকে ৬ পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করিব। ৬ পুস্তকের সহিত ৬ পুস্তকের পাঠের বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

পাঠভেদ সম্বন্ধে পূর্বেও তিনখানা হস্তলিপি গ্রন্থ প্রধানতঃ অবলম্বনীয় হইলেও এ সম্বন্ধে একখানা মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যও নিতান্ত তুচ্ছ নহে। সে খানা বহরমপুর হইতে স্বর্গীয় রামনারায়ণ বিহারঙ্গ মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত ‘পদামৃতসমুদ্র’। ইহাও ‘পদকল্পতরু’ নাম একখানা সংগ্রহ গ্রন্থ। পদের সংখ্যা ও উৎকর্ষ অনুসারে পদকল্পতরুর পরেই ইহার স্থান নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু গ্রন্থের পৌরূপার্থ্য অনুসারে পদকল্পতরু হইতে ইহা প্রাচীন। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন—

“আচাৰ্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।

কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন ॥

যাঁহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের নিবাস।

হেন শ্রীআচাৰ্য্যপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ ॥

এস্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যানী

জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান ॥” ইত্যাদি।

রাধামোহন ঠাকুর কেবল সংগ্রহকারক নহেন। পদামৃত-সমুদ্রে তাঁহার স্বকৃত ২২৮টি পদ আছে, তন্মিত্ত অত্যাশ্চর্য্য পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ পদ-কর্তৃগণের ৬১০টি পদ তাহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, এবং রাধামোহন ঠাকুর ঐ সকল পদের হ্রস্ব শব্দ ও বাক্যাবলির সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত টীকা গ্রন্থ মধ্যে সংযোজিত করিয়াছেন। রাধামোহনের অরচিত পদের পাঠসম্বন্ধে তাঁহার মতই অত্যন্তের মত হইতে সমধিক গ্রাহ্য। অপরপূর্ব প্রাচীন পদসম্বন্ধেও তাঁহার কথা সহজে খণ্ডনীয় নহে। অন্ততঃ তাঁহার সময়ে ঐ সকল পদের কিরূপ পাঠ প্রচলিত ছিল, তাহা জানিতে হইলেও তাঁহার গ্রন্থট একমাত্র শরণ্য। এরূপ অবস্থায় পদামৃতসমুদ্র ও তাহার সংস্কৃত টীকা যে পদাবলি-সম্পাদকগণের বিশেষরূপে আলোচ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হৃৎপথের বিষয় এই যে রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সংস্কৃত টীকার পদাবলির রসবিচারেই অধিকস্থান পূর্ণ করিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালা বা ব্রজবুলির হ্রস্ব শব্দগুলির অর্থবিচারে অধিক অবকাশ পান নাই। সুতরাং কোন পদটির কিরূপ পাঠ যে তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তাহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত পুস্তকের আবিষ্কার না হইলে বলা যায় না। তবে যে স্থলে মূলের কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ টীকার লিখিত হইয়াছে, মুদ্রিত পুস্তকের সেই সেই শব্দ ও বাক্যগুলি রাধামোহন ঠাকুরের স্বীকৃত বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা বাইতে পারে। আমরা কেবল এইরূপ স্থলেই মুদ্রিত পদামৃত-সমুদ্র-গ্রন্থকে প্রমাণ রূপে ব্যবহার করিতে পারি। মুদ্রিত পুস্তকের সকল পাঠ যে রাধামোহন ঠাকুরের অনুমোদিত নহে, তাহা কতিপয় স্থলে টীকার পাঠের সাহিত্য মূলের বিরোধ-দর্শনই অনুমিত হয়।

পাঠভেদের দৃষ্টান্ত

প্রথমতঃ লিপিকরণের আমাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতেছে।

পদকল্পতরুর “জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস নয়োল্লস” ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ পদে (১৮ পৃষ্ঠা)

“জয় জয় রূপ বট রসময়” বাক্যটির “বট রস” স্থলে ক ও খ পুস্তকে “বটরস” এইরূপ অর্থশূন্য পাঠ দেখা যায়, কিন্তু গ-হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তকে “বটরস” পাঠ আছে।

ঐ গ্রন্থের “জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ্র” পদের ১ম পংক্তিতে “চন্দ্র” পাঠ পূর্বোক্ত সকল হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তকে আছে বটে, কিন্তু ঐ পদের দ্বিতীয় পংক্তি “ব্রজ-কুল-প্লেকুল

‘আনন্দ-কন্দ’ দৃষ্টি করিলে ‘চন্দ’ হলে বে লিপিকরণের ভ্রমবশতঃ “চন্দ্র” লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। সংস্কৃত “চন্দ্র” হইতে প্রাকৃত ‘চন্দ’ ও ভাষায় ‘চাঁদ’ শব্দ হইয়াছে। অকবি গোবিন্দবাস সংস্কৃতাদি ভাষায় অপভ্রংশিত ছিলেন, তাহার রচনায় পার্থক্যে ‘চন্দ্র’ ও ‘কন্দ’ একরূপ হীনমিলন সম্ভবপর নহে। ঐ পদে ‘হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ’ পংক্তির পরে গ পুস্তকে নিম্নলিখিত চারিটি অতিরিক্ত পংক্তি দেখা যায় যথা,—

“মুরতি মদনধনু ভাও বিভঙ্গ।

বিষম কুসুমশর নয়ন তরঙ্গ।

চুড়ায় উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড।

টলমল কুণ্ডল ঝুল মল গণ্ড ॥”

এই পংক্তিগুলি সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদবশতঃ ক ও খ কিস্বা উহাদিগের আদর্শ পুস্তকে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঐ গ্রন্থের “কেমন শুনিলা নাম কেমন মুরলী” ইত্যাদি পদের শেষ পংক্তি (১০৩ পৃঃ) ‘কহয়ে মাধুরী মোর শিরে ধর হাত’। ক খ পুস্তকের ‘মাধুরী’ পাঠ হলে গ-পুস্তকে ‘মাধবী’ দেখা যায়। এই পদটি ব্যতীত ‘মাধুরী’ ভণিতার অন্ত পদ পদকল্পতরুতে নাই, “মাধুরী” নামে কোন পদকর্তা বা পদকর্ত্রী বৈষ্ণব সাহিত্যে পরিচিত নহেন,—পক্ষান্তরে ‘মাধবী’ ভণিতায় এম্টি (২১৭০ সংখ্যক পদ) ও “মাধবী দাস” ভণিতার চারিটি ৭৭৪। ১৭৮৪। ২১৬৯। ২২২০ পদ ঐ গ্রন্থ পাওয়া যায়, সুতরাং এই পদটিতে “মাধুরী” পাঠ ভ্রান্ত বলিয়াই অনুমান হয়।

ঐ গ্রন্থের ২৪৬ পৃষ্ঠায় “দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার” ইত্যাদি ৯ সংখ্যক পদটির পরে খ ও গ পুস্তকে নিম্নলিখিত পদটি দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব দাস গ্রন্থশেষে পদকল্পতরুর প্রত্যেক শাখা ও পল্লবের পদসংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ২য় শাখার ৫ম পল্লবে ১৬টি পদ থাকি জানা যায়, কিন্তু ক-হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তকে ঐ পল্লবে মাত্র ১৫টি পদ পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং নিম্নলিখিত পদটি ভ্রমবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিত্যক্ত পদ যথা—

তথা রাগ

মল্লির ভ্যজি কানন মাহা পৈঠল কাণু মিলন প্রতি আশে।

অতরণ বসন অঙ্গে সব সাজই তাখুল কর্পূর বাসে ॥

সজনি সো মুখে বিপরীত ভেল।

কামু রহল দূরে মনমথ আসি ফুরে সো নাহি দরশন দেল ॥

ফুল শরে জর জর সকল কলেবর কাতরে মহী গড়ি বাই।

কোকিল বোলে ভোলে বন জীবন উঠি বাসি রজনী গোড়াই ॥

শীতল প্রবল গরল সমান ভেল হিমাচল বায়ু ছতাপ ।

লোচনে নীর খীর নাহি বান্ধয়ে কান্দয়ে কাহুরাম দাগ ॥

ঐ গ্রন্থে “সুন্দরি কাঁহে কহসি কটু বানী” ইত্যাদি জ্ঞানদাসের পদে (২৭১ পৃঃ) “তোহে ভেল মলিন বয়ান” এই পংক্তির পরে গ-পুস্তকে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি দৃষ্ট হয়। ক ও খ পুস্তকে এবং মুদ্রিত পুস্তকে তাহা ভ্রমবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বথা,—

“তোহে বিমুখ দেখি, কুরয়ে যুগল আঁখি,

বিদরয়ে পরাণ আমার ।

তুহঁ যদি অভিমানে, মোহে উপেখসি,

হাম কাঁহা বায়ব আর ॥”

ঐ গ্রন্থের “সখী হে না বোল বচন আনি” ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞাপতির পদের (৩৫৮ পৃঃ) “দোষ নাহি মানে গুণ না বিচারে” ইত্যাদি পংক্তি-গুলির পরিবর্তে খ ও গ পুস্তকের পাঠ বথা,—

বে ফুলে ভেজসি সে ফুলে পুঞ্জসি,

সে ফুলে ধরসি বাণ ।

কাহুর বচন এছন চরিত

কবি বিজ্ঞাপতি ভাণ ।

স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার ‘বিজ্ঞাপতি’র সংস্করণে পূর্বোক্ত পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। এবং বটতলার পুস্তকের ‘দোষ নাহি মানে’ ইত্যাদি পাঠের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি কোন হস্তলিপি গ্রন্থেই ঐরূপ পাঠ দেখিতে পান নাই। কিন্তু আমরা বিশেষরূপে মিলাইয়া দেখিয়াছি, ক-হস্তলিপিগ্রন্থে অবিকল ঐরূপ পাঠ আছে। “দোষ নাহি মানে” ইত্যাদি পংক্তি গুলির ভাষা খাঁটি বাঙ্গলা—বিজ্ঞাপতির বঙ্গীয় সংস্করণেও সেরূপ খাঁটি বাঙ্গলা কচিৎ দৃষ্ট হয়, নানাকারণে খ ও গ-পুস্তকের পাঠই আমরা অধিক সঙ্গত বিবেচনা করি।

ঐ গ্রন্থে “দেখ রাই কাহু সপি সনে” ইত্যাদি পদে (৪১০ পৃঃ) “মরম বুঝিহু তোরি” পংক্তির পরে খ-গ পুস্তকে “কহি রাই উঠে রোষাই” অতিরিক্ত পংক্তি দৃষ্ট হয়। এই পদটি চৌপদী ছন্দে রচিত—এইস্থলে একটা চরণের অভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয় এবং উক্ত চরণটি না থাকিলে অর্থেরও ভালরূপ সম্বন্ধ হয় না, কারণ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি “মো সঞে কপট পিরীতি তোহারি, মরম বুঝিহু তোরি” এই ভৎসনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া “ধনা মুখ ফেরি চলি বাই” ভাল বুঝা যায় ন। শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন ;—কখন দাঁড়াইলেন ? ইহার পূর্বে ‘কহি রাই উঠে রোষাই’ দ্বারা আমরা দেখিতে পাই—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কহি অর্থাৎ ঐ কথা কহিতে কহিতে রোষাই—অর্থাৎ ক্রিয়া (ক্রুদ্ধ হইয়া) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মুখ ফিরাইয়া চলিয়া বাইতে লাগিলেন।

লিপিকরণের অনবধানতার এইরূপ দৃষ্টান্ত বহুতর দেখান যাইতে পারে, পাঠকগণের ধৈর্য্যচাতির আশঙ্কায় আর দেখান গেল না।

(২) নির্দিষ্ট অক্ষরলিখনপ্রণালীর অভাবে যে পাঠভেদ ঘটিয়াছে, নিয়ে তাহার কতকগুলি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

পদকল্পতরুর “নিশসি নিহারসি ফুটল কাষ” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদে (৫৭ পৃঃ)—ক হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তকে “আন হলে অঙ্গ নয়ান হলে পঙ্খ। সঘনে গতাগতি করসি একান্ত ॥” ‘অঙ্গন আন’ শব্দ দুটির ‘আন’ হলে কোন হস্তলিপিতে ‘য়ান’ লিখায়, ‘অঙ্গন য়ান’ কথার অর্থ না বুঝিয়া কোন লিপিকর সম্ভবতঃ ‘অঙ্গনয়ান’ বুঝিয়া ঐরূপ লিপি করিয়াছেন। সম্ভবতঃ “অঙ্গনয়ান” পাঠে কোন মর্থ হয় না। শ্রীরাধা নব অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাগিয়া—কোন ছোট অঙ্গনে ও কেনি—হলে পথে সর্বদা গতাগতি করিতেছেন, ইহাই পংক্তিষয়ের অর্থ। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রের টীকায় মূলের উক্ত শব্দগুলি ব্যাখ্যাত না হইলেও তিনি যে পদের তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য “অমৃতবসিতাম্রিক্সামন্তী পুনশ্চ প্রবিশস্ত্যাসৌ” ইত্যাদি সপ্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেও ছল করিয়া ঘরে ও বাহিরে যাতায়াত বুঝায়, সুতরাং ‘অঙ্গনয়ান’ হলে ‘অঙ্গন আন’ই শুদ্ধ পাঠ। ইহা ওর কারণ অথবা পদ-চ্ছেদেরও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত বটে।

পদকল্পতরুর ‘অলখিতে হামে হেরি বিহমলি থোরি’ এই সুবিখ্যাত বিভাগতির পদে (১৪৪ পৃঃ) ক ও গ পুস্তকে নিম্নলিখিত পংক্তিষয় দৃষ্ট হয় যথা,—

“লীলা-কমলে ভ্রমরা কিরে বারি।

চমকি চলি ধনী চকিত নেহারি ॥”

কাব্যবিশারদ মহাশয় তাহার বিভাগতিতে এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার কৃত ঐ দুই পংক্তির ব্যাখ্যা যথা,—বারি—বারি, নিবারণ করে বা করিয়া। কেমন লীলা-কমলে-ভ্রমর নিবারণ করিতে করিতে ধনী চকিতের জ্বর চাহিয়া চলিয়া গেল। অথবা বারি—বন্দী—কয়েদী। ভ্রমর কেমন লীলা-কমলে বন্দী হইয়াছে, চকিতের জ্বর দেখিয়া ধনী শিহরিয়া চলিয়া গেল।

কমল ও ভ্রমরের মিলন দর্শনে নবোঢ়া বা অকৃতপুরুষসঙ্গ-রমণীর সঙ্কোচ অশ্রমে ইহা কবিপ্রসিদ্ধি।” কাব্যবিশারদের দ্বিতীয় অর্থ নিতান্ত কষ্টকল্পিত। পুরাকালে বিলাসিনী রমণীগণ হস্তে যে কমল—আধুনিক কালের ভোড়ার জ্বর—ধারণ করিতেন, তাহাকেই ‘লীলা-কমল’ বলা হয়,—লীলাকমলে ভ্রমর বারি অর্থাৎ বন্দী হইয়াছে দেখিয়া নবোঢ়া নায়িকা প্রকৃতি হইলে হাতের লীলাকমল ত্যাগ করাই সম্ভবপর বোধ হয়,—তাহা না করায় ঐ অর্থ বুঝা যায় না। ‘বারি’ শব্দের কয়েদী অর্থও প্রচলিত নহে। বিশেষতঃ পদ্য মুদ্রিত না হইলে তৎসংস্থিত ভ্রমর কয়েদী হইয়াছে বলা যায় কি?—পদ্য মুদ্রিত হইলে ভ্রমর দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং নবোঢ়ার সঙ্কোচের কারণ থাকে না। মাঘে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

বদনদৌরভ-লোভ-পরিভ্রম-

ভ্রমরসম্ম-সমুত্তশোভয়া।

চলিতয়া বিদধে কলমেখলা-

কল-কলোহলক-লোল-দুশাক্ষয়া ॥

বদন-দৌরভ-লোভে ভ্রমিছে ভ্রমরা ;—

সে সম্মমে মনোহর, কিবা ভঙ্গি ভরে,

চলিছে কামিনী, কাঞ্চী বাজে স্রমধুরে,

শোভিছে চকিত নেত্র অলকে সুন্দর।

বিজ্ঞাপতির কবিতার ভাবও অনেকটা ঐ রূপ ; বদনের কিবা একান্ত পক্ষে লীলা-কমলের দৌরভে আকৃষ্ট ভ্রমরকে নিকটে বিচরণ করিতে দেখিয়া নায়িকা সর্কচিহ্ন ভাষে দৃষ্টি নিগ্গেপ করিতে করিতে ক্ষুণ্ণ ভাবে চলিলেন। এ অবস্থায় লীলাকমল দ্বারা ভ্রমরকে বারণ করা খুব স্বাভাবিক ;—কিন্তু এখানে ভ্রমরা শব্দের পরে দ্বিতীয়া বিভক্তিবাচক ‘ক’ ‘কো’ ‘কে’ কিবা ‘কি’ না থাকা একটু বিচিত্র—বিশেষতঃ যখন পরেই ‘কিয়ে’ শব্দ রহিয়াছে। দ্বিতীয়া বিভক্তি স্থলে ‘কিয়ে’ কেখনও ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু খ হস্তলিপিতে ‘ভ্রমরা কিয়ে’ স্থলে ‘ভ্রমরা কি এ’ পাঠ আছে। এই পাঠ স্বীকার করিলে সকল দিকেই সঙ্গত হয়। সম্ভবতঃ ‘এ’ স্থানে ক ও গ হস্তলিপি আছে ‘য়ে’ লেখায় এবং অথবা পদ-চ্ছেদ করায় ঐ পাঠবিভ্রাট ঘটয়াছে। অথবা মৈথিলী হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় প্রায় সর্বত্র ‘এ’ শব্দের পরিবর্তে ‘যে’ শব্দ (উচ্চারণ=ইয়ে) ব্যবহার হয় ; বোধ হয় এখানে ‘ভ্রমরা কি যে’ পাঠ ছিল। মৈথিলী লিখন ও উচ্চারণ পদ্ধতি অনুসারে তাহাই শুদ্ধ পাঠ—কিন্তু বাঙ্গলায় ‘যে’ শব্দকে ‘জে’ বলা হয়, ‘ইয়ে’ বলা হয় না—এজন্য বাঙ্গলায় ‘যে’ শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ হইবে না বলিয়া ‘য়ে’ লিখা হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী লিপিকরণ উহার অর্থ না বুঝিয়া অথাপদচ্ছেদ করত ‘ভ্রমরা কিয়ে’ করিয়াছেন। ইহা ওয় কারণ পদ-চ্ছেদেরও একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বিজ্ঞাপতির “নমুণ্ডা বদনী ধনী বচন কহসি হসি” ইত্যাদি পদে (প-ক-ত ১৪৬ পৃঃ) নিম্নলিখিত পর্য্যাক্ষর আছে,—

“কাজেরে রঞ্জিত বলি ধরল নয়নবর।

ভ্রমর ভুললি জুই বিমল কমল পর ॥”

‘বলি’ স্থলে ক খ পুথিতে ‘বনি’ ও গ পুথিতে ‘বলি’ পাঠ আছে। ক খ ও গ পুথিতে ‘ধরল’ পাঠ আছে। কিন্তু খ পুথিতে অনেক স্থলে ‘ব’ অক্ষরের পরিবর্তে ‘র’ ব্যবহৃত হইয়াছে—এজন্য ঐ পুথিতে ‘ধরল’ শব্দকে ‘ধবল’ও পড়া যায়। কাব্যবিশারদ মহাশয় ‘বলি ধবল’ পাঠ গ্রহণ করিয়া অর্থ করেন ;—

“সুন্দর ধবল নয়ন কাজলে রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইল, যেমন বিমল কমলের উপরে

ভ্রমর ভূগিয়া রহিয়াছে।" পাঠান্তর্গত 'বলি' শব্দ শেষে সন্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়।" ফলতঃ 'বলিয়া' অর্থে 'বলি' শব্দ ধরিলে ঐ 'বলি' শব্দ উক্ত পংক্তির শেষে না বসাইলে ওরূপ অর্থ হয় না। বিশেষতঃ তাহাতেও কাব্য না হওয়ায় 'বোধ হইল' এই বাক্যলী বসাইতে হয়। এরূপ কষ্ট কল্পনা করিয়া অর্থ করা অপেক্ষা অর্থ হয় না বলাই অধিক মঙ্গল। বস্তুতঃ এস্থলে ক ও গ পুঁথির 'বলি' পাঠই হইবে। বন দাতু কামদেয়বৎ, ইহার সজ্জিত, সুবিস্তৃত (well set) ইত্যাদি অনেক অর্থ দেখা যায়। Fallon কৃত হিন্দী-ইংরাজী অভিধানে 'বনা' শব্দ দ্রষ্টব্য।

"বলি বনমাল আজামুলগ্নিও"—প-ক-ত ২০১৩

"মালতী মাল হিয়ে বলি দাজ"—ঐ ২৫৯৭

"ধরল" পাঠ যে অন্তরু বলাই বাহুল্য। কোন হস্তলিপি লেখক 'ব' অক্ষরের পরিবর্তে প্রাচীন রীতি অনুসারে "র" লিখায় পরবর্তি সময়ের লেখকগণ তাহা "র" মনে করায় এই পাঠবিপর্যাস ঘটয়াছে। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে মৈথিল হস্তলিপিতে অন্তরু "ব" "র" অক্ষরের ভ্রাম লিখিত হইত।

"বামা হে ক্ষম অপরাধ মোর"—এই জ্ঞানদাসের পদে (৩৬৪ পৃঃ) নিম্নলিখিত পংক্তি লিখি আছে ;—

"এত পরিচার করিয়ে তোমার,

মনে না ভাবিত আন।

করজ লিখিয়া লেহয়ে আমার,

দাস করি অভিমান ॥"

ক ও গ পুস্তকের 'করজ' স্থলে খ পুস্তকের 'কবজ' পাঠ ও গ পুস্তকের 'লেহয়ে' স্থলে ক খ পুস্তকে 'লেহ' যে' পাঠ আছে। 'কবজ' শব্দটি আরবী ভাষার, 'কবজ্' (অর্থ = দখল) হইতে জাত, ইহার অর্থ দখলনামা বা দখলহুচক দলিল। শতাব্দিক বৎসর পূর্বের অনেক 'কবজ' এখনও বঙ্গের জমিদার ও তালুকদারগণের গৃহে পাওয়া যায়। প্রাচীন লোকদিগের নিকট গুনিয়াছি যে, এখন যেসকল ভূম্যাদি বিক্রয়ের জন্য কেবল 'কবালা' সম্পাদিত হয়, তখন সেসকল হইত না; 'কবালা' ও 'কবজ' দুই খানা দলিল সম্পাদিত হইত,—কবালা দ্বারা স্বত্বভাগ ও কবজ দ্বারা স্বত্বভাগসহ জমিতে দখল দেওয়া হইত। 'করজ' শব্দে কর্জ বা দেনা বুঝায়, ইহাতে দলিল-খত বা ভ্রাম-বুঝায় না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিছেন যে, আমাকে কিনিয়া 'কবজ' লিখিয়া লও এবং আমাকে কৃতদাস বলিয়া জ্ঞান কর। প্রায় শতাব্দিক বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে কবালা দ্বারা দাসদাসী বিক্রয় হইত—এইরূপ এক খানা দলিল অতাপি আদ্যদিগের গৃহে বিস্তারিত আছে। 'করজ' শব্দের যদি "খত" অর্থও ধরা যায়, তাহা হইলেও এস্থলে তাহা খাটে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট হইতে টাকা পয়সা বা প্রেম করজ

আনিতে চাহিতেছেন না, কিন্তু বিনা মূল্যে নিজকে বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। ‘লগ’ অর্থে ‘লেখ’ প্রসিদ্ধ; ‘লেখয়ে’ শব্দের অর্থ ‘লয়’ করা যাঁতে পারে, কিন্তু ‘লগ’ কোনরূপে হয় না। গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ তথা-কবিত্ত ব্রজবুলিতে পদাবলি রচনা করিলেও তাহাদিগের ব্যাকরণ খুব দুরন্ত ছিল। তাঁহারা-ক্রিয়াপদের পুরুষে প্রায়শই গোলযোগ করেন নাই। ‘লেখ যে’ পাঠই শুদ্ধ, কোন হস্তলিপিতে যে স্থানে ‘য়ে’ লেখা এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। উগাও অথবা দুইটা পদের একীকরণের দৃষ্টান্ত বটে।

৩। আমরা দ্বিতীয় কারণে পাঠ ভেদের যে কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহাতেই পাঠকবর্গ অথথাপদচ্ছেদ রূপ তৃতীয় কারণেরও দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন; একজ্ঞ আর অধিক বাছল্য না করিয়া আমরা অথথাপদচ্ছেদ ও তাহার অঙ্গীয় অথথা পদদ্বয়ের একীকরণের কয়েকটি প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চতুর্থ কারণের দৃষ্টান্তের আলোচনা করিব।

“সুরত পিয়াসে ন ল পছঁ পাণি” গোবিন্দদাসের এই প্রসিদ্ধ পদের (৪৫ পৃঃ) শেষে দুই পংক্তি যথা—

“তৈখনে রোখত বহি পর সাদ।

গোবিন্দদাস কহ রস মরিসাদ ॥”

ক ও মুদ্রিত পুস্তকের ‘বহি’ হলে খ এবং গ পুস্তকে ‘তহি’ পাঠ আছে।

‘বহি’ শব্দটা হিন্দী ‘বহি’ (উচ্চারণ-ওহি) ধরিলেও কোন অর্থ হয় না। ‘তহির’ অর্থ ‘তাহাতে’—এই পাঠে ও ভাল অর্থ হয় না—আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এ হলে “তৈখনে রোখ তবহি (কিছা তত হি) পরসাদ” পাঠ হইবে। “রোখ তবহি” (কিছা তত হি) এষ্ট দুইটা পদকে অথথারূপে ছেদ করায় একপা পাঠবিপর্যায় ঘটিয়াছে। এষ্ট পদে নবোঢ়া মধ্যা নাগিকার সম্বন্ধেবর্ণনা করা হইয়াছে, পদকর্ত্তা নাগিকার তুল্য লজ্জা ও হর্ষ সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন—পরিশেষে বলিয়াছেন “তৈখনে (সেই ক্ষণে) রোখ (রোব বা ক্রোধ) তবহি (তখনই) পরসাদ (প্রসন্নতা)।” অর্থাৎ নাগিকা তখন রাগ করিয়া আবার তখনই সম্ভাষণ প্রকাশ করিতেছেন। “তব হি” হলে “তত হি” পাঠও প্রায় সেইরূপ অর্থই হয়। ‘তত হি’ অর্থ ‘তার পর’। ‘রোখ তবহি’ পাঠই সমীচীন।

“সুন মাগব রাধা স্বাধীনা স্বাধীনা ভেল” ইত্যাদি নিজাপতির পদের (৩৮৩ পৃঃ) শেষে পংক্তিগুলি যথা,—

“হেন বুঝি কুলিণ সাব তছু অন্তর

কৈছে মিটারব মান।

কহ বিজাপতি বচন অব সমুচিত।

আপে সিধারসি কান ॥”

ক ও মুদ্রিত পুস্তকের ‘সিধারসি’ হলে খ-পুস্তকে ‘সিধারব’ ও গ-পুস্তকে ‘সিধারহ’ পাঠ আছে। ‘সিধারহ’ পাঠই সমীচীন বটে। সংস্কৃত গমনার্থক সাদ বাহু (Fallow

অন্যক্রমে সিদ্ধ হাত লিখিয়াছেন) হইতে হিন্দী সিদ্ধার হাত উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত নাট্যাদিতে “সিদ্ধার” শব্দ “ইত্যাদি” রূপে বহুল প্রয়োগ ও হিন্দীতে “সিদ্ধার” হাতের “সিদ্ধারে” (গমন করে), ইত্যাদি ক্রিয়াপদ দেখা যায় যথা,—

“সদা রহত বরখা ষত্ হাম পর ধব সে শ্রাম সিদ্ধারে” সুরদাস।

(Hallon কৃত হিন্দী-ইংরেজী অভিধানের ৭৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্যঃ)

কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার বিজ্ঞাপতিতে—“সিদ্ধারহ” পাঠ ধরিয়া উহার “গমন কর” অর্থ বুঝিতে না পারিয়া “সিদ্ধারহ” স্থলে “সিদ্ধারসি” পাঠ করিয়া করত—“কানাই—আপনি সরল থাকিও। সিধা—সোজা, সরল।” এইরূপ হাস্যজনক অর্থ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যখন শ্রীকৃষ্ণের উপহার কুন্ডল ইত্যাদি সহ দূতী যাইয়া শ্রীরাধার মানভঙ্গ করিতে পারিল না এবং যখন “কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই, বৈঠলি বিমুখ বিরাগে”; তখন বিজ্ঞাপতি সমুচিত বাক্য বলিতেছেন। “অব্ (এখন) কান (হে কৃষ্ণ) আপে (নিজে) সিদ্ধারহ” (গমন কর) অর্থাৎ শ্রীরাধার নিকট নিজে যাইয়া তাঁহার মান ভঙ্গ কর। ইহার পরেই পদ আছে—“ওনি সখী বচন মন হি অহুমান। নাগরী বেশ বনাওল কান।” ইত্যাদি

“আওল ষতুপতি রাজ বসন্ত” বিজ্ঞাপতির এই স্পষ্ট সিদ্ধ পদে (১০৩৬ পৃঃ) নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় আছে,—

“কুন্দবিল্লী তুল ধরল নিশান।

পাটল তুল অশোক দল বান।”

ক ও বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে ২য় পংক্তি—

“পাটল তুল অশোক দলবান।”

খ পুস্তকের পাঠ—

“পাটল তুল অশোক দলবান।”

অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবুর বিজ্ঞাপতির পাঠ—

“পাটল তুল অশোক দলবান।”

অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবুর মতে ইহার অর্থ এই যে দলবান (পত্রবিশিষ্ট) অশোক (অশোক বৃক্ষ) পাটল (সং-পতন, প্রাপটন, ভাব্য-পাটন) অর্থাৎ নগরতুল্য হইল। কাব্যবিশারদ ঐ দুই চরণের সহিত পরবর্তী দুই চরণ “কিংগুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ। হেরি শিশির ঝতু আগে দিল ভঙ্গ” একত্র গাইয়া অর্থ করিয়াছেন—“পাকুল, শিমুল (তুল, তুর, তুর, শিমুল) দলবান অশোক, কিংগুক, লবঙ্গলতাকে এক মনে দেখিয়া শিশির বা শীতঋতু পলায়ন করিল।” অক্ষয় বাবুর অর্থ কষ্টকল্পিত বা বৈচিত্র্যহীন। কাব্যবিশারদের ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত না হইলেও তাহাতে কাব্যের রসাত্মকতা কিছু মাত্র নাই,—পরন্তু তাহাতে কুন্দবিল্লী ইত্যাদি পয়ারের (Couplet) শেষ ছত্রের সহিত পরবর্তী পয়ার “কিংগুক লবঙ্গলতা” ইত্যাদি মিশাইয়া অর্থ করা হইয়াছে। সংস্কৃত করণের শ্লোকের (Stanza) আদ

প্রাচীন কবিগণের পয়ার স্বাধীন বটে, উহার এক চরণের সহিত অর্ধবোধের ক্ষুদ্র পরবর্তী পয়ারের অল্প প্রাচীন সাক্ষ্যে কচিং দৃষ্ট হয়, সুতরাং এক্রূপ অল্প ও অর্থ সমর্থনযোগ্য নহে। বিজ্ঞাপতি এই বসন্তবর্ণনার পদে বসন্তকে ঋতুরাক্রমে বর্ণনা করিয়া সুবোধে বসন্তের রাজোচিত সস্তার প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে জয়দেবের—“ললিত লবঙ্গলতা পরিশীঘন” ইত্যাদি গীতের ভাব আনিয়া পড়িয়াছে। যথা,—

“মদন-মহীপতি-কনক-দণ্ড কচি-কেশর-কুমুম-বিকাশে” (জয়দেব)

“কেশর কুমুম ধরল হেমদণ্ড” (বিজ্ঞাপতি)

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস “পাটল তুণ অশোক-দল বান” পংক্তিতেও বিজ্ঞাপতি জয়দেবের—“মিলিত-শিলীমুখ-পাটল-পটল-কৃত-স্মর তুণ বিলাসে”। এই ভাব গ্রহণ করিয়াছেন—তবে “শিলীমুখ” শব্দটিত শ্লেষ অলঙ্কার সংস্কৃত ভিন্ন ভাষার ভাঙ্গরূপ প্রকাশ হয় না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করত অশোক পুষ্পগুলিকে বাণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এখানে ‘দল’ শব্দের অর্থ সমূহ, পত্র নহে। পাটলি বা পাটল তুণাকৃতি পুষ্পবিশেষ, জয়দেব ও বিজ্ঞাপতি উভয়েই তুণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আর অরবিন্দ, অশোক, নবমল্লিকা প্রভৃতি মদনের পঞ্চবাণ প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং ইহাদের মধ্যে যেটিকে তচ্ছা মদনের প্রিয় সখা বসন্তের বাণরূপে বর্ণনা করিলে অসম্ভব হইত না,—কিন্তু বিজ্ঞাপতি বাছিয়া অশোকগুলিকে বাণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সুন্দর পুষ্পরচিত মদন মূর্তির হাতে রঞ্জন-ফুলের বাণ দিয়াছিলেন—আকৃতিতে রঞ্জন ও অশোক প্রায় এক রূপ এবং মদনের পঞ্চশরের মধ্যে সর্বাঙ্গের অধিক শর-লক্ষণাক্রান্ত,—অতএব উপমা যে সুন্দর হইয়াছে বলা বাহুল্য। হস্তলিপি লেখকগণ ‘দল’ ও ‘বাণ’ দুইটি শব্দকে ভ্রমবশতঃ একত্র করায় এইরূপ পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

৪। ভণিতার গোলযোগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

“কান্নুক শেষ দশা গুলি মুগধিনী” ইত্যাদি পদের (১৬৫) ভণিতার ক ও মুদ্রিত পুস্তকে “কহ রাধাবল্লভ দাস” দৃষ্ট হয়। খ-গ পুস্তকে ‘রাধাবল্লভ’ স্থলে “রাধামোহন” পাঠ দেখা যায়। রাধামোহন ঠাকুর কৃত পদামৃতসমুদ্রে তাঁহার প্রসিদ্ধ ২২৮টি পদ-সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে উক্ত গ্রন্থে হইতে ১৮৬টি পদ বৈকবদাস পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি পদকল্পতরুর শেষে লিখিয়াছেন যে,—

“আচাৰ্য্যঃ প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।

গ্রন্থঃ কৈলা পদামৃতসমুদ্রঃ আখ্যানঃ॥

তাঁহার যত্নে পদ সব তাহা লৈয়া” (১০৪ পৃঃ)।

যত্নে পদ বাক্য দ্বারা এখানে রাধামোহনের সকল পদ বুঝিলে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে—সুতরাং পদকল্পতরু গ্রন্থে উক্ত ঠাকুরের যত্নে গুলি পদ-সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা

সমস্তই পদামৃত-সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাই বৈষ্ণবদাসের লেখার তাৎপর্য বুঝা যায়। সুতরাং রাধামোহন ঠাকুরের যে পদ তাঁহার নিজের পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থে নাই—তাহা পদকল্পতরুতে থাকার কথা নহে। “কাল্পক শেষ দশা” ইত্যাদি পদটি পদামৃত-সমুদ্রে নাই, সুতরাং খ ও গ পুস্তকের পাঠে “রাধামোহন” পরিবর্তে মুদ্রিত পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। “রাধাবল্লভ” ভণিতার ১৬টি পদ, পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে, ঐ সকল পদের সংখ্যা যথা—২২০।৭৭১।১৩৮৭।১৬৫৯ ১৭২৩।১৯৬৭।২০৭১।২২৩৭।২২৫৪।২২৯১।২২৯২।২২৯৩।২২৯৮।২২৯৯।২৩০৭।২৩০৮।

“সখী হে কাহে কহসি কটুভাষা” এই প্রসিদ্ধ পদে (৩৪৫ পৃঃ) নিম্নলিখিত ভণিতা দৃষ্ট হয়,—

“চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব
তবহঁ মিলব হরি সঙ্গে ॥”

ক-খ-গ হস্তলিপিগ্রন্থে পদামৃতসমুদ্রে ও পদকল্পগতিকায় ঐরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার বিজ্ঞাপতিতে জানি না কোন হস্তলিপি পুস্তক দৃষ্টে নিম্নলিখিত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন,—

“বিজ্ঞাপতি কহ জীউ নিকসব
তব তি না মিল হরি সঙ্গে”

অনেক স্থলে শেষ ছত্রস্থ “চম্পতি পৈড়” ইত্যাদি রূপ দেখা যায়, ইহা স্রীকার কবিতা তিনি লিখিয়াছেন, “সামু-বৈষ্ণবগণ বলেন চম্পতি পৈড়, নারিকেল গাছ। কপূর মিলনে ডাবের জল বিবতুলা হয়।” ইত্যাদি বিজ্ঞাপতি ১২৩ পৃঃ। কাব্যবিশারদ মহাশয় এতলে বড়ই কৌতুকজনক ভুল করিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃত টীকার লিখিয়াছেন, “চম্পতঃ শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্রনন্দহারাজন্ত মহাপাত্র চম্পতি-রায় নামা মহাপ্রভুত আদীং স একাঙ্গীতকর্তা তন্তু সিদ্ধিদশায়ামপি তন্মায়। অপক-নারিকেলঃ উৎকলদেশীয়ৈঃ ‘পৈড়’ ইতি ভূষিতা উচ্যতে,” (প. স. ১৯৯ পৃঃ)। বিশারদ মহাশয় এই টীকা নিজে না দেখিয়া সম্ভবতঃ কোন বিজ্ঞাশূন্য সামু বৈষ্ণবের বাক্যে নির্ভর করিয়া—“চম্পতি পৈড়” বাক্যের অর্থ নারিকেল গাছ স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি যে পুস্তক হইতেই “বিজ্ঞাপতি কহ” ইত্যাদি ভণিতা গ্রহণ করিয়া থাকুন,—এই পদটি যে চম্পতিকৃত ভাষাতে কোন মন্দেই নাই। রাধামোহন ঠাকুর অনুন ছই শত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থকার, তাঁহার দ্বিত পাঠ অপেক্ষা এই পদের প্রাচীনতর পাঠ বিদ্যমান আছে বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং শ্রেষ্ঠতর প্রমাণের অভাবে ইহা চম্পতির পদ বলিয়াই গ্রহণ করা সঙ্গত। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এই পদটি মুদ্রিত পদকল্পতরুর ৪৮০ সংখ্যক পদ রটো—এই গ্রন্থের ৪৭৯ ও ৪৮১ সংখ্যক পদ চম্পতিভণিতাযুক্ত, এই তিনটি পদের বিষয় ও রচনা প্রণালী ইত্যাদির আলোচনা করিলে তিনটি পদই যে একজনের রচিত, তাহাতে কোন

সন্দেহ থাকে না। পঞ্চাঙ্গের বিজ্ঞাপতির রচনার সহিত ঐ সকল পদের ভাব ও ভাবাগত কোন সাদৃশ্য নাই। চম্পতি ভণিতায়ুক্ত ৯টি ও চম্পতিরায় ভণিতায়ুক্ত ১টি পদ পদকল্প-তরিতে সংগৃহীত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুরের মতে চম্পতিরায় ও চম্পতি অভিন্ন। তাঁহার পদগুলির সংখ্যা যথা—চম্পতিভণিতায়ুক্ত ৪৭৯।৪৮।৪৮।৫৩।৭২।১৬৫৬।১৬৬২।১৬৭২।১৭৪১ সংখ্যক এবং চম্পতিরায় ভণিতায়ুক্ত ১৯৫৫ সংখ্যক পদ।

“ফল্গুনে গৌরান্দ চাঁদ পূর্ণিমা দিবসে” ইত্যাদি ত্রিসিদ্ধ পদটিতে (১২৭১ পৃঃ) মুদ্রিত ও ক-খ-গুস্তকে লোচনদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু জয়ানন্দ কৃত যে আদি “চৈতন্যমঙ্গল” গ্রন্থ অনিচ্ছিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে,—তাহাতে এই পদটি জয়ানন্দকৃত দেখা যায়। আমাদিগের বিশ্বাস, যেরূপ পূর্ববর্তী অনেক কবির রচনা ও ভাব প্রায় অবিকল গৃহীত হইয়া ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞানন্দের তাঁহার নিজ নামে প্রচারিত হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ জয়ানন্দের কবিতা শ্রেষ্ঠতর কবি লোচনদাসের নিজস্ব হইয়া গিয়াছে।

৫। পদাবলি-সম্পাদকগণের ইচ্ছাকৃত পাঠ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা—কার্য্যটি অতি অপ্রিয় ও কঠিন বটে। আমরা যে দৃষ্টান্ত দেখাইব, তৎসম্বন্ধে পদাবলি-সম্পাদক বলিতে পারেন, যে তাঁহার কোন হস্তলিপির মধ্যে অবিকল ঐরূপ পাঠ দেখিয়াছেন—তাহা হইলেই ত আমরা নিরুপায়। নানা কারণে আমরা এস্থলে ইহার কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না;—কেবল ইহাই বলিতে চাই “গোলে হরিবোল” দেওয়ার আর সময় নাই, যিনি যে হস্তলিপির পাঠ গ্রহণ করেন—ভূমিকায় তাহার স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া একান্ত সম্ভব। তজ্জপ না করিলে ঐ হস্তলিপির উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা বলা যাইতে পারে না। পদ-কল্পতরু অপেক্ষা বহুগুণে বড় ও উৎকৃষ্ট পদাবলিসংগ্রহ কোন কোন ব্যক্তির নিকট থাকার বিষয়ে অনেক কথা শুনা গিয়াছে,—কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী কোন কোন ব্যক্তির বহু চেষ্টায়ও ঐ গ্রন্থের দর্শন সুখ দিগা উঠে নাই—তজ্জপ কোন কোন পদাবলি-সম্পাদক ভূমিকায় পদকল্পতরুর ২৫০০ খানা হস্তলিপি তুলনা করার উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থের বিষয় আমরা পদ-কল্প-তরুগ্রন্থ মুদ্রাক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া বহু চেষ্টায়ও ঐ সকল ব্যক্তির নিকট হইতে ২১০ খানা হস্তলিপি গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মুদ্রাক্ষণ অনেক দূর অগ্রসর হইলে প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী বৈষ্ণবশাস্ত্রাভিজ্ঞ যে মহাত্মগণের নিকট হইতে অবাচিতরূপে হস্তলিপিগ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ হস্তলিপি গ্রন্থ পাওয়ার পূর্বেই কেবল মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বনে ঐ গ্রন্থের ১ম, ২য়, ৩য় ও চতুর্থ শাখার কিয়দংশ মুদ্রিত হয়,—অতএব আমাদিগকে অসত্য। অনেক স্থলে অল্পমানের উপর নির্ভর করত বটতলার পুস্তকের অনেক অশুদ্ধ পাঠ সংশোধন করিতে হইয়াছে—তাহাতে অনেক স্থলেই অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। ইচ্ছাছিল যে ঐ গ্রন্থের একটা বিস্তৃত পরিশিষ্ট প্রকাশ করিয়া সমস্ত আবশ্যিক পাঠভেদ ইত্যাদি তাহাতে প্রদর্শন করিব, পদাবলির প্রথম ছত্রের আভিধানিক

ক্রমে যুটী, পদকর্তৃগণের যুটী ও পদ সংখ্যা ও মুদ্রিত গ্রন্থের ৪২১ পৃষ্ঠা পাঠভেদে সম্বলিত গ্রন্থ ২৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উক্ত পরিশিষ্টে মুদ্রিতও হইয়াছিল, আরও ৭০০৮০০ পৃষ্ঠার আমা-
নিগের অতীত পদাবলির অভিধান ও ছন্দ স্থলের টীকাগই পরিশিষ্টে সমাপ্ত হইত, কিন্তু
অনিবার্য কারণে ঐ পরিশিষ্ট আর মুদ্রিত হইতে পারে নাই। সুতরাং বাঙ্গালা-সাহিত্যের
একটী গুরুতর অভাব রহিয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ এই অভাব নিবারণের জন্ত
প্রতী হইবেন কি ?

৬।—মুদ্রাকরের ভ্রমের বিষয় অধিক বলা বাহুল্য। পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন
যে মুদ্রাকরণে অক্ষরমণ্ডিবেশ করিতে অনেক সময়েই ভুল, এমন কি সময়ে সময়ে দুই
চারিটা চরণও ভ্রমবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। হস্তলিপির সহিত উত্তম রূপে না
মিলাইয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে ঐ সমস্ত ভুল থাকিয়া যায়। যখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনেও
এইরূপ ভ্রম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়া যায় না, তখন নিতান্ত অসতর্কভাবে সংশোধিত ও
মুদ্রিত বটতলার পুস্তকে যে এইরূপ ভ্রমের শত শত দৃষ্টান্ত থাকিবে, তাহাতে বিচित्र কি ?
তবে সত্যের অমুরোধে ইহা বলিতে হইবে যে, বটতলার আধুনিক পদকল্পতরু ইত্যাদি
গ্রন্থে বেক্রপ রাশি রাশি মারাত্মক ভুল দেখা যায়, অন্ততঃ ১০৮০ বৎসরের প্রাচীন মুদ্রিত
পুস্তকে সেক্রপ ছিল না, কি জ্ঞাত বটতলার এরূপ অবনতি ঘটিল তাহা আলোচ্য বটে।
বটতলা প্রথম অবস্থায় ভাল মন্দ বেক্রপে হউক বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাচীন রত্নগুলি ধৈ-
র্য্য করিয়াছে, তজ্জন্মই আমাদেরকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।

বটতলার সংস্করণের মুদ্রাকর ভ্রমের শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতে পারে। পাঠক-
গণের ধৈর্য্যচাঁড়িভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল না :—

পদকল্পতরু পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত অশুদ্ধ পাঠ	হস্তলিপির শুদ্ধপাঠ
২	১০	গৌরব	গৌরব কক
২২	২	তা হেরে	তাহ রে
২৩	১৬	ভা যে	রসে দাযে
২৮	৭	আছয়ে	বাড়য়ে
৫৫	৭	নব	নীর
৫৬	৮	পুরল	পুলক
৫৩	৩	চরণ	অভরণ
৬১	১১	ধীর	ধীর
৭৬	১৭	বিষমাকরণ	বিষ বিষমাকরণ
৭৮	৬	কুচ	কচ, তত্যানি।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্, এ।

আয়ুর্বেদে অস্থিবিজ্ঞা প্রবন্ধের মীমাংসা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আয়ুর্বেদে অস্থিবিজ্ঞাবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার একটা বন্ধু বলিলেন, আপনাদের আয়ুর্বেদে শারীর্যাংশ কিছুই নহে। পূর্বে আয়ুর্বেদ-সম্বন্ধে আমার অনুরূপ ধারণা ছিল, কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে আয়ুর্বেদের অস্থিবিজ্ঞা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার অনুরূপ ধারণা হইয়াছে।

অস্থিবিজ্ঞাবিষয়ক প্রথম প্রস্তাবটি আমার হস্তগত হয় নাই। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনরূপ মতপ্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আমার বন্ধু বলিয়াছেন যে, অস্থিসন্ধিগুলি দুই প্রকার যথা—চেষ্ঠাবান্ ও স্থির চেষ্ঠাবান্ অস্থিসন্ধিগুলি প্রয়োজন মত নত ও উন্নত হইয়া থাকে। স্থির অস্থিসন্ধিগুলিতে সেরূপ কোনও কার্য্য হয় না। শাখাচতুষ্টয়, হস্ত ও কটদেশস্থ সন্ধিগুলি চেষ্ঠাবন্ত ইহা সুশ্রুতের মত। প্রত্যক্ষতঃ কশেরুকা সন্ধিসমূহেরও চেষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং সেইগুলিও চেষ্ঠাবান্ সন্ধির উদাহরণ স্থানীয়। এতদ্ব্যতীত ত্রিকস্থ, করোটীস্থ, উরঃস্থ এবং পঙ্কর সন্ধিগুলি স্থির।

এস্থলে আমার বন্ধু চেষ্ঠাবান্ সন্ধির যে লক্ষণ লিখিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর নহে। তিনি বলিয়াছেন যাহা প্রয়োজন মত নত এবং উন্নত হয় তাহাই চেষ্ঠাবান্। বস্তুতঃ কোন চেষ্ঠাবান্ সন্ধিই নত কিংবা উন্নত হয় না। অস্থিই নত কিংবা উন্নত হইয়া থাকে। সন্ধি নত কিংবা উন্নত হইলে তাহার সংযোগ নষ্ট হয়। নষ্ট সংযোগকে তখন আর সন্ধি বলা যাইতে পারে না। তখন সংযোগের পরিবর্তে বিভাগ ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু কোন চেষ্ঠাবান্ সন্ধিই একবার সংযুক্ত ও একবার বিভক্ত হইতে দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ধরিয়া লইলেও অস্থি নত কিংবা উন্নত হয় না, এরূপ চেষ্ঠাবান্ সন্ধিও আছে। যেমন—জাঘস্থি (মালাইচাকী), ইহা নত কিংবা উন্নত হয় না, অথচ চেষ্ঠাবান্। নত কিংবা উন্নত না হওয়া, চেষ্ঠাবান্ সন্ধির লক্ষণ কোথায় পাইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। টীকাকার উল্লন প্রভৃতি চেষ্ঠাবান্ শব্দের অর্থ চল এবং স্থির শব্দের অর্থ অচল করিয়াছেন। ইহাই ঠিক লক্ষণ হইয়াছে। চেষ্ঠাবান্ সন্ধি সকল চল হইলেও তাহার সংযোগ পরিত্যাগ করে না। সংযোগ পরিত্যাগ করিলে আর সন্ধিসংজ্ঞা থাকে না। সন্ধি নত কিংবা উন্নত যে কি অবস্থা, তাহা ধারণার অতীত। সুতরাং আমরা ওরূপ লক্ষণকে বিস্ময়কর লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

সুশ্রুত কশেরুকা সন্ধিকে চল বলেন নাই, না বলাটি তাঁহার পক্ষে দোষ হইয়াছে মনে করিয়া আমার বন্ধু তাহা সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন, কশেরুকা অস্থিকেও প্রত্যক্ষতঃ-

চল দেখা যাইতেছে, সুতরাং তাহাও চল। আমার মতে সুশ্রুত যে কশেরুকা অস্থিকে চল বলেন নাই, তাহাই ঠিক। তিনি চল বলিতে পারেন না, বলিলে ভুল হয়। প্রত্যক্ষতঃ যে উহার কিঞ্চিৎ নতি ও উন্নতি ক্রিয়া উপলব্ধি হয়, তাহা স্নায়ু ও মাংসপেশীর কার্য্য, সন্ধির কার্য্য নহে। ইহার সন্ধি যদি চল হইত, তবে প্রত্যেক সন্ধিতেই তাহার চলস্বক্রিয়ার অনুভব হইত। বস্তুতঃ তাহা হয় না। যে স্থলে সন্ধিশুলি স্থানচ্যুত হয়, অর্থাৎ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়ায় সেই সন্ধিকেই চল বলা যায়। পৃষ্ঠবংশের নতি এবং উন্নতি ক্রিয়ার কশেরুকাস্থির সন্ধি ঘুরিয়া বেড়ায় না, একচুলও স্থানচ্যুত হয় না। সুতরাং সুশ্রুত কশেরুকা সন্ধিকে চল বলেন নাই এবং বলিতেও পারেন না। সুশ্রুত গ্রীবাসন্ধিকেও চলসন্ধি বলিয়া কার্য্যতঃ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু টীকাকার ডগুন প্রভৃতি গ্রীবাসন্ধিকে চল বলিয়াছেন। টীকাকারগণ বলেন, “শাখামুহুরোঃ কট্যাক্ষ” এস্থলে চকারদ্বারা অনুক্ত গ্রীবাসন্ধির গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রীবাসন্ধিও সুশ্রুতের মতে চল।

আমার বোধ হয়, ‘প্রতর’ সন্ধিই আমার বন্ধকে ভ্রান্তিমার্গে উপনীত করিয়াছে। কথটা এই যে, সুশ্রুত গ্রীবাসন্ধি ও কশেরুকাসন্ধিকে “প্রতর” নামক সন্ধি বলিয়াছেন। এই প্রতর-সন্ধি কাহাকে বলে, বুঝাইতে যাইয়া আমার বন্ধ আর একটা ভুল করিয়া বসিয়া আছেন। বলিয়াছেন, “প্রতর = যে সন্ধির অস্থিদ্বয় একখানার উপর আর একখানা বিস্তৃতভাবে থাকিয়া বেশ খেলিয়া থাকে সেই সন্ধির নাম প্রতর সন্ধি। ‘খেলিয়া থাকে’ এরূপ অর্থ তিনি কোথায় পাইলেন তাহা বুঝিতেছি না। ডগুন প্রতর সন্ধির লক্ষণ করিয়াছেন যথা—“প্রতরত্যানেনতি প্রতরো ভেলকঃ তদাকৃতয়ঃ” অর্থাৎ বন্ধারা জলমার্গ উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহার নাম প্রতর বা ভেলক। আমরা আজকাল ভাষায় নৌকা বলিতে পারি। এই ভেলার অর্থাৎ নৌকার আকৃতি বলিয়া এই সন্ধির নাম প্রতর হইয়াছে, কিন্তু খেলিয়া বেড়ান্ন বলিয়া ‘প্রতর’ নাম হয় নাই। আমার বোধ হয়, ডগুন যে “প্রতরতি অনেন ইতি প্রতরঃ” লিখিয়াছেন ইহাই তাহার অপরাধ হইয়াছে। এস্থলে ডগুন যদি সোজা কথায় “প্রতরো ভেলকঃ তদাকৃতয়ঃ” এইরূপ লিখিতেন, তাহা হইলে আমার বন্ধকে ভ্রমে পড়িতে হইত না। বাস্তবিক যাহারা কশেরুকাস্থি প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয় বলিবেন যে উহার আকৃতি দেখিতে অনেকটা নৌকার মতই বটে। যদি কেহ ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি তাহাকে প্রত্যক্ষ করাইতেও প্রস্তুত আছি। গ্রীবাসন্ধি ও কশেরুকা-সন্ধি দুইই এক শ্রেণীর সন্ধি বলিয়া কেহ যেন গ্রীবাসন্ধির ত্রায় কশেরুকা সন্ধিকেও চল বলিয়া ভ্রম না করেন। এক শ্রেণীর সন্ধিই চল ও অচল দুই প্রকারই হইতে পারে। যেমন উদুখলসন্ধি, ইহা চল ও অচল দুই প্রকারই আছে। কক্ষা ও বজ্রণ চল এবং দশন অচল। এইরূপ গ্রীবা ও কশেরুকাসন্ধি, অর্থাৎ গ্রীবাসন্ধি চল এবং কশেরুকাসন্ধি অচল। নিম্নাণ-বৈচিত্র্যই ইহার কারণ।

• অন্তঃপর কোষ্ঠ শব্দে যে কোন স্থান বুঝায়, তাহা বুঝাইবার জন্ত আমার বন্ধ অভিধান

বাকী রাখেন নাই, এবং আয়ুর্বেদে গ্রহ হইতেও দুইটি প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে আমাশয়, পিত্তাশয়, পকাশয়, মূত্রাশয় বা বৃক, রক্তাশয়, হৃদয়, উগ্রুক ও কুস্কুস ইহাদের সাধারণ নাম কোষ্ঠ; সুতরাং কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় হইতে অপান বায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদয় অংশটিকে বুঝাইতেছে। কথাটাকে আরও একটু সরল করিয়া বলিতেছি।

হৃৎকথিত বলিয়াছেন, “একোনবষ্টিঃ কোষ্ঠে” অর্থাৎ ঊনষাটখানা অস্থি সন্ধিকোষ্ঠে আছে। এই প্রসঙ্গে কোষ্ঠ কি তাহাই বুঝাইতেছেন—

কোষ্ঠ = কুক্ষেমধ্যে (মেদিনী চ দ্বিকং)

অন্তর্জঠরং (অমর নানার্থ)

মহাশ্রোতঃ (অরুণদত্ত পাণ্ডুনিদান)

উপরোক্ত আভিধানিক অর্থ এবং অরুণদত্তের অর্থ মনোমত না হওয়ার অবশেষে বলিয়াছেন যে—

“স্থানাত্মামাশিপকাশাঃ মূত্রস্ত কথিরস্ত চ।

হৃৎকথকঃ কুস্কুসস্ত কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে ॥”

অর্থাৎ আমাশয়, পিত্তাশয় প্রভৃতির সাধারণ নাম কোষ্ঠ। সুতরাং কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় হইতে অপানবায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদয় অংশটিকে বুঝাইতেছে।

ইহা একটি অভ্যস্ত আশ্চর্য্য বৃত্তি বলিয়া আমাদের নিকট বোধ হইতেছে। তিনি বলেন আমাশয়, পিত্তাশয় প্রভৃতির সাধারণ নাম যখন কোষ্ঠ, তখন কোষ্ঠ বলিতে হৃদয় হইতে অপান বায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদয় অংশটিকেই বুঝাইবে।

এই কথা বলিয়াই তিনি “কোষ্ঠে” অর্থাৎ কোষ্ঠসমূহে, এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন। আয়ুর্বেদে কোষ্ঠ শব্দের ভুরি ভুরি প্রয়োগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখানে সে সকল উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না। সর্বত্রই কোষ্ঠ শব্দ, রিক্তস্থান, আশয়, অধিষ্ঠান, কোটির বা কোঠা এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ কোষ্ঠ শব্দের ভাষা কোটির বা কোঠ। এবং এই অর্থেই কেহ অন্তর্জঠর, কেহ কুক্ষেমধ্যে, কেহ মহাশ্রোতঃ, কেহ বা মধ্যশরীর অর্থও লিখিয়াছেন।

আমার বন্ধু বাহাদিগকে কোষ্ঠ বলিয়াছেন (হৃৎকথক, কুস্কুস) ইত্যাদি মহাবি চরক প্রভৃতি ভাষাদিগকেই কোষ্ঠাঙ্গ বলিয়াছেন। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে যে, হৃৎকথক-কুস্কুস প্রভৃতি যদি কোষ্ঠাঙ্গ হয়, তবে কোষ্ঠ কি? আমরা বলিব, উহার কোষ্ঠও বটে এবং কোষ্ঠাঙ্গও বটে। অর্থাৎ উহার ক্ষুদ্র কোষ্ঠ বা ক্ষুদ্র কোঠা এবং প্রাচীর-বেষ্টিত বিশাল রিক্তস্থান অর্থাৎ মধ্যদেহ মহাকোষ্ঠ। প্রাচীরসমবিত রিক্তস্থানকেই কোষ্ঠ, প্রাকোষ্ঠ বা কোঠা বলিয়া আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। উল্লিখিত স্থলে শাখা প্রভৃতি শব্দদ্বারা অজ্ঞাত শরীরকে বুঝায় বলিয়া কোষ্ঠ শব্দে মধ্যশরীরকে নির্দেশ করা হইয়াছে। আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ বলিয়াছেন, “শরীর মধ্য কোষ্ঠঃ স্ত্রাৎ” ইত্যাদি; সুতরাং “একোনবষ্টিঃ

কোষ্ঠে ইহার অর্থ এই যে মধ্যশরীরে উনষাটখানা অস্থিসন্ধি আছে। মহর্ষি সুশ্রুত প্রভৃতি শরীরকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন, হস্তপদাদি চারি অংশ, মধ্যশরীর পঞ্চমাংশ এবং মস্তক যষ্ঠ অংশ। এই মধ্যশরীরকে লক্ষ্য করিয়াই সুশ্রুত বলিয়াছেন. কোষ্ঠে একোন্-ষষ্টি অস্থিসন্ধি আছে।

এস্থলে কোষ্ঠ শব্দে মধ্যশরীর না ধরিয়া আমাশয় প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া আমার বন্ধু মহাত্মম করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, কোষ্ঠসমূহে উনষাটখানা সন্ধি আছে। ইহাবারা বোধ হয় যে, আমাশয়াদিতেই উনষাটখানা সন্ধি আছে। বস্তুতঃ তাহা নাই, একখানাও নাই। এবং এস্থলে কোষ্ঠ শব্দের অর্থ আমাশয়াদি ধরিলে, আর কোষ্ঠ শব্দে মধ্যশরীরকে বুঝাইতে পারে না। সুশ্রুত যে মধ্যশরীরকে লক্ষ্য করিয়া কোষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও ব্যর্থ হয়। অতঃপর আমার বন্ধুকে আমি প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আর কখনও কোষ্ঠ ইহার অর্থ কোষ্ঠসমূহ অর্থাৎ (আমাশয়াদি) করিয়া ভ্রমে নিশ্চিত না হন।

অন্তর্জঠরং কুক্ষমধ্যং, মহাশ্রোতঃ, এই তিনটা কথায় কোন স্থানকে বোধ করাইতেছে, আমার বন্ধু সেই সম্বন্ধে নীরব। এ নীরবতার অর্থ বুঝিলাম না। বাহা হউক মহাশ্রোতের অর্থ আমিই লিখিতেছি। যথা—“অন্তঃকোষ্ঠো মহাশ্রোতঃ আমপকাশয়ান্ত্রয়ঃ”। অর্থাৎ অক্ষকাস্থি হইতে আরম্ভ করিয়া অপানদেশ পর্য্যন্ত আমাশয় এবং পকাশয়ের স্থানকে কোষ্ঠ বা মহাশ্রোত বলে। ইহাই অন্তর্জঠর এবং কুক্ষির মধ্য বা মধ্যশরীর।

আমার শ্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত ছর্গীনারায়ণ সেন আয়ুর্বেদে অস্থিবিজ্ঞানবিশয়ে সন্ধিগ্ধ হইয়া অতি দুর্বোধ্য জটিল কয়েকটা বিষয়ের মীমাংসা করিতে না পারিয়া সর্বসাধারণের নিকট ইহার সহজতর জানিতে চাহিয়াছেন। এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে না পারিলে আয়ুর্বেদের প্রতি যাহাদের কিঞ্চিৎগাত্র ভক্তি আছে, আমার বন্ধুর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাহাদের সেই ভক্তি টুকু লোপ পাইবে। এবং যাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাহাদের সেই ভক্তি বা বিশ্বাস বিচলিত হইবে; এই আশঙ্কায় আমি প্রশ্ন সকলের একটা একটা করিয়া যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলাম। যদি বুঝাইবার দোষে কোন স্থল অস্পষ্ট হয়, তবে তাহা জানাইলে আমি পুনরায় সেই সকল স্থল বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রশ্ন। হৃদয়ক্লামনিবন্ধ নাড়ীতে অস্থিসন্ধি থাকিলে তাহার গণনা কোষ্ঠ সন্ধির সহিত করা হইল না কেন?

প্রশ্নটি আরও একটু সরল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। অর্থাৎ সুশ্রুত বলেন, সর্বসমেত অস্থিসন্ধি দুইশত দশখানা। তন্মধ্যে দুই হস্ত এবং দুই পদে মোট ৬৮ খানা। কোষ্ঠে অর্থাৎ মধ্যশরীরে মোট উনষাট খানা এবং গ্রীবা হইতে তদুর্দ্ধে সর্বসমেত ৮৩ খানা। ইহার মধ্যে কঠগত সন্ধিবিশয়ে সন্ধিগ্ধ হইয়া বর্তমান প্রশ্ন করা

হইতেছে, অভিপ্রায় এই যে সুশ্রুত কণ্ঠসন্ধিগণনায় প্রথম বলিয়াছেন, “কণ্ঠ ত্রয়ঃ”, তৎপরে বলিয়াছেন, “কণ্ঠনাড়ীষু অষ্টাদশ” এস্থলে কণ্ঠের অস্থিসন্ধি তিনখানিই বা কোথায়? এবং কণ্ঠনাড়ীর অষ্টাদশ খানাই বা কোথায়? এই প্রশ্নেই আগার বন্ধ কয়েকটা প্রশ্ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্ন এই যে “হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ীতে অস্থিসন্ধি থাকিলে তাহা কোষ্ঠসন্ধির সহিত গণনা করা হইল না কেন? অভিপ্রায় এই যে, হৃদয় এবং ক্লোম বখন কোষ্ঠে অর্থাৎ মধ্যশরীরে তখন তন্নিবদ্ধ নাড়ীর অস্থিসন্ধিগণনাও কোষ্ঠের সহিতই হওয়া উচিত।

উত্তর। এস্থলে “হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধানু” এই পাঠই ঠিক কি না, তাহা বলা কঠিন। মতরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। যথা “গ্রীবাধ্বন্তী ত্রয়ঃ কণ্ঠে কণ্ঠনাড়্যাং নবদ্বয়ং” “হৃদয়ক্লোমফুসফুস-নিবদ্ধানু” “হৃদয়ক্লোমবন্ধতাং নাড়ীষু” “হৃদয়ক্লোমনেন্দ্রাণাং নাড়্যাং” ইত্যাদি। বহু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে এই সকল মুদ্রিত করা হইয়াছে। ইহাতে লিপির প্রমাদ থাকাও অসম্ভব নয়। যাহা হউক এই সাগাথ পাঠান্তর বিশেষ দোষাবহ হইবে না। সকলেরই অভিপ্রায় এক। অর্থাৎ কণ্ঠ এবং কণ্ঠনাড়ী কি, তাহা বুঝিতে পারিলেই সকল তর্কের মীমাংসা হইতে পারিবে। কণ্ঠ শব্দের অর্থ স্বর এবং স্বর উৎপাদক স্থান। যেমন কোকিলকণ্ঠ বলিলে, কোকিলের দ্বার স্বরবিশিষ্টকেই বুঝায় এবং কণ্ঠেলগ্ন বলিলে, কণ্ঠ-প্রদেশে লগ্নই বুঝায়। তেমনই আয়ুর্বেদে কণ্ঠ শব্দে আমরা দুইটি অর্থ পাইতেছি—স্বর উৎপাদক স্থান এবং স্বরবহা নাড়ী। স্বর উৎপাদক স্থানকে সাধারণতঃ আমরা “কণ্ঠা” “কণ্ঠী” বা টুটী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, এবং সমগ্র স্বরবহা নাড়ীকে কণ্ঠনাড়ী বলি। এই কণ্ঠনাড়ী অন্নবহা নাড়ীর পূর্বাংশে অবস্থিত এবং তরুণাস্থিময়। ইহাতে অনেকগুলি স্নায়ু, ধমনী, শিরা প্রভৃতি সংযুক্ত আছে। এই স্নায়ু, ধমনী, শিরাসংযুক্ত তরুণাস্থিময় নাড়ীতে অষ্টাদশখানা অস্থিসন্ধি আছে। ইহার অংশ কোষ্ঠ পর্য্যন্ত ধাবিত হইলেও, ইহার মূলপ্রদেশ এবং অধিকাংশ মূল গ্রীবাপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়াই ইহার সন্ধিসকল উর্দ্ধাঙ্গের সহিত গণনা করা হইয়াছে। এই কণ্ঠনাড়ীকে হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ী বলিবার অভিপ্রায় এই যে এই নাড়ীর সহিত হৃদয়, ক্লোম, নেত্র, বক্রং প্রভৃতির নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ আছে। অতঃপর তাহা দেখান হইবে। এই একটা নাড়ীই বক্ষঃপ্রদেশে ধাবিত হইয়া বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উল্লনের ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট হইলেও তাহারও অভিপ্রায় এইরূপ।

২য় প্রশ্ন। গ্রীবার উর্দ্ধে হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধনাড়ী আছে কি না?

উঃ। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। সুশ্রুত এমন কথা বলেন নাই যে, গ্রীবার উর্দ্ধে হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধনাড়ীতে অষ্টাদশখানা অস্থিসন্ধি আছে। সুশ্রুত গ্রীবাপ্রদেশের অস্থিগণনাকালেই অস্থিময় কণ্ঠনাড়ীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ কণ্ঠনাড়ীতে অষ্টাদশখানা অস্থিসন্ধি আছে। উহা গ্রীবাপ্রদেশেই আছে, গ্রীবার উর্দ্ধে নাই।

৩য় প্রশ্ন। ‘নাড়ীষু’ এই বহুবচন পাঠের সার্থকতা কি?

উঃ। নাড়ীষু এস্থলে বহুবচন প্রয়োগের যে বিশেষ কিছু সার্থকতা আছে, তাহা আমারও বোধ হয় না। “নাড়ীষু” হলে “নাড়্যাং” পাঠও প্রাপ্ত হওয়া যায়। “ত্রীবা-
ষাষ্টী ত্রয়ঃ কণ্ঠে কণ্ঠনাড়্যাং নব দ্বয়ং” ওথা “জুদয়ক্রোমনেত্র্যাং নাড়্যাং মণ্ডলনামকাঃ”
ইত্যাদি। এই নাড়ী একটাই; কিন্তু ইহাই কিঞ্চিৎ অধোখ্যাত হইয়া বহু অংশে বিভক্ত
হইয়াছে। সুতরাং একবচন বা বহুবচনে বিশেষ কিছু দোষ হয় বলিয়া মনে হয় না।

৪র্থ প্রশ্ন। কণ্ঠনাড়ীতে যে চারিখানি অস্থি গণনা করা হইয়াছে এবং যাহাদের তিনটি
সন্ধির কথাও বর্ণিত হইয়াছে সেই কণ্ঠনাড়ীর সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

উঃ। কণ্ঠনাড়ীতে যে চারিখানা অস্থির গণনা করা হইয়াছে, তাহারও অভিপ্রায়
এই যে, কণ্ঠনাড়ীর উদ্ধাংশে যে স্বরোৎপাদক স্থান আছে, যাহাকে আমরা “টুটী” বলিয়া
অভিহিত করি, তাহাতেই চারিখানা অস্থি আছে। উহা কণ্ঠনাড়ীর একটা অংশ বলিয়া
উহাকেই কণ্ঠনাড়ী বলা হইয়াছে। সুতরাং কণ্ঠ ও কণ্ঠনাড়ীর যে সম্বন্ধ আছে তাহা
সহজেই অসুমেয়।

৫ম প্রশ্ন। অস্থিসংখ্যা নির্দেশে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই কেন?

উঃ। অস্থিগণনাকালে প্রতিসংস্কর্তা নাগার্জুনই হউক কিংবা মুশ্রুত স্বয়ংই হউক
অস্থিসংখ্যা নির্দেশ করিতে বাইরা দুইটি মত উল্লেখ করিয়াছেন। একমতে ৩৬০ খানা
এবং অপর মতে ৩০০ খানা। তন্মধ্যে শলাতন্ত্রমতে নাগার্জুন তিন শত খানা অস্থি
দেখাইয়া সন্ধিগণনাকালে আরও অতিরিক্ত কতকগুলি অস্থিসন্ধি দেখাইয়া প্রমাণ
করিয়াছেন যে, অস্থিসংখ্যা তিন শত খানা নির্দেশ করা হইল বটে, কিন্তু অস্থি আরও
অধিক হইবে। কিন্তু কতখানা হওয়া উচিত, তাহা কিছু বলেন নাই। যাহা হউক
নাগার্জুন যে এইভাবে স্বীয়মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টিগত বা নূতন হয় নাই।
আয়ুর্বেদাচার্যগণ এইভাবে অনেকস্থলে মতপ্রকাশ করিয়া থাকেন। যেমন সপ্তধাতু বলিয়াও
কার্য্যক্ষেত্রে আরও কতকগুলি লসিকা প্রভৃতি ধাতু স্বীকার করা হইয়াছে। সন্ধি সম্বন্ধেও
এইরূপ মতভেদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, সন্ধি দুইশত দশখানামাত্র
উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু এই সন্ধি আরও অধিক হইবে। কত অধিক হইবে,
অস্থিসন্ধির সংখ্যাই অধিক হইবে কিংবা স্নায়ু, শিরা প্রভৃতির সন্ধি লইয়া অধিক হইবে
তাহা স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই। যেখানে মতভেদ সেখানেই কিছু না কিছু গোল আছে।
অস্থি এবং সন্ধি বিষয়ে সর্বত্রই মতভেদ আছে। হওয়ারই কথা; কারণ বিষয়টি অত্যন্ত
গুরুতর। কতকগুলি অস্থি আছে, যাহা কেহ অস্থিশ্রেণীতে গণনা করিয়াছেন এবং অপর
কেহ অস্থিমধ্যে গণনা করেন নাই। সেগুলি অস্থি কি না তাহা স্থির হয় নাই। আবার
সন্ধিতেও এমনতর সূন্দর মিলান কতকগুলি সন্ধি আছে, যাহা এক বলিয়াই ভ্রম হয়
এবং শিশুশরীরে যাহা প্রত্যক্ষ হয়, বৃদ্ধশরীরে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। আবার বৃদ্ধশরীরে
যাহা প্রত্যক্ষ হয়, শিশুশরীরে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। ইত্যাদি নানা কারণে কেহ কোনটা

মানেন এবং কেহ বা তাহা মানেন না। অস্থি এবং অস্থিসন্ধি বিষয়ে ঐরূপ মতভেদ হওয়াই সম্ভবপর। আয়ুর্বেদে অস্থি এবং অস্থিসন্ধি বিষয়ে যে মতের অনৈক্য দেখা যায়, তাহার কারণ অনেকস্থলে এইরূপ। আবার কোন কোন স্থলে লিপিকরপ্রমাদও প্রাপ্ত হওয়া যায়। “অংশপীঠগুদভগনিতেষু সামুদ্রগাঃ” “শিরঃ কটিকপালেসু তুরসেবনী” এস্থলে লিপিকর প্রমাদ দেখান হইবে। যাহা হউক অস্থি এবং অস্থিসন্ধি বিষয়ে ঐরূপ মতভেদ থাকার সন্ধিগণনাকালে আরও অধিক দেখান হইয়াছে বলিয়া আমাদের বুঝিবার পক্ষে বরং সুবিধাই হইতেছে। উহা দৃশ্যীয় নহে।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। “কণ্ঠহৃদয়নেত্রক্লোমনাডীসু মণ্ডলাঃ” এই পরবর্তী পাঠে হৃদয় ও ক্লোমের মধ্যে নেত্র শব্দের উল্লেখ থাকিতে বুঝা যায় যে, কতকগুলি হৃদয়নিবন্ধ নাড়ীতে এবং কতকগুলি ক্লোমনিবন্ধ নাড়ীতে।

উঃ। এই প্রশ্নের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। হৃদয় ও ক্লোম শব্দের মধ্যে নেত্র শব্দ থাকিলে যে কতকগুলি ক্লোমনিবন্ধ নাড়ীতে এবং কতকগুলি হৃদয়নিবন্ধ নাড়ীতে বুঝায়, তাহা পূর্বে কখন শুনি নাই। এস্থলে পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, “হৃদয়ক্লোমনেত্রাণাং নাড্যাং মণ্ডলনামকাঃ” এস্থলে হৃদয় ও ক্লোম শব্দের মধ্যে নেত্র শব্দ নাই, এস্থলে কি বুঝাইতেছে? কথা এই যে হৃদয় এবং ক্লোমনিবন্ধ নাড়ী কণ্ঠনাড়ীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। নাগার্জুন প্রভৃতি বলিয়াছেন, যদি প্রতিসংস্কৃত এই সূত্রের কোন স্থলে সন্দেহ থাকিয়া যায়, তবে ঔপদেব, ঔরভ্র, সৌশ্রুত, পৌঙ্কলাবত, করবীর, গোপুর, রক্ষিত প্রভৃতি যে সকল শল্যতন্ত্র আছে, তাহাদের সাহায্যে মীমাংসা করিতে হইবে। ঐ সকল গ্রন্থ হুস্ত্রাপ্য হইলে, আর যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদ্বারাও মীমাংসা করার চেষ্টা উচিত নয় কি?

৭য় প্রশ্ন। হৃদয়ক্লোমনিবন্ধ নাড়ী কোনটি? হৃদয় ও ক্লোম কি?

উঃ। হৃদয় ও ক্লোমনিবন্ধ নাড়ী যে কণ্ঠনাড়ী অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে। এখন হৃদয় ও ক্লোম কি তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

আয়ুর্বেদমতে হৃদয় বলিলে বক্ষঃপ্রদেশ ও হৃৎপিণ্ড উভয়ই বুঝায়। তবে “নাড়ীসু হৃদয়ক্লোমনিবন্ধাসু” এস্থলে হৃদয় শব্দে বক্ষঃপ্রদেশকেই বুঝাইতেছে। কারণ কণ্ঠনাড়ীর সহিত বক্ষঃপ্রদেশেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ক্লোম—পিপাসাহান। ইহার অপর নাম “তিল”। ইহা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণভাগে আমাশয়ের নীচে এবং অগ্ন্যাশয়ের উপরে অবস্থিত। “ভ্রূশ্যোপরি তিলং জ্ঞেয়ং তদধঃ পবনাশয়ঃ” অর্থাৎ অগ্ন্যাশয়ের উপর ক্লোম এবং অগ্ন্যাশয়ের নিম্নে বাতাসয়। কুসুমুদের সহিত ক্লোমের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াও আয়ুর্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। “তত্” দক্ষিণভঃ ক্লোম যকুংকুসুমমশ্রিতং” অর্থাৎ হৃদয়ের দক্ষিণদিকে ক্লোম এবং উহা যকুং ও কুসুমকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহাদ্বারা বোধ হয় যে, ক্লোমের সহিত যকুং এবং কুসুমের

বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে। ক্রোম শরীরের জলবাহি-শিরা সকলের মূল। এই স্থান হইতেই শরীরের জলীয়ংশের অভাব পূর্ণ হয়। জল পান করিবার সময় পীত ধ্রুনের কতকাংশ কণ্ঠপ্রদেশ হইতেই ক্রোমনাড়ী আকর্ষণ করিয়া লয়। তজ্জন্মই জল কণ্ঠগত হইবামাত্রই পিপাসার অনেকটা শান্তি হয় এবং ক্রোমনাড়ীতে জলীয়ংশের অভাব হইলেই কণ্ঠপ্রদেশ শুষ্ক হয়। ও প্রথমেই কণ্ঠনাড়ীর ক্রিয়া হ্রাস হইয়া আসে। ক্রোমবস্ত্র শোণিতের অংশ হইতে প্রস্তুত ; কিন্তু ইহার বর্ণ শোণিতের স্থায় নহে। “কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎকরূপস্ত জায়তে ক্রোমসংজ্ঞিতঃ” এস্থলে “কিঞ্চিৎ উচ্ছিতরূপ” ইহা দ্বারা ক্রোমের আকৃতি ভালরূপ বৃদ্ধিতে পারা যায় না। তবে ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ক্রোমের নির্মাণে শোণিত তাহার স্বরূপ পরিত্যাগ করে। আমার বোধ হয় ইহার বর্ণ জীবৎ রক্তাভ হইবে।

এই সকল প্রশ্নের পরই আমার বন্ধুবর বলিয়াছেন যে “এই আপত্তিগুলির সহস্তর আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কেহ যদি করিতে পারেন বাধিত হইবে। তবে ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে মনে করিয়া যাঁহারা বুণা জরনা বা তর্কের আশ্রয়গ্রহণ করিবেন, আমি তাহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করি।”

“ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে” এরূপ ধারণা সাধ্বিক লোকেরই হইয়া থাকে। রাজস ব্যক্তির ধারণা অন্মরূপ। যাহা হউক, প্রস্তাবিত বিষয়গুলি সমস্তই ঋষিবাক্য কি না তাহা প্রথমে প্রমাণ করা আবশ্যক। প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক স্থলে লিপিকর প্রমাদও দৃষ্ট হয়। সেই সকল ভ্রম ঋষিদের প্রতি আরোপ করিয়া যাঁহারা ঋষিদের উপদেশ অগ্রাহ্য বা তৎপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, তাঁহারা নমস্কারের যোগ্য কি আশীর্বাদের যোগ্য তাহা আমি বুঝিতেছি না।

অতঃপর আমার প্রিয়বন্ধু লিখিয়াছেন—

অস্থি সন্ধির স্থান নির্দেশ।

কোর	৬৪ খানা	ভ্রুসেবনী	৮
উদুখল	৬৬ খানা	বায়সভুণ্ড	২
সামুদগ	৬ খানা	মণ্ডল	২৩
প্রতর	৩২ খানা	শৃঙ্গাবর্ত	৪

মোট একশত ঊনসত্তর। আমরা এখানেও নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। এই গণনানুসারে একচাল্লিশ খানা সন্ধির অল্পসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ইত্যাদি—

ইহার কি উত্তর দিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। উক্তরূপে গ্রন্থের অর্থ ধরিয়া লইলে আয়ুর্বেদের কোন স্থলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে না। স্মৃতি বলেন, “তজ্জতে সন্ধ্যোহষ্টবিধাঃ” অর্থাৎ উক্ত সন্ধি সকল আট প্রকার। এবং উদাহরণস্বরূপে বলিয়াছেন যে “তেষামঙ্গুলিমণিবক্ণুলফজ্জাহ্নকুর্পরেষু কোরাঃ সন্ধ্যাঃ। কক্ষাবজ্জগদশনেষু-খলীঃ অংশপীঠগুদভগনিতেষু সামুদগাঃ গ্রীবাপৃষ্ঠবংশয়োঃ প্রতরাঃ। শিরঃকপালেষু

তুন্নসেবনী। হরোকৃতয়ত্ত্ব বায়সতুঙাঃ। কঠকদয়নেত্রকোমনাডীষু মণ্ডলাঃ। শ্রোত্র-
শৃঙ্গাটকেষু শজ্জাবর্তাঃ। তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়শে ব্যাখ্যাভাঃ” ইত্যাদি। ইহার
অর্থ এই যে, খঙ্গুলী, মনিবন্ধ, গুল্ক, জাম্বু এবং কুর্পর প্রভৃতি কোর সন্ধির উদাহরণ-
স্থানীয়। ইহা দ্বারা এরূপ প্রমাণ হয় না যে, উল্লিখিত স্থল ভিন্ন অস্ত্র কোর সন্ধি নাই।
অস্ত্র কোর সন্ধি থাকে থাকুক, কিন্তু এ স্থলে দেখিতে হইবে যে, উদাহৃত শক্তিগুলি কোর
কি না? কিন্তু দেখা যাইতেছে যে প্রদর্শিত উদাহরণে কোন ভুল নাই, অস্ত্র যদি কোর সন্ধি
থাকে, তবে তাহাও ইহারই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ কক্ষা, বজ্রকণ, দম্ব প্রভৃতি
উদ্বৃথল নামক সন্ধির উদাহরণস্থানীয়। উদাহরণ দ্বারা সংখ্যা নির্দেশ হয় না। তবে
উদাহরণ এবং সংখ্যা নির্দেশ এই উভয়কেই যদি উদ্দেশ্য করিয়া প্রয়োগ করা হয়, তবে স্তম্ভ
কথা। কিন্তু সূত্রের মেরূপ অভিপ্রায় নহে। তিনি “সংখ্যাতত্ত্ব দশোত্তরে দ্বৈশতে” এই
বলিয়া পূর্বে সংখ্যা ও তাহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ স্থলে আমার বন্ধুর
ভ্রমবশতঃ সন্ধির আকৃতি বর্ণন এবং তাহার কয়েকটি মাত্র উদাহরণকে সংখ্যানির্দেশ ধরিয়া
গ্রন্থকর্তা মহর্ষি সূত্রত প্রভৃতির ভুল ধরিয়াছেন। ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে
যে ছই শত দশ থানা সন্ধি স্থির করিতে যাওয়া যিনি একচল্লিশ থানাই ভুল করিয়াই বসেন-
তাহার পক্ষে আয়ুর্বেদের গ্রন্থ জটিল হ্রস্বোধ্য গ্রন্থ প্রণয়ন অসম্ভব। গ্রন্থকর্তা আমাদের
গ্রন্থ এত “বাকুব” ছিলেন না। এস্থলে সন্ধির উদাহরণে যে সমস্ত গুলি সন্ধি দেখান হয়
নাই, তাহাও গ্রন্থকর্তার মনে উদ্ভিত হইয়াছিল। তজ্জগাই তিনি সন্ধির বর্ণনাপ্রসঙ্গে
বলিয়াছেন যে, যদিও উদাহরণে সমস্তগুলি সন্ধি দেখান হয় নাই, তথাপি সন্ধির যে সকল
নাম করা হইল অনুল্লু সন্ধিগুলিও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই অভিপ্রায়েই সূত্রত
বলিতেছেন যে, “তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়শে ব্যাখ্যাভাঃ” ইহার অভিপ্রায় এই যে
যদিও এস্থলে নাম উল্লেখ করিয়া সমস্ত সন্ধির আকৃতি বর্ণন করা হয় নাই, তথাপি সন্ধির
নামের দ্বারাই অনুল্লু সন্ধিগুলি বুঝিয়া লইবে। অর্থাৎ সমস্ত সন্ধির আকৃতিই উল্লিখিত
আট প্রকার সন্ধির অন্তর্গত হইবে। আমার বন্ধু বলিয়াছেন যে, ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই
হইবে মনে করিয়া যাহারা বৃথা জল্পনা বা তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন আমি তাহাদিগকে
দূর চাইতে নমস্কার করি।

ঋষিবাক্যের প্রতি আমার বন্ধুর এরূপ ভাব কেন হইল এবং কতদিন হইতে হইয়াছে,
তাহা আমি জানি না। ঋষিবাক্যের প্রতি যদি তাহার বিশ্বাসের কিছু লাভ হইয়া থাকে,
তবে আর তাহার পক্ষে আয়ুর্বেদ-ব্যবসায়কে উপজীব্য করা উচিত নহে। আসি তাহার
নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন আর ঋষি বাক্যের প্রতি অমর্যাদা, অভক্তি,
অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আত্মগোরব নষ্ট এবং আয়ুর্বেদের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা আনয়ন
না করেন। আমি তাহার যত্ন এবং প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিবার উৎসাহ দেখিয়া প্রকৃত
পক্ষেই অত্যন্ত সুখী হইয়াছি এবং তাহার এইরূপ অনুসন্ধানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি।

আজকাল একপভাবে অসুসন্ধান করিয়া আয়ুর্বেদ কম লোকেই পড়িয়া থাকে। অতঃপর আমার বন্ধু বলিয়াছেন যে “আর সামুদ্রগ শ্রেণীতে যে গুদ ও ভগাঙ্গি সন্ধির উল্লেখ আছে, সন্ধিগণনাকালে তাহাদের নামকরণ হয় নাই কেন? উপরি উক্ত নানাকারণে আয়ুর্বেদের অস্থি সন্ধির অসুসন্धानে আমাদের নানা প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যাইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান আমাদের মজ্জাগত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রপাঠে “পাঠ-লাগান” বই অল্প কোন কার্য্য আমাদের দ্বারা হইবে না।

উপরোক্ত দোষারোপের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সামুদ্রগ শ্রেণীতে যে গুদ-ভগাঙ্গি সন্ধির উল্লেখ আছে, অস্থিগণনাকালে তাহার নাম ধরিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে বথা—“গুদভগনিতেষু চাত্তরি”। সন্ধিগণনা কালে বলা হইয়াছে, “ত্রয়ঃ কটীকপালেষু” অর্থাৎ কটী, কপাল, গুদাঙ্গি ও ভগাঙ্গি এই চারিখানা অস্থিতে তিনখানা সন্ধি আছে। চারিখানা অস্থিতে তিন খানা সন্ধিই হইয়া থাকে। তবে আবার বলা হইল না কেমন করিয়া? আবার কিরণ করিয়া বলিলে যে আমাদের পক্ষে বলা হয়, তাহাও বুঝির অগম্য। “ত্রয়ঃ কটীকপালেষু” ইহা দ্বারা শ্রোণী এবং শ্রোণীফলক বা (নিতম্বাঙ্গি) দুই খানার দুইটি সংযোগ এবং গুদাঙ্গি ও ভগাঙ্গির একখানা সংযোগ, মোট তিন খানা সন্ধি দেখান হইয়াছে। পূর্বোক্ত রেখাগুলিতে বাক্যের অর্থ বোধগম্য হইল না। আয়ুর্বেদ বহু প্রাচীন শাস্ত্র এবং বহুকাল ধাবৎ ইহার কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। বহুকাল হইতে জ্ঞানবান্ লোকের দ্বারা ইহা অসংস্কৃত হইতেছে না, অতরাং অস্থি কিম্বা অস্থিসন্ধি গণনায় ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেও প্রস্তুত আছি, তজ্জন্ত “পাঠ লাগান” বই, অল্প কোন কাজ আমাদের দ্বারা হইবে না এমন কথা স্বীকার করিতে পারি না।

অতঃপর আমার বন্ধু প্রত্যক্ষমূলক কয়েকটি কথা বলিতেছেন বথা “ত্রয়ঃ কটীকপালেষু” এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে এই তিনটি সন্ধি তুঙ্গসেবনী শ্রেণীর এবং স্থির জাতীয়। এ স্থলে একটা ভুল পাঠকে বিগুহ পাঠ মনে করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। অর্থাৎ একস্থানে আছে, “অংসপীঠগুদভগনিতেষু সামুদ্রগাঃ” অত্য়ত্র আছে “শিরঃ কটীকপালেষু তুঙ্গসেবনী।” অর্থাৎ অংস পীঠ গুদভগ ও নিতম্ব সন্ধি সামুদ্রগ জাতীয়। তৎপর বলা হইয়াছে, শিরঃ কটী কপালের সন্ধি তুঙ্গ সেবনী জাতীয়। নিতম্ব সন্ধি যদি সামুদ্রগ হয়, তবে পুনরায় কটী কপাল সন্ধিকে তুঙ্গসেবনী বলাই ভুল। ইহার মধ্যে একটা নিশ্চয়ই ভুল আছে, ইহা অনুমান করা সহজ। কারণ নিতম্ব সন্ধি ও কটীকপাল সন্ধি এক। অতরাং “শিরঃ কটীকপালেষু” এ স্থলে হওয়া উচিত “শিরঃ কপালেষু” অর্থাৎ শিরঃ কপালের সন্ধি তুঙ্গসেবনী ও কটী কপালের সন্ধি সামুদ্রগ। বস্তুতঃ যাহারা প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিয়াছেন, তাহারা এমন কথা বলিতে পারেন না যে কটী কপালের সন্ধি তুঙ্গ সেবনী অর্থাৎ শেলাই করা সন্ধি। ইহা দ্বারা ই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অতঃপর আর একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়া প্রবন্ধটি শেষ করিব।

আমার বন্ধু বলেন, “শল্যাহির সহিত কর্ণের তরুণাহির সংযোগ কেবল নাস্তি দ্বারা ইহা সন্ধি বলাই ভাল। তবে ইহার শ্রেণীকরণে শল্যাবর্ত বলায় উদ্দেশ্য বুঝা গেল না।”

তিনি মনে করিয়াছেন, কর্ণপালীর অস্থিধানার সংযোগ কেবল উপরেই আছে, তজ্জগুই লিখিয়াছেন, উহার সংযোগ নাস্তি দ্বারা। বস্তুতঃ তাহা নহে, উহা কর্ণছিন্নের অভ্যন্তর হইতে একপ ভাবে সংযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা ধারণা করা কঠিন। কঙ্কালে উপরের তরুণাহি থানা থাকে না, উপরের অংশটুকু ভগ্ন হইয়া যায়। কঙ্কালাহির ছিদ্র মধ্যে সেই শল্যাবর্ত প্রত্যক্ষ হয়। যদি কেহ কঙ্কালাহি দেখিয়া থাকেন, তবে তিনি আমার কথায় যথার্থ্য প্রমাণ করিতে পারিবেন। নাস্তি দ্বারা অস্থিধরের সংযোগ হয় না। সে সকল স্থলে সংযুক্তাহি বলা ভুল কথা। তবে তিনি যে গ্রন্থগ্রন্থন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “আয়ুর্বেদের সংক্ষিপ্ত অংশকে আরও বিস্তৃত করা এবং প্রত্যক্ষদর্শন দ্বারা আয়ুর্বেদ গ্রন্থের সংস্কার করা উচিত।” ইহা অত্যন্ত সার কথা। এই জন্ত আমি আমার বন্ধুকে সহস্রবার ধন্যবাদ প্রদান করি এবং তিনি যদি উৎসাহশীল আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত-দিগের সহিত যোগদান করেন ও এ সম্বন্ধে জগৎ সমক্ষে সফলতা দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তিনি ভারতমাতার আশীর্বাদের পাত্র।*

শ্রীহরমোহন মজুমদার।

* মীমাংসক পূর্বপ্রবন্ধের বিবন্ধে যে সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, প্রবন্ধলেখক কবিরাজ মহাশয় তাহার উপযুক্ত উত্তর পাঠাইয়াছেন। আগামী বারে আলোচ্য—সি, পি, পি, সম্পাদক।

স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র

(Ecology of plants)

উদ্ভিদ-সমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় কিরূপ ভাবে থাকে ও সেই অবস্থায় কোনও রূপ পরিবর্তন হইলে উদ্ভিদে দেহেও কিরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা আজকাল সম্যক্রূপে অধ্যয়ন করিবার জন্ম ইউরোপ ও আমেরিকার উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। পূর্বের ছাত্রগণ তাহাদের উদ্ভিদসংগ্রহকালীন ভ্রমণের (Botanical excursion) এর সময় কোনও উদ্ভিদের পত্র শাখা ফল ও পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া, পুষ্পে কয়টা পাগড়ি আছে, কয়টা পরাগকেশর (Stamens) ও কয়টা গর্ভকেশর (Pistil) আছে, তাহা নিরূপণ করিয়া—আর বড় জোর কোনও উদ্ভিদের নাম নির্বাচনের পক্ষে সুবিধাজনক তালিকার (Analytical table) সহায়তায়, প্রাপ্ত উদ্ভিদের নামনির্ণয় করিয়াই আপনাদিগের কার্য সুচারুরূপে হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। কিন্তু এক্ষণে পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে শুধু উক্তরূপ কৃত্রিম (Mechanical) বিভাজ্ঞার বিশেষ ফললাভ হয় না। উহাতে ছাত্রগণের অন্তরে প্রকৃতি অধ্যয়নের মাদুর্য্যের প্রতি কোনও রূপ আসক্তি জন্মে না এবং কার্য-কারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা দ্বারা আলোচিত বিভাগে যে একটা অন্তর্দৃষ্টি হয়, তাহাও লাভ হয় না। তা ছাড়া প্রকৃতির এই অঞ্চলেই আপাততঃ নূতন গবেষণার এক বিশাল ক্ষেত্র রহিয়াছে। অল্পকালে এই অঞ্চল হইতেই অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

প্রকৃতি অধ্যয়নের পক্ষে ভারতবর্ষ যেরূপ উপযোগী, সেরূপ আর কোন দেশই নহে। এত বিবিধ জাতীয়, বিবিধ স্থান-নিবাসী উদ্ভিদ, এত রকমের পশু ও পক্ষী, পৃথিবীর আর কোনও দেশে পাওয়া যায় না। এই সকল উদ্ভিদ ও জীব নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থায় কিরূপ আচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলেই জ্ঞান রাজ্যের সীমা কিছু না কিছু বর্দ্ধিত করিতে পারেন। গ্রীষ্মের সময় খাল বা বিল শুকাইয়া উহাতে কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, বর্ষাকালে এই সকল স্থান জলে নিমজ্জিত হওয়ায় গ্রীষ্মকালে সঞ্চারিত উদ্ভিদসমূহ কি দশা প্রাপ্ত হয়,—কোনগুলি এই অবস্থায় মরিয়া যায়, কোনগুলিই বা নিজের আকার পরিবর্তন করিয়া উপস্থিত দুঃসময়েও জীবনধারণ করিতে পারে,—জলাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কোন্ নূতন উদ্ভিদ জলাশয়ে জন্মগ্রহণ করে? জলাশয়ের জল শুকাইতে আরম্ভ হইলে তাহাদেরই বা কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, এ সকল বিষয়ের আলোচনা অনেকেই অতি অলসভাবে করিতে পারেন।

উপরের কথা কয়টা বুঝাইবার জন্ম, প্রায় ডই বৎসর হইল, আমি বর্দ্ধমান জেলার কালনা সবডিভিসনের নিকটস্থ দিঙ্গারকোণ গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত স্যানেডুভাঙ্গার

পড়া নামক মাঠের মধ্যস্থিত এক প্রাচীন পুষ্করিণীতে শুষ্ক শাক সম্বন্ধে কয়েকটা বিষয় পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহাই এ স্থলে বিবৃত করিব।

উদ্ভিদবিজ্ঞানি পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে, Vaucheria (ভাসেরিয়া) প্রভৃতি কতিপয় জলজ নীচ জাতীয় উদ্ভিদ (Thallophyta) যখন প্রচুর জলে বাস করে, তখন তাহাদের শরীরের যে কোনও অংশ মূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মূল উদ্ভিদটির মত আর একটা নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু যখন শীতকালে পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যাইতে থাকে, যখন উদ্ভিদগণ ভাবি হ্রঃসময় অনুভব করিতে পারে, তখনই তাহাদের বীজ সৃষ্টি করিবার কাল উপস্থিত হয়। এই সকল উদ্ভিদের দেহ অত্যন্ত নরম, জলাভাবে উহারা অল্পকালও বাঁচিতে পারে না, তাই মরিবার পূর্বে উহারা বীজ সৃষ্টি করিয়া থাকে। বীজের উপরে একটা কঠিন পদার্থের আবরণ থাকে। সেই কঠিন আচ্ছাদনের মধ্যে বীজ মধ্যস্থ প্রাণ-পদার্থ (Protoplasm) যাবতীয় জীবনক্রিয়া নিবৃত্ত করিয়া, নিষ্ক্রিয় ভাবে অকালের সময়টা বসিয়া থাকে। পরে যখন বর্ষাকাল উপনীত হয়, আবার যখন জলের সম্ভাব হয়, তখন বীজমধ্যস্থ প্রাণ-পদার্থ বীজের কঠিন খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়া, আবার পূর্ববৎ নবীন উদ্ভিদদেহ নির্মাণ করিয়া আগেকার মত কলমের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বিবিধ সবুজ শেওলা (Algae) যে উক্তবিধ উপায়ে শুধু হ্রঃসময়ে বীজ উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা সুবিজ্ঞাত ঘটনা হইলেও শুষ্ক শাক আদি ও জলজ ঢেঁকীশাক (Water ferns)-সমূহও যে উক্ত নিয়মের অনুসরণ করে, তাহা এখনও সুবিজ্ঞাত ঘটনা বলিয়া লিপিবদ্ধ হয় নাই।

নির্জন স্থানে অবস্থিত উক্ত পুষ্করিণীতে মাঘ মাসে, স্থলস্থিত ও জলস্থিত উভয়বিধ শুষ্ক শাকই (Marselia) দেখা যাইতেছিল। বর্ষার পরে জল একটু একটু করিয়া নামিয়া আসিয়াছে। তখন যে সকল গাছ জলে ছিল, এখন তাহারা খট্‌খটে শুকনা মাটির উপর রহিয়াছে। কতকগুলো গাছ কাদায় রহিয়াছে, আর কতকগুলো তখনও জলে রহিয়াছে। স্থলস্থিত ও জলস্থিত শুষ্ক শাকের আকার ও কার্যগত পার্থক্য অধ্যয়ন করিবার পক্ষে এরূপ স্থান বিশেষ উপযোগী।

জলস্থিত শুষ্ক শাক বেল সতেজ—পাতাগুলি খুব বড় বড়, নব কিসলয়ের মত সবুজ। শাখাগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিকে সোজাভাবে কিরণের ছায় বিস্তৃত হইতেছে। ডাটিগুলি মোটা, সবুজ, নরম, ও পণ্ডের ডাঁটির মত ফোঁফরা। জলজ শুষ্ক শাকের কোন গাছেই বীজের চিহ্ন মাত্রও নাই। ডাঙ্গায় যে সকল শুষ্ক শাক পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। গাছগুলি সতেজ নহে, ডাটা, পত্র, শাখা সকলই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পাতাগুলি ছোট, রং কৃষ্ণ ও সবুজ, পাতার ধারগুলি একটু কাটা কাটা (Crenate) শাখাগুলি এক গুচ্ছ হইয়া উপরে উঠিয়াছে। ডাটাগুলি শক্ত, ছোট, ধূসর বর্ণ, কৰ্ক স্পষ্ট পদার্থে এমনভাবে আবৃত, বাহ্যতে উদ্ভিদ দেহ হইতে অধিক জল শুকাইয়া বাহির হইতে না পারে। আর উহার

সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য বিশেষত্ব এই যে, উহার প্রায় সকল গুলিতেই ফল ধরিয়াছে। ফলগুলিও খুব শক্ত ও ধূসর কৃষ্ণ এবং Cuticle বা কর্ক সদৃশ পদার্থে আবৃত। এই শক্ত আচ্ছাদনের মধ্যে থাকিয়া বীজগুলি গ্রীষ্মকাল কাটাইয়া দিবে, পরে বর্ষার সময় জল পাইলে উহা পুনরায় নূতন গাছ সৃষ্টি করিবে। জলজ গুয়ুনির যে কোন শাখাই আর একটা নূতন গাছ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। কিন্তু স্থলজ অবস্থায় উহা ঐরূপ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ত করিতেই পারে না, এমন কি উহা নিজেও খুব বেশী গুকনা জমিতে বাচিতে পারে না। কাজেই ধ্বংসের পূর্বে, অবস্থা একবারেই কাহিল না হওয়ার সময় উহা বীজ উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

গুয়ুনি (Marselia) সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সম্ভবতঃ তাহা অত্যান্ত জলজ ফাণ (Aquatic ferns) সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এ বিষয়ে সঠিক পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। ইন্দুরকানি পানা (Salvinia) ও Azola এই ছই রকম পানাও বাঙ্গালার ডোবা আদিতে প্রচুর পাওয়া যায়।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নাদির্-উন্-নিকাৎ

মনোহারিণী পারসীভাষায় “নাদির্-উন্-নিকাৎ” নামে সাতখানি পুস্তক প্রচলিত আছে; এই সাত খানি পুস্তকের অভিপ্রায় এক এবং প্রতিপাত্ত বিষয়ও এক; কিন্তু সাত জন ভিন্ন ভিন্ন লেখক এই সাত খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সাত জন গ্রন্থকার হিন্দু এবং উচ্চ বর্ণের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক। ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতীয় যদুদাস এবং ব্রাহ্মণ বর্ণভুক্ত রাঠোর পণ্ডিতের পুস্তকদ্বয় অত্যন্তকষ্ট এবং অপরিচিত। এই উপাদেয় পুস্তকে হিন্দুর বেদান্ত মত ও মুসলমানের সুফী মতের আধ্যাত্মিক ভাবে ঐরূপ নিরপেক্ষ রূপে ও পাণ্ডিত্য-সহ আলোচনা করা হইয়াছে যে, হিন্দু ও ইসলাম এতদূতয়ে ইহাকে সারবান্ এবং অতীব প্রয়োজনীয় শাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় নাই এবং বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রেও ইহা একেবারে অপরিচিত। অথচ ইহা ২৬০ বৎসরাদিক প্রাচীন এবং হিন্দুর লেখনীগ্রন্থত। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যাভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য হোরেশ হোম্যান্স উইলসন সাহেব অনুমান করেন, রাঠোর পণ্ডিতের নাদির্-উন্-নিকাৎ, শাজাহান বাদশাহের একবিংশ বার্ষিক রাজত্ব কালে (অর্থাৎ ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে) বিরচিত হইয়াছিল।* যাহা হউক পারস্য কিবা সংস্কৃত অথবা ভারতবর্ষের (অধিক কি

* (“Religious Sects of the Hindoos” By H. H. Wilson, vol. I. Edition of 1816. page 347.)

আসিয়া মহাদেশের) আর কোন ভাষায় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মতাবলী একত্র সমন্বয় করিয়া একরূপ ভাবে কেহ অভেদত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ বা সাহসী হয়েন নাই এবং মুসলমানেরাও নাদির-উন্-নিকাৎ পুস্তক বাতীত, হিন্দুর প্রণীত আর কোন পুস্তককে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তন্নিমিত্ত এই পুস্তকেব বর্ণিত বিষয়ও স্মৃতিপাঠ্য, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অভিনব এবং ইহকাল ও পরকালের সাধন পক্ষে শুভকর সহায়। বর্তমান কালের মতবিশেষ ও ধর্মবিশেষের প্রবল আন্দোলনে একরূপ পুস্তকের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহিষয়ে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থাতন পারস্ত পুস্তক পড়িবার যোগ্য।

নাদির-উন্-নিকাৎ পুস্তক এবং উর্দু ও পারস্ত ভাষায় লিখিত এতদনুরূপ বহু গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা সর্বপ্রথমে একটা স্মৃতিময়ী ও শুভময়ী কথা অবগত হইয়া আশ্চর্য্য হই। মুসলমানেরা হিন্দুর অনেক মন্দির ভগ্ন ও অনেক গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগারকে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন সত্য, বলে বা ছলে অসংখ্য হিন্দুকে তাঁহারা ইসলামধর্মভুক্ত করিয়াছে, ইচ্ছাও অকাটা সত্য, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে কহিতে পারি, মুসলমান-সম্রাট হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত যে কেহ কখন কোন হিন্দু সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মচারী, উদাসী, বৈরাগী বা পরম হংসের গুণ বা সামর্থ্যের বিজ্ঞা বা ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখনই তিনি অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সেই হিন্দু সাধুর সেবা করিয়াছেন এবং তাহাকে সম্মানিত করিতে ক্রটি করেন নাই। হিন্দু “সাদুর” প্রতি মুসলমানেরা অত্যাচার করিয়াছেন, আমরা একরূপ কথা শুনি নাই বা পড়ি নাই। ইসলামধর্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে—

“আল্ মুলক্ য়োরা দীন তওয়া মীনী। ফকির উল্‌রব, রব্‌ উল্‌ল ফকির।” (হাদিশা সারিফ্।) অর্থাৎ “স্বদেশ ও স্বধর্ম সমতুল্য। ভক্ত ও ভগবান্ এক।”

“যোগো জীবাত্মনোন্নৈক্যাং পূজনং সেবকেশয়োঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত)

যাহা হউক, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে “সাদুর” বেক্রপ আদর, অথ ধর্ম সমাজে সেক্রপ কখনও ছিল না এবং এখনও নাই। এই যত্ন, শ্রদ্ধা ও আদর না করিলে “নাদির-উন্-নিকাৎ” গ্রন্থের জন্ম হইত না, সুতরাং ইহার আশ্চর্য্য জন্মবিবরণে সর্বপ্রথমে হস্তক্ষেপ করিতে আকাজ্জক করি।

দিল্লীতে যখন শাহজাহান সম্রাট্ সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মালব প্রদেশে ক্ষত্রিয় জাতীয় বাবুলাল নামে একব্যক্তি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্ত্য-স্বামী নামে এক সাধুর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহারই নিকটে থাকিয়া কিছুকাল ধর্ম-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে থাকেন। তদনন্তর গুরুদেবের সহিত লাহোর, বারক, আক্কাবাবাদ প্রভৃতি বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক “ত্যাগী” পুরুষের স্থান দেহানপুর নামক স্থানে অবস্থান করেন; এই দেহানপুর পশ্চিমোত্তর প্রদেশান্তর্গত সহিন্দ (Sirhind) নামধেয় প্রখ্যাত নগরের পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে তাঁহার মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ঐ মঠ অস্ত্যাপিও বর্তমান আছে।

বাবুলালের মতামুবর্তী শিষ্যপ্রশিষ্যগণ বাবুলালী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে ভক্তিভাবে সকলে “বাবা” কহিত, এতদ্ভিন্ন তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায় বাবুলালী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগের কপালে গোপীচন্দন নামক মূর্ত্তিকার তিলক দেখা যায় এবং হিন্দু মতে বিচার করিলে ইহাদিগকে রামোপাসক বৈষ্ণব বলিয়াই বোধ হয়। ইহারা একেশ্বরবাদী; শ্রীরামচন্দ্রের নিরাকারতাব গ্রহণ করিয়া ইহারা তাঁহার পূজা করেন, কিন্তু মূর্ত্তি গঠন করেন না। হিন্দুর বেদান্ত মত ও ইসলামের জুফি নামক অতি প্রাচীন ও শুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া বাবুলালীগণ এক অভিনব মতের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বাবুলালের প্রতিপত্তি যখন সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সম্রাট্ সদনেও তাহা পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। বাদসাহের মীর মুন্সী রাইচাঁদ এবং প্রধান সভাপণ্ডিত যদুদাস বাদসাহ সমীপে বাবুলালের কথা সর্বপ্রথমে বিজ্ঞাপিত করেন। যদুদাস জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও সম্রাট্ সভার প্রধানপণ্ডিত পদে বসিত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইনি কায়স্থ ছিলেন। যুবরাজ দারাবেগে বাবুলালকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; সম্রাট্ ইহাতে সম্মতি প্রদান করায় সাধু বাবুলাল অতীব সমাদরে সম্রাট্ পুত্র সমীপে আনীত হইয়া ছিলেন। সামান্য সময় মাত্র উভয়ে কথোপকথন হওয়ায় বাবুলালের সুন্দর মূর্ত্তি, গির ভাষণ, সাধুতা, পাণ্ডিত্য, ব্রহ্মজ্ঞান, বহুদর্শন, বাগ্মিতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি দর্শন করিয়া ভারতের ভাবী সম্রাট্ একরূপ বিমোহিত হইয়া যান যে, তাঁহার সহিত বহুক্ষণ কথোপকথন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ধর্ম্মপোদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হন। তদনুসারে জাফর খাঁ সাহাহ নামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্র লোকের মনোরম উদ্যান মধ্যে যুবরাজ ও বাবুলাল মিলিত হন এবং এই উদ্যানে উভয়ে পরস্পরে অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন করেন। এইরূপে সাত বার শুভ মিলন হয় এবং সাত বার যুবরাজ এই হিন্দু সাধুর নিকটে উপদেশ গ্রহণ করেন। যাহার মনোরম উদ্যানে এই কথোপকথন হইয়া ছিল, তিনি প্রথমে মুসলমান ছিলেন, শেষে বাবুলালের মতাবলম্বী হইলেন। এই কথোপকথনের ফলে যুবরাজও অনেক পরিমাণে বাবুলাল মতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নাদির-উন্-নিকাং নামে পারস্ত ভাষার যে সাত খানি পুস্তক প্রচলিত আছে এই পুস্তকপুস্তকে এই কথোপকথনের বিবরণ লিখিত আছে; এই সাত জন গ্রন্থকার ঐ উদ্যানে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং সত্যজনের গ্রন্থে মূল বিষয়ের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। তবে ইহা স্বীকার্য্য কেহ সংক্ষেপে, কেহ বা বিস্তৃত ভাবে এবং কেহ বা কথোপকথনের প্রত্যেক প্রশ্ন ও প্রত্যেক উত্তর আশ্রয় অক্ষরে অক্ষরে সঠিক করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সকলের গ্রন্থই উপাদেশ এবং সকলেই ঐ কথোপকথনের বিশ্বস্ত সাক্ষী। এই উপদেশপূর্ণ কথোপকথন পাঠ করিলে অনেক জ্ঞানময়ী কথা অবগত হওয়া যায়।

এই সাত খানি গ্রন্থের মধ্যে তিন খানি গ্রন্থে একটা মঙ্গলাচরণ আছে, অপর চারি খানিতে নাই। এই মঙ্গলাচরণের ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু অঙ্গর পারস্ত। ঐ শ্লোকটি এই—

“ত্যাং বিনা কোহস্তি জীবানাং ঘোরসংসারমাগরে।

ভর্তা পাতা সমুদ্রভা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভুঃ।”

তিন জন ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে একই শ্লোক কি প্রকারে মঙ্গলাচরণ ঘূলাভিষিক্ত হইতে পারে, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম এই শ্লোকটি মহানিরীক্ষণতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত। আচার্য্য বরলো সাহেবের তাঁহার “Hindoo seers and sages and their legends” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সম্রাট শাহজহানের শাসনকালে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে তত্ত্ব শাস্ত্র ও তান্ত্রিকদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, সুতরাং মঙ্গলাচরণস্বরূপে মহানিরীক্ষণতত্ত্ব হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যজ্ঞদাসের পুস্তকে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি সেখ খন্দার একটি সুপরিচিত পারস্ত কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই;—

“মন্ তো সুদম্, মন্ তো সুদী।

মন্ তো সুদম্, তো য়ী সুদী।

তা কশ্‌নে গোয়েদ্‌ পশ্‌ অজীম্।

মন্ তো দিগরম্ তু মে দিগরী।”

অর্থাৎ, হে প্রভো পরমেশ্বর! যখন তোমায় ধ্যান করিতে করিতে আত্মহার্য্য হইয়া তোমাতেই নিমগ্ন হইয়া যায়, তখন মনে হয়, তুমি আমি হইয়া গিয়াছ, আর আমি তুমি হইয়া গিয়াছি। সংস্কৃত শাস্ত্রেও এরূপ শ্লোক আছে—

“মম রূপাসি প্রভো। ত্বং ন ভেদোক্তি যদ্য মম।”

(বুহৎ মেরুতত্ত্ব—২য় পটল)

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সাহায্যর উদ্দেশ্যে যুবরাজের সহিত বাবুলালের সপ্তবার দর্শন ও কথোপকথনে যে সকল তত্ত্ব বাক্ত ও শ্রুত হইয়াছিল, নাদির-উন্-নিকাতে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমুদয় পুস্তকের অনুবাদ করিয়া দেখান অসম্ভব, সুতরাং আমি এখানে ঐ সাতখানি গ্রন্থ মিলাইয়া প্রধান প্রধান বিষয়গুলি, পাঠক মহাশয়দিগের কৌতুহল স্তুতি চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা করিয়া দিলাম। প্রত্নকর্ত্তা-স্বয়ং যুবরাজ দারাবেকো, উত্তরদাতা—স্বয়ং সাধু বাবুলাল, এবং শ্রোতা ঐ সপ্তজন গ্রন্থকার প্রভৃতি। স্বয়ং শ্রোতাগণের দ্বারা পুস্তক বিরচিত হইয়াছে এবং মুসলমান পণ্ডিত ও সাধকবৃন্দ কর্ত্তক ইহা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং নাদির-উন্-নিকাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কথা নাই।

(অনুবাদ)

পিতামহহানীর পরম সাধু বাবুলালজী সাহেবকে সন্মোদন করিয়া সম্রাট্‌কুমার দারাবেকো জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহানুভব! আপনার প্রবর্ত্তিত নবীন মত কি প্রকার?” উত্তর দিয়া সাধু বলিলেন, “আমার মতকে নতন কহিতেছেন কেন? ইহা

সৃষ্টির প্রাকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে এবং সাধকেরা অতি গোপনে ও বস্ত্রে ইহা রক্ষা ও পালন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর বেদাশ্রমত অতি গুপ্ত এবং অতি সারবান্, কিন্তু ইহা বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন; ইহার পালন আরও কঠিন। ইসলামের ফকিরগণের সূফী মত শুধাদপি শুধু, অনেকে ইহা জানে না ও বুঝে না। এই উভয় মনোহর, প্রাচীন ও সারবান্ তত্ত্বকে এক করিয়া আমি যাহা ব্যাখ্যা করি, তাহাকেই লোকে আমার মত কহিয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা নূতন মত নহে। আমার মতে বর্ণ, জাতি, উচ্চতা, নীচতা, পাণ্ডিত্য, মূর্খতা প্রভৃতির ভেদ নাই; এই মতে ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, পুণ্যকর্ম প্রভৃতির আবশ্যক।” যুবরাজ পুনরপি কহিলেন, “ধর্ম কি জিনিষ?” সাধু বলিলেন যে, স্নেহ ও সহানুভূতি মানুষকে মানুষের সহিত বাঁধিয়া দেয় এবং সমাজবদ্ধ করে, তাহাই ধর্ম, এই স্নেহ ও সহানুভূতি পরিণামে নিশ্চল প্রেমে পরিণত হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে এবং মানুষের সহিত ঈশ্বরকে বাঁধে, তখন ভক্ত ও ভগবান্ এক হইয়া যায়। ইহাই ধর্মের উদ্দেশ্য। পরোপকার ও পুণ্যকর্ম ভিন্ন ইহা হয় না।* সম্রাট কুমার কহিলেন, “পরোপকার পরম ধর্ম; কিন্তু ভক্তি কি জিনিষ?” সাধু বলিলেন, “ভগবানে ঐকান্তিকী রতির নাম ভক্তি। ভক্ত ও ভগবানের তন্ময়তার নাম ভক্তি।” প্রশ্ন—বৈরাগ্য কাহাকে কহে? উত্তর—জীপুত্রের পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য নহে। নিজের দেহ ও আত্মাকে কষ্ট দেওয়া বৈরাগ্য নহে। সংসারে থাকিয়া সংসারে নিলিপ্ততাব অবলম্বন করার নাম বৈরাগ্য। যিনি নিরপরাধী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসী হইতে পারেন, তিনিও বৈরাগী।” প্রশ্ন—ফকিরের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান লক্ষ্য কি? উত্তর—ব্রহ্মজ্ঞানোপার্জন। ফকিরের গোরব ও সৌরভ কি?—সংসার। জ্ঞান কি? যাহা দ্বারা ভাববুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং ঈশ্বরের সহিত কথা চলে।

ফকিরগণ কোথায় বা কিরূপে সাধন করিবেন?—বনে, মনে ও কোণে।† সাধুর ধন কি?—ঈশ্বর। তাঁহার শয্যা কোথায়?—ভূমি। তাঁহার আলোকদাতা কোন্ জিনিষ? চন্দ্র ও সূর্য। তাঁহার কিমে পরমানন্দ? ভগবৎভজনে ও ভগবৎ গুণকীর্ণনে। ফকিরের রব কি?—অবিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ ঈশ্বর নাই। কোন্ ধর্ম সর্ব ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম?—সকল ধর্মের এক উদ্দেশ্য ও এক গতি, স্তুরাং সারতত্ত্বে সকল ধর্মই এক প্রকৃতিসম্পন্ন। মহাকবি দেওয়ান হাফেজ লিখিয়াছেন, মন্দিরে হিন্দুরা যাহাকে ভজ্ঞে, নশিদের মুসলমানগণ তাহাকেই অমুসন্ধান করে। গির্জায় খৃষ্টানগণ তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকে, স্তুরাং ধর্মের আবার বড় বা ছোট কি? প্রশ্ন—ফকিরগণ (সাধু বা সন্ন্যাসিগণ) কাহার সহিত মিত্রতা করিবেন?—ভক্তবৎসল ভগবানের সহিত।

* প্রবক্তা মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন “ত্রিযতে ধর্ম ইত্যাহঃ স এব পরমঃ প্রভুঃ।” (মনুসংহিতা)

† পরমহংস নামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মধ্যেও আমরা এই কয়েকটি কথা পাঠ করিয়াছি।

কাহার সহিত মিত্রতা করিবেন না?—লোভ, ক্রোধ, হিংসা, অসত্য এবং বিবেধ। শত্রুর প্রতি বিনয় এবং মিত্রের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করা সাধুর কর্তব্য। ফকির শব্দের অর্থ কি?—“ফে” “কাফ্” “রে” এই তিন অক্ষর লইয়া ফকির শব্দের উৎপত্তি। সংসারে নিলিপ্ত হইয়া, শুদ্ধচিত্তে ভগবানের ভজনা, ফকিরের ধর্ম। প্রশ্ন—সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ কি? উত্তর—ঠিক ঐ অর্থ। সংপদে অর্থাৎ ব্রহ্মপদে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হওয়ার নাম সন্ন্যাস, অথবা সং (সাধু) কর্মে জীবন ন্যস্ত করার নাম সন্ন্যাস। মুসলমানের ফকির ও হিন্দুর সন্ন্যাসী একই অর্থবাচক শব্দ। মহাকবি মৌলানা রোমী মহোদয় লিখিয়াছেন, বস্ত্র, জী, ধন, পুত্রাদি, সুখাশু ইত্যাদি ত্যাগের নাম সন্ন্যাস বা ফকিরী নহে। যিনি ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া জীবিত থাকেন, তিনিই ফকির। প্রশ্ন—জাতি কি? উত্তর—জাতি কিছুই নয়, ইহা গৃহীর বা সংসারীর পক্ষে একটা সামাজিক প্রথা মাত্র। প্রকৃত ভক্ত, বৈরাগী বা তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে “জাতি” শব্দের কোন অর্থ নাই। ইহা কুসংস্কার মাত্র। প্রশ্ন—শাস্ত্রকে মানা উচিত কি না? উত্তর—নিশ্চয়। বাহ্য ব্রহ্মবাক্য তাহাই মানিব, বাহ্য নরকপোগকল্পিত বা স্বার্থদূষিত, তাহা মানিনা ও মানিব না। তাহা শাস্ত্র নহে।”

অতঃপর সন্ন্যাসী কুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন—বেদান্ত কাগ্যকে কহে? মহাগুরুশ্রী উত্তর করিলেন, বেদান্ত শাস্ত্র বেদের অন্ত, সূত্রাং জ্ঞানেরও অন্ত, ইহার পরে আর কোন জ্ঞান নাই, এই জন্ত বেদান্ত শাস্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রকে শতবার পাঠ করিয়াও অনেকে ইহা বুঝিতে পারে না। বেদান্ত শাস্ত্রের সন্ন্যাসী সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, এবং প্রকৃত সাধু। ইসলামের সুফী মত, ও হিন্দুর বেদান্ত মত এক, উভয়ে অতি সামান্য ভেদ। সুফী মতের ফকির, সকল শ্রেণীর ফকির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। বেদান্ত ও সুফী মতের পরে আর মত নাই, কারণ ইহাই সর্বজ্ঞানের “অন্ত” বা শেষ। শাস্ত্র, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈকব, তান্ত্রিক, নিরাকার, সাকার, ত্যাগী, ভোগী প্রভৃতি সমুদয়ের বিশ্বজনীন আশ্রমের নাম বেদান্ত বা সুফী।

অতঃপর যুবরাজ পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন, “ঈশ্বর আছেন কি?” বাবুলালজী কহিলেন, “নিশ্চয়।” সন্ন্যাসী কুমার প্রশ্ন করিলেন, “সেই ঈশ্বরের সাধনায় কিপ্রকার ফললাভ হইয়া থাকে?” সাধু কহিলেন, “ভগবৎসাধন হইতে তেজ, বুদ্ধি, বল, ঐশ্বর্যা, সুখ ও শাস্তি লাভ হয়। ইহাতে কাগীর কামনা, আর নিকাশীরও কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।” যুবরাজ কহিলেন, “হে মহামুন্ডব! পরহিত কি পরম ধর্ম?” সাধু বলিলেন, “নিশ্চয়। পরোপকার নিশ্চয়ই পরম ধর্ম। সমগ্র বিশ্বের হিতসাধন করা ধার্মিকের ধর্ম। করুণাময় পরনেশ্বর সমগ্র বিশ্বের অষ্টা, রক্ষক, পালক ও কল্যাণকারী। যে নরাধম বিশ্বকে নষ্ট করিতে চায়, অথবা

• পার্শ্বভী, মহাদেবকে একসময়ে ঠিক এই কথা কহিয়াছিলেন—

“ভেজো বুদ্ধিবলৈষ্যদ্যাদারকং স্বখসাধনম্।” (মহানির্ঝাণতন্ত্র ৪র্থ উদ্যোগ)।

বিশ্বকে দৃঃখময় করিতে ইচ্ছা করে, সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বৈরী এবং ঈশ্বরও তাহার শত্রু, অতএব বিশ্বের কল্যাণ কামনা করা ধার্মিকের ধর্ম, সুতরাং পরোপকার নিশ্চয়ই পরম ধর্ম।”

প্রশ্ন—প্রকৃতি (Nature) এবং সৃষ্ট পদার্থ (Created things) ইহারের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ কি ? উত্তর—বীজ ও বৃক্ষ একত্র স্থিত ও এক সম্পর্কীকৃত (co-existent and co-relative) । সমুদ্র বিনা তরঙ্গ হয় না, কিন্তু তরঙ্গ বিনা সমুদ্র থাকিতে পারে ; বায়ু তরঙ্গের জনক । প্রকৃতি ও সৃষ্টি মূলতঃ এক, কিন্তু সৃষ্টির বৃদ্ধি জন্য আবর্তন কারণের প্রয়োজন, ঐ কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর । প্রশ্ন—পরমাত্মা ও জীবাত্মায় প্রভেদ কি ? উত্তর—বাহ্য-ভাবে প্রভেদ কিছুই নাই, কিন্তু মূলে এইটুকু প্রভেদ যে জীবাত্মা, দেহে আবদ্ধ থাকিয়া সৃষ্টি-দুঃখের উৎপাদন করিয়া থাকে ; প্রশ্ন—সন্ন্যাসী পুরুষ ভগবানকে কিরূপ ভালবাসেন ? উত্তর—তাহা অবর্ণনীয় । আপনি সেইরূপ ভালবাসিলে তাহা জানিতে পারিবেন । প্রশ্ন—পরীরক্ষা কি ধর্ম ? উত্তর—নিশ্চয় । প্রশ্ন—দেহকে কষ্ট দেওয়া কি অধর্ম ?—অকারণে শারীরিক কষ্ট সহ্য করা কি পাপ ? উত্তর—নিশ্চয় । তদনন্তর যুবরাজ কহিলেন, আপনার মতে হিন্দু ও মুসলমান একত্র ভোজন করিতে পারে কি ? এবং একত্র ভোজন করিলে উভয়ে অপরাধগ্রস্ত হইবে কি না ? উত্তর—উভয়ে প্রেমে একত্র ভোজন করিতে পারে, করিলে কাহারও অপরাধ হইবে না ।” ইত্যাদি, ইত্যাদি । (অম্ববাদ সমাপ্ত) ।

এইরূপে সাতবার ঐ মহাপুরুষের শুভদর্শন লাভ ও অসিদ্ধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া সম্রাট-জুমার পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, এবং আধ্যাত্মিক জগতের দিকে তীব্রভাবে আগ্রহ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন । এই কণোপকণনের ফলে যুবরাজ শান্তি ও সুখভোগ করিয়া সংযমী হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ।

* “যতো জগন্মঙ্গলায় জয়াং যিনিযোজিতঃ ।

অতশ্চ কথয়িষ্যামি যশ্চিহ্নিতকৃদভবেৎ ।

কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বর ।

ঐতী ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতং ।

অমীশেনাবিতং বিশ্বং নাশং যাস্তি নিনজ্ববঃ ।

তৎপাত্ত্বং পাতি বিশ্বেশস্তম্যামোকহিতো ভবেৎ ।”

তন্ত্রশাস্ত্রের উক্ত শ্লোকগুলি সাধু বাবুলালের কথার সহিত মিলে ।

একখানি প্রাচীন “চৌতিশা”

চৌতিশা-রহস্য পরিষৎ-পত্রিকা-পাঠকগণের নিকট অবিস্তৃত নহে। আজ তাহারই একখানি পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। এই ‘চৌতিশা’ খানির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রথমংশ প্রমোত্তরচ্ছলে রচিত। এ ধরনের ‘চৌতিশা’ এ পর্যন্ত আর আমাদের হাতে পড়ে নাই।

শ্রদ্ধাম্পদ দীনেশ বাবুর “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” এ ‘চৌতিশা’ খানির উল্লেখ দেখিয়াছি, কিন্তু এ উভয় অভিন্ন কি না বলিতে পারি না।

এ ‘চৌতিশা’ খানি চট্টগ্রামের অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। “বিধুসেন” ইহার রচয়িতা; এ “বিধুসেন” কে, এবং তাঁহার বাড়ী কোথায়, এখন জানিবার উপায় নাই। তিনি করুণরসের কবি, তাঁহার লেখা তেমন কবিত্বপূর্ণ না হইলেও, প্রাচীনতার হিসাবে রক্ষিতব্য।

‘চৌতিশা’ খানির প্রতিলিপি মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ কোন সময়ে রচিত, তাহার কোন নির্দেশ নাই। পাঠান্তর ব্যতীত কোন প্রাচীনগ্রন্থ শুদ্ধরূপে সংগৃহীত হইতে পারে না, কিন্তু আমরা অপর গ্রন্থ না পাওয়ায় পাঠান্তর দিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া ‘চৌতিশা’ খানি এস্থলে যথাযথ উদ্ধৃত্ত করিয়া দিতেছি। শুণাশুণ বিচারের ভার পাঠকগণের উপর ছাড় রাখিল।—

শ্রীহর্গা

দময়ন্তীর “চৌতিশা।”

- ১। কহে দময়ন্তি দেবি নৈবদ চরণ।
কর অবধান প্রভু করম নিবেদন ॥
কর্ম দোষে বিধি বাদি কি বলিব আর।
কৌতুকে খেলিয়া পাসা হারাইলা সংসার।
- ২। খেদ করি কহি প্রভু শুনহ বচন।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ স্মর নারায়ণ ॥
খগেন্দ্র-অনুজ-পতি সে বংশে উদ্ভব।
খিতিতে জন্মিয়া দুঃখ পাইয়াছেন রাবণ ॥

- ৩। গহন কাননে প্রভু ভ্রম অকারণ।
গৌরব করিবো লোকে বলে দুইজন ॥
গতমাত্র পুকে জিনিলা রাজ্যধন।
গোবিন্দ স্বরনে প্রভু হইবে মোচন ॥
- ৪। ঘুনার আকুল তম্বু রিপুগন দেখি।
যরে জাইতে শ্রদ্ধা নাই শুন সুধামুখি ॥
যুগ্মতা ছারিয়া প্রভু দুঃখ পাও বন।
ঘটিলা আপনা দোষে রাজ্য করি পণ ॥
- ৫। উগ্রমতি জাননাথ না হয়ে সর্বদা।
উচিত না হয় প্রভু রহিবারে এথা ॥
উপায় না দেখে প্রিয়া শুন সুধামুখি।
উগ্রতাপ দিল বিধি কোন দোষ দেখি ॥
- ৬। চরণে ধরম মুই করম নিবেদন।
চলহ বৈদর্ভ পুরে যদি লয় মণ ॥
চতুরঙ্গ বলবির্ধ্যা দেখেছিল লোকে।
চলি বাব তব সঙ্গে কোন ছার সুখে ॥
- ৭। ছারধার করিলা প্রভু সব রাজ্য ধন।
ছারিয়া পৌত্রিক রাজ্য প্রবিসিলা বণ ॥
ছলিছে দাকন কলি দেখি এত দুঃখ।
ছারাইতে না পারি দুঃখ বিধাতা বিমুখ ॥
- ৮। জনক-সুতার পতি জনক বচনে।
বথেক পাইলা দুঃখ গ্রহ দোষে বনে ॥
জ্ঞে আছিল রাজ্যধন সজ্জ নিল হরি।
কোন ছার সুখে জীব বৈদর্ভ নগরী ॥
- ৯। ঝর সয়নের নির নহে নিবারণ।
ঝুরিয়া রাজার উরে করিলা সরণ (শয়ন) ॥
ঝালিছে দাকন কলি নৈষধ রাজন।
ঝাটে জায়া এরি রাজা প্রবেশিল বন ॥

(৩) বীৰ্য্য। (৪) শ্রীরামচন্দ্র। (৫) তুলসী। (৬) উল্লেখ।
• (৭) ছলিছে। (৮) শীত। (৯) ভাঙ্গি।

- ১০। এরিয়া নৃপতি স্তম্ভ বহু হুয়ে গেল।
আসিতে না পারি পঙ্খ কলিয়ে ভ্রমছিল ॥
এথা নিদ্রাবেশে জাগে নমস্তু সতী।
নিখাস এরিয়া কান্দে না দেখিয়া পতী ॥
- ১১। টলমল করে প্রান পদ্মপত্রের নির।
টিকিতে না পারি মুই হয়েছি আহুস্র ॥
টিটকারি দিয়া হাসে ছুরাচার কলি।
টনক দগ্ধে প্রান কোথায় গেলা বলি ॥
- ১২। ঠাকুর হইয়া প্রভু হইলা নিদয়া।
ঠেলি জাইতে যুক্ত নহে আপনায় কারা ॥
ঠকতা না কর প্রভু দেও দরশন।
ঠকতা করিলে প্রভু তেজিব জীবন ॥
- ১৩। ডাকাইয়া পুঙ্খের রাজ্য পাসায় জিনিয়া।
ডেকাইয়া (?) পুরি হস্তে দিল খেদাইয়া ॥
ডরে ডরাইয়া মুই হইলুম একেশ্বর।
ডরে প্রাণ জায় মোর স্তন প্রানেশ্বর ॥
- ১৪। ঢঙ্গ কলি ১১ আসিয়া বিরোধ কৈল বনে।
ঢোল করি ১২ প্রভুরে লই গেল কোন স্থানে ॥
ঢলতা ১৩ না কর প্রভু দেও দরশন।
ঢোলতা ১৪ করিলে প্রভু তেজিব জীবন ॥
- ১৫। আনন্দে আছিলাম মুই দিবস রজনী।
অরন্যে আনিয়া মোরে কোলা একাকিনী ॥
অবলা হইয়া হুংখ কথবা সহিমু।
আপনা পুরিতে বাইয়া নিশ্চয় মরিমু ॥
- ১৬। তরু লতা গুহ্য বস্ত চাহিলাম সকল।
তপন স্রুতের ১০ ভয়ে হয়েছি বিকল ॥
তাজিয়া সকল বন্ধ এলুম তব সনে।
তথাপিও ছারি প্রভু গেলা কোন বনে ॥

(১০) হইতে । (১১) হুই ? (১২) চল করিয়া । (১৩) ছুটামি ? তামসা ?

(১৪) চলনা (১৫) কলির ।

- ১৭। স্বাবর নিবাসী যত পশু পক্ষীগণ।
 স্থিররূপি ১৬হইয়া থাকে নিজ পতি সনে ॥
 স্থানস্থিতি বিধাতায় সকলি হরিল।
 স্থানান্তরে আনি প্রভু কোথায় চলি গেল ॥
- ১৮। দৈত্য-অরি-সুত^{১৭} যিনি তমু শোভাকারী।
 দেখিয়া মোহিত হইল বৈদর্ভ কুমারী ॥
 দেবদুত হইয়া গেলা আমার সদন।
 দেবগন এরি লইলুম তোমার স্মরণ ॥
- ১৯। ধরাধর অধিকারী জাহার বাহন।
 পরনিত্তে তার নামে না বহে জীবন ॥
 ধূলি ধূলি সা বিধু ধরে যেই জন।
 ধরিয়া সরিষু তার কণ্ঠের ভূষণ ॥
- ২০। নিমিকালে কেমনে বঞ্চিমু একাকিনী।
 নিরবধি পক্ষি রবে না রহে পরানি ॥
 নিষেধ দিলাম প্রাননাথ আসিবার কালে।
 নিম্নর না পাইলাম গেলা কোন স্থানে ॥
- ২১। পাসায় হারিল প্রভু সব রাজাধন।
 পাসরি পৈত্রিক রাজ্য প্রবেশীল বন ॥
 পাসস্ব^{১৮} না কর প্রভু দেয় দরশন।
 পশ্ব^{১৯} নিরক্ষিয়া আছি তোমার কারণ ॥
- ২২। ফলিল প্রমাদ বর বাম হইল বিধি।
 ফিরি না দেখিলুম আর নল গুননিধি ॥
 ফনাধর বনে আছে সাদ্দুল কেশরী।
 ফুকরী কান্দিতে নারি মনে ভয় করি ॥
- ২৩। বিপিনে বিতকি^{২০} পত্র বিছান রচিয়া।
 বসিয়াছি প্রাননাথ আসিবেন বলিয়া ॥
 বদ্ধু^{২১} সব বিহিন বে হইল তুরঙ্গিনী।
 বনে বিলাপিয়া কান্দে বৈদর্ভনন্দিনী ॥

- ২৪। ভবেতে দমিয়া ছুংথ কত সহিতে পারি।
ভামুত্ত-পুরে২২ যেতে মনে শ্রদ্ধা করি ॥
ভাবিয়া চাহিলুম মুই প্রাণ নহে পাশ্চ।
ভাঙিয়া২৩ আমারে কোথায় গেলেন প্রাণকান্ত ॥
- ২৫। মুণ্ডে হস্ত দিয়া কান্দে দময়ন্তি সতি।
মনছুংথ হইয়া কান্দে না দেখিয়া পতি ॥
অনু কপালিনী মুই পাপিনী ভাগিনী।
মাও বাপ না দেখিলাম মুই অভাগিনী ॥
- ২৬। বগেক কহিল হংস প্রত্যক্ষ জানিলাম।
জগতের নাথ বলি তোমাকে বরিলাম ॥
দদি সে না কর প্রভু আমারে উদ্ধার।
জগতেতে অপযশ হইবে তোমার ॥
- ২৭। রামচন্দ্র রাজা ছিল সূর্য্যবংশে।
রাখিতে বাপের সত্য অরণ্যে অবশেষে ॥
রাবণে হরিল সীতা অরণ্য মাজার।
বাবণ বধিয়া সীতা করিল উদ্ধার ॥
- ২৮। ললাটেতে ভগ্ন মোর এবে সে পরিল।
লাস বেস তোমা বিনে সব দূরে গেল ॥
না জানি ললাটে মোর কি লিখিল খাতা।
লক্ষিতে নারিলাম মুই চলি গেলা কোথা ॥
- ২৯। বিপিনে ভ্রমিয়া সতী পোছে তরুগণ।
বনেনি দেখিয়াছ তোমরা নৈষধ রাজন ॥
বদ্ধ সব বিহীন যে হইলা তুরঙ্গিণী।
বিনে বিলাপিয়া কান্দে বিদর্ভনন্দিনী ॥
- ৩০। সূর্য্য বিনে প্রকাশিত নহে কুমুদিনী।
শশধর বিনে যেন কিন কুমদিনী ॥
সখিতে জিজ্ঞাসি মুই বার্তা কহিলুম সার।
সকল ভাষিয়া লইলুম শরণ তোমার ॥
- ৩১। শত্রুঞ্জয় বরুণ কুবের ধনেশ্বর ॥
সন্তোষ হইল বাপ বৈদর্ভ ঈশ্বর ॥

স্বর্গ্যবংশে জন্মি পাণ্ডু এথেক লাহন ।

সব ত্যাজি গ্রহ ভয়ে চলি গেল বন ॥

৩২। সবিনয় করি প্রভু তব শ্রীচরণে ।

সকল দুঃখ পাশরিমু তব দরশনে ॥

সদয় হইয়া প্রভু দেয় দরশন ।

সকল দুঃখ খণ্ডিবেক দেখি শ্রীচরণ ॥

৩৩। হরসুত-বাতন-নাদে২০ না রহে জীবন ॥

হলাহল পান করি ত্যাজিব জীবন ॥

হাহা প্রভু নল রাজা কোথায় গেলা এরি ।

হিন জনের বাক্য আমি সহিতে না পারি ॥

৩৪। কুনজা গর্ভের গর্ভে রিপূর কুমারী । (৭)

ধরণীতে পূজা করি ছেন ফল বরি ॥

কিণ বিধু সেনে কহে পাইবা নিজগতি ।

কুনিজে২০ খণ্ডিবে গ্রহ দোষ হইবে শান্তি ॥

(সমাপ্ত)

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

কোচ ও রাজবংশীর জাতিতত্ত্ব

কোচ ও রাজবংশী অনেক সময় একজাতি-রূপে অভিহিত হয়। কিন্তু, কতিপয় কারণে আমার সে ধারণা নাই। আমার মত প্রতিপাদনের পূর্বে অত্যাভ্যন্তর মতের উল্লেখ করা আবশ্যিক।

ডাক্তার হাণ্টার ও তাঁহার মতাবলম্বিগণ এরূপ মনে করেন যে, কোচ-দলপতি হাজো কামরূপের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য অধিকার করিলে এ প্রদেশে কোচদিগের আধিপত্য প্রথম পরিগণিত হয়। হাজোর দৌহিত্র বিষ্ণু (বিষ্ণু) সিংহের রাজত্বকালে রাজা বিষ্ণু অমাত্যাদি সহ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হন ও কোচ অভিধা পরিহারপূর্বক রাজবংশী আখ্যা গ্রহণ করেন। কোচ বা রাজবংশীর সংখ্যা উত্তরবঙ্গে অত্যন্ত অধিক।

Mr. C. F. Magrath-সঙ্কলিত Census Compilation নামক পুস্তিকার পরিদৃষ্ট হইবে

যে শুধু জলপাইগুড়িতে হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৭৫-২ জন রাজবংশী। ইহাদের মতে, রাজবংশী ও পালি বা পালিয়া, কোচ জাতিরই বিভিন্ন শাখা মাত্র। কোচ ও রাজবংশীর সাধারণ উপজীবিকা কৃষি। Census Reportএ কোচ সংখ্যা ভিন্নভাবে বিবৃত হয় নাই। উহা রাজবংশী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধরা হইয়াছে। আদিম কোচের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

আমার ধারণা, রাজবংশী জাতি প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের খেন-পূর্ব অধিবাসী। ইহাদিগের পর কামরূপে খেন রাজত্ব, তৎপরে কোচ আধিপত্য। রাজবংশিগণ বিজেতাগণের সংঘর্ষে ও সাম্রাজ্যে প্রথমতঃ খেন ও তৎপরে কোচদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষা কতক-পরিমাণে গ্রহণ করে। খেন-রাজগণ কামরূপ রাজ্য আক্রমণ কালে যে সংখ্যা-বহুল ভক্ত ক্ষত্রিয় জাতির সংঘর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহারাই রাজবংশী। এতদ্বিষয়ক স্থির মীমাংসা দক্ষতর ব্যক্তি করিবেন। আমি আমার বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছি। কোচ ও রাজবংশী জাতির একত্ব (Identity) অভিনব চর্চার অভাবে ঋষ সত্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিল দেখিয়া এতদ্বিষয়ক আলোচনা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আশা আছে উপস্থিত সাহিত্যসেবীমণ্ডলীর চেষ্টায় কোচ ও রাজবংশীর জাতি-তত্ত্ব (ethnology) নির্ণয়ে কালাতিপাত হইবে না।

কোচ ও রাজবংশী যে বস্তুতঃ বিভিন্ন জাতি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত অল্পসংখ্য-প্রণালীক অবলম্বনে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

(১) আকৃতি।—বর্ণ ও শারীরিক গঠনাদি।

(২) ভাষা।—উভয় ভাষার পার্থক্য আলোচনা।

(৩) ধর্ম।—উভয় জাতির ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রানুশাসনে ভক্তি বা অবহেলা।

(৪) আচার ব্যবহার।—উভয়জাতির মধ্যে প্রচলিত আচারব্যবহারের আলোচনা।

(৫) আদিম কালের ইতিহাস।—উভয় জাতির উৎপত্তির বিবরণ ও প্রাগৈতিহাস আলোচনা।

(১) আকৃতি।—সকল কোচের মঙ্গোলীয় গঠন। কেবল মাত্র বাহারা অপকৃ জাতির সহিত বিবাহ-স্বত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা তুলনায় আদিম কোচ হইতে স্বরূপ। ফলতঃ, শুধু বৈবাহিকস্বত্রে (Inter-marriage) ঐ আকৃতিবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। নচেৎ-অপর সাধারণ কৃষকার, দূততন্ত্র, চিপটি নাসিক, অপ্রশস্ত চক্ষু, এবং উচ্চ চিবুক ও বিশাল হস্তযুক্ত। ইহা হইতে উহাদিগকে মঙ্গোলীয় বলিয়া অনুমিত হয়। বস্তুতঃ, আদিম কোচ ও রাজবংশীস্বর্ণের আকৃতিতে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। আদিম কোচ কৃষকবর্ণ, কদাকার জাতি। পক্ষান্তরে, অনেক রাজবংশী স্বপুরুষ। কোচ ও রাজবংশীদিগের মধ্যে বিবাহবিষয়ক আদানপ্রদানে ও পরস্পরের আচারব্যবহারাদির অনুসরণে এই দুই জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে সমতা সংঘটিত হইয়াছে। অনেক রাজবংশীর হৃদয় আর্ধ্যমূলক আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের উত্তর দেশবাসী

রাজবংশীগণের আকার হইতে দক্ষিণাঞ্চলবাসী রাজবংশীদিগের আকৃতি অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। রঙ্গপুর ও দিনাজপুরবাসী রাজবংশিগণ জলপাইগুড়ি-বাসী রাজবংশিগণ হইতে অধিক সূতী। বলা বাহুল্য, পুরাকালে রঙ্গপুর প্রদেশেই রাজবংশী ও খেন জাতির প্রধান আবাস-কেন্দ্র ছিল।

(২) ভাষা ।—আমার ধারণা, রাজবংশীদিগের প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত ও মৈথিল শব্দ হইতে উৎপন্ন। বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষে যে সকল শব্দ রাজবংশীদিগের ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা পৃথকরূপে প্রদর্শন করা সহজসাধ্য। মূলতঃ, সংস্কৃত ভাষাই রাজবংশী ভাষারও মাতামহী। কিন্তু, কোচ শব্দের ক্ষুদ্র ধাতুগত ব্যুৎপত্তি কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। পিয়ান্—পিপাসা; চিন্—চিহ্ন, পথী—পক্ষী, পাথী; মোর—আমার; মোক্—আমাকে; গরা—গোরা, গোর; নিরিথ্—নিরীক্ষণ, গির্‌থানী—গৃহিণী, কত্রী, ইত্যাদি রাজবংশী শব্দ। ইহাদের উৎপত্তিনির্ণয়ে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। কিন্তু কোচ শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃতমূলক না হওয়ায় উহার উৎপত্তিনির্ণয় করা দুষ্কর ব্যাপার। আমার বিশ্বাস, বিৎ—চুপ কর; চাকুলা—পশু; ডেফু—কাঁকড়া মাছের বড় পা; ত্যারাং বাটাং—জীর্ণ ও ভগ্ন; আহু—ভগিনীপতি; ছাকা—ক্ষার (‘খার’ রাজবংশী শব্দ) ইত্যাদি কোচ শব্দ। বিভিন্ন ভাষার শব্দসংশ্লিষ্ট কোচ ও রাজবংশী শব্দমালা পৃথকরূপে শ্রেণিবদ্ধ করা সাধারণ চেষ্টার অতীত কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি কেহ কেবলমাত্র এই দুই জাতির ভাষাতত্ত্বে সময়োচিত কঠোর সমর্থ হন, তবে তাঁহার চেষ্টায় প্রস্তাবিত বিভিন্নতা সম্পাদন সম্ভাবিত হইতে পারে। আমি অল্প সহস্রাধিক কোচ ও রাজবংশী শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া বিশেষ্য, বিশেষণাদি ক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছি*। যোগ্যতর ব্যক্তির অনুসন্ধান-নৈপুণ্য ও গবেষণায় ভবিষ্যতে অনেক সূক্ষ্মের প্রত্যাশা করি।

(৩) ধর্ম ।—কোচগণ বিজয়সিংহের রাজত্বকালে হিন্দুধর্মের দীক্ষিত (Converted) হয়। রাজবংশিগণ পূর্বাধিক হিন্দু। পূজাবিশয়ে কোচ ও রাজবংশী জাতির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মহাকাল-পূজা রাজবংশীরা করে না, কিন্তু কোচবিহারে ও বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ীতে উহা প্রচলিত। ইহা এক প্রকার ধ্বজা-পূজা! * বলি—ছাগ, কুকুট, বরাহ। ইহাতে দেউশি-কৃত ছাগ বলি, মুসলমান-কৃত কুকুট জবাই ও হাড়িজাতি-কৃত শূকর বলি প্রভৃতি কোচগণের হিন্দু হইতে পার্থক্য সপ্রমাণ করে। মদন বাঁশের পূজা আদির রাজবংশীদিগের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। তবে যাহারা কোচদিগের সহিত বৈবাহিকমুদ্রে আবদ্ধ হইয়াছে, অথবা অন্তপ্রকারে কোচদিগের ধর্ম ও আচারাদির অনুসরণ করিয়াছে

(১) পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* রাজবংশী ও কোচজাতির ধর্ম-কর্ম বিষয়ক আলোচনায় মহাকাল-পূজা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তাহারা মদন বাঁশের পূজা করিয়া থাকে। রাজবংশীদিগের পূজাদি মূলতঃ হিন্দুদিগের পূজা-প্রভৃতি হইতে গৃহীত।

(৪) আচার ব্যবহার ।—অনেক রাজবংশী শূকর কুকুট মাংস আহার করে না, কিন্তু কোচেরা তাহা অবলীলাক্রমে উদরস্থ করে। তবে ‘গুট্‌কি’ (গুড়) মৎস্ত ব্যবহারে উভয় জাতিরই সমতা পরিদৃষ্ট হয়। আহার সম্বন্ধে বিচার রাজবংশী নামধেয় অনেক জাতির নাই। বলা বাহুল্য, অনেক মেচ ও অগ্র নীচ জাতি রাজবংশী আখ্যা গ্রহণ করায় জন-সাধারণের ধারণা, রাজবংশীগণ স্বভাবতঃ কুকুট ও বরাহমাংসানী। আদিম কোচ বা পাণিকোচ অধিকাংশ পাকীবাহক। রাজবংশীদিগের সাধারণ উপজীবিকা কৃষি। তাহাদের আচার-ব্যবহার প্রধানতঃ হিন্দুদিগের অনুরূপ। তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল অনেক হিন্দু ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কোচদিগের আচার-ব্যবহার প্রায়শঃ হিন্দুদিগের অননুমোদিত। কোচ-স্পৃষ্ট জলও অনেক হিন্দুর অব্যবহার্য্য। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে রাজবংশী জাতির মধ্যে কোচের সংমিশ্রণের দ্বারা উচ্চবর্ণের জারজ সম্ভানেরাও উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আচার-ব্যবহারও তদনুযায়ী হইয়াছে। রাজবংশীদিগের আচার-ব্যবহার এতাদৃশ হীন হইয়াছে যে, হিন্দু চাইলেও তাহাদিগের আচারব্যবহার হিন্দু হইতে বিভিন্ন পরিলক্ষিত হয়। এক বাটীতে রাজবংশী ও মুসলমানদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বাস করিতে দেখা যায়। * বস্তুতঃ, রাজবংশীদিগের খাণ্ড, পরিধেয়, বিবাহ-প্রথা, ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনেকাংশে হিন্দু হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজবংশীগণ আহার ও ব্যবহারাদিতে শাস্ত্রানুশাসন বিশেষ গ্রাহ্য করে না। গান্ধর্ব্ব বা বিধবাবিবাহ (ডাঙ্গুরা, ধোকা, পাছুরা, বিবাহ) হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত নহে। তিস্তাবুড়ী পূজা, আখাই-পোখাই, ধরম পূজা অপর হিন্দুদিগের মধ্যে দৃষ্ট না হইলেও উহাতে হিন্দুধর্মের অনুকরণ লক্ষিত হয়। অধিকাংশ পূজায় শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নাই। কতকগুলি বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচায়ক।

(৫) আদিমকালের ইতিহাস ।—কোচদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রে মত কোচগণ প্রামাণ্য মনে করে। যোগিনীতন্ত্রে কোচদিগকে “কুবাচ” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, “মাংসচ্ছেদ্যাঃ তীবরেন কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।” —ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

যোগিনীতন্ত্রে তান্ত্রিকগণের কল্পনা-প্রভাবে যে অপূর্ব উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে নির্দিকার অনাদিদেব বিশ্বেশ্বরকে লইয়া যেরূপ স্পর্ধা, অবিবেকতা, মূঢ়তা ও উপেক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে, তদদর্শনে যুগপৎ স্তম্ভিত ও ছঃখিত হইতে হয়। উক্ত তন্ত্রের ত্রয়োদশ পটলে মহাদেবের উক্তি বলিয়া যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নিষ্কাম আশুতোষের উপর সকল দোষ গ্রস্ত করিয়া কোচরাজগণের শিববংশধর

* Report of the Deputy Commissioner of Jalpaiguri, 1870.

কামনা সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তন্ত্রোৎপত্তির অপর কারণ সম্বন্ধে আমারও ধারণা যে, the doctrines contained in these works (i. e. the Tantras) admit of many indulgences necessary for new converts, and calculated to enable the Brahmans to share in the pleasures of a sensuous people. They inculcate, chiefly, the worship of the female spirits, who require to be appeased with blood; which was the original worship of the country, and has now become very generally diffused among the Brahmans of Bengal, with whom the Tantras are in the highest request.” *

যোগিনীতন্ত্রোক্ত শিব বলিতেছেন,—

“নগেন্দ্রতনয়ে বালে শৃণু মং প্রাণবল্লভে ।
তৎ সাক্ষীচরিতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শুচিস্মৃতি ॥
রসক्रीড়া কৃত্য সাক্ষিমেকাত্মকাননে মুদা ।
বেদাঙ্গসম্ভবা সাক্ষী যোগিনী সা স্মরা মতা ॥
নানুভূত্যাঃ স্মৃতিশ্চৈব মংক্রিয়ায়াং নগায়জ্ঞে ।
মামাশ্রু মৃৎকটং তপ্তং ত্রয়ং মে ক্ষেত্রকামদঃ ॥
একাত্মগহনে দেবি পৰ্বতে তীর্থসঙ্কুলে ।
তত্রৈকো ব্রাহ্মণো যাতো ভিক্ষার্থং তামুবাচ হ ॥
ন দত্তমুত্তরং তস্মৈ ভিক্ষা তিষ্ঠতু দূরতঃ ।
ততঃ শশাপ বিপ্রস্তাঃ স্নেহতাং যাহি হৃষ্যদে ॥
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো স্নেহদ্যমাপ যোগিনী ।

* * * *

তস্তাস্ত তপসা দেবি ক্রীতোহহমভয়ং সদা ।
অতস্তয়া রতিযাতা মম কামিনী সৰ্বদা ।
তস্তাঃ পুত্রো বিগুসিংহো মদৌরসসমুদ্ভবঃ ॥

* * * *

তস্তাপি বহবঃ পুত্রাঃ পৃথিবী পরিপালকাঃ ।
কুবাচা ধার্মিকাঃ সৰ্বে রাজানো যুদ্ধহৃদয়াঃ ॥
তেহপি ত্বং স বিগুসিংহো যোগমাশ্রিত্য বিহবলে ।
তিষ্ঠত্যব্যাক্রপেণ পটু আকল্পমধিকে ॥
কালং সা মাধবী দেবী মদেহে নীচতাং গতা ।
যথা জায়া নন্দিমাতা তথেষং যোগিনী মতা ॥

* Dr. Buchanan Hamiltons Ms. Account of Rangpur (1809)

যথা পুত্রো ভূধরীটস্তথা বিস্তৃত্য অজঃ ।
 বিশ্বেসিংহোহপি কল্যন্তে পরাং সিদ্ধিমবাপ্যতি ॥
 তদংশজাস্ত রাজানঃ সর্কে কৈলাসবাসিনঃ ।
 ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো গণেশাঃ সর্কশালিনঃ ॥
 রূপযৌবনসম্পন্নৈর্দেবকভাগৈঃ সহ ।
 বিহরন্তি সদা দেবি ক্রীড়ন্তে ভৈরবা যথা ॥

* * * *

তথা তদংশজাঃ সর্কে ভবেয়ুঃ কামপালকাঃ ।
 কল্যন্তমেব দেবেশি যাবচ্ছাপো বিমুচ্যতে ॥”

(যোগিনীতন্ত্র—ত্রয়োদশ পটল)

হুর্ভাগ্যবশতঃ, কোচদিগের উৎপত্তি বিষয়ে তত্ত্বোক্ত দেবত্বের আরোপসম্বন্ধেও তাহা-
 দিগকে কোনরূপ জাতিগত সম্মান লাভ করিতে দেখা যায় না। আমরা ধারণা আমি
 পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি যে কোচেরা মঙ্গোলীয় সম্পর্কিত জাতি। দ্রাবিড়াক্ষলবাসীদিগের
 জায় ইহাদিগের বস্ত্র পরিধানপ্রণালী, অবগুষ্ঠনাভাব এবং অলঙ্কারাদি দৃষ্টে কেহ কেহ
 অনুমান করেন যে, আর্য্যদিগের বস্ত্রপ্রবেশকালে যে সকল রাজ্য প্রাদেশীয় দ্রাবিড়গণ
 দূরীভূত হইয়া উত্তর ও উত্তরপূর্ব বঙ্গের আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা ই প্রকৃত-
 পক্ষে কোচ বা রাজবংশী। নানা কারণে আমি এই মত সমর্থনে অনিচ্ছুক। কেবলমাত্র
 পরিধেয় ও অলঙ্কারের সাদৃশ্য দৃষ্টে উভয় জাতির একত্ব প্রতিপাদন করা বিড়ম্বনা মাত্র।
 রাজবংশী ও কোচের আকৃতিগত, ভাষাগত ও অপরাপর বৈষম্যের বিষয় সংক্ষেপে উক্ত
 হইয়াছে। বিস্তার নিম্নয়োজন।

আমি বলিয়া আসিতেছি, কোচেরা আক্রমণকারী বহির্দেশবাসী জাতি। রাজবংশীগণ
 কামরূপ রাজ্যের খেন-পূর্ব অধিবাসী। “রাজবংশো রাজবীৰ্য্যঃ” ইত্যমরঃ। ইহারা ত্রাতা
 বা আচারজ্ঞ ভদ্রকৃত্রিয়। রাজন্ বা রাজন্ত শব্দ কৃত্রিয়বাচক। অতএব রাজ অর্থাৎ
 কৃত্রিয় বংশধরকে রাজবংশী বলা যায়, ইহাই মুখ্যার্থ। অনেকে রাজবংশীদিগকে কোচ
 রাজবংশীর জ্ঞানে যে বুৎপত্তি করেন, তাহা বিকৃত গোণার্থ। ফলতঃ অমর-ধৃত রাজশব্দার্থ
 কোচরাজব্যঞ্জক নহে।

“পরশুরামভরাৎ ক্ষত্রীসংকোচাৎ কোচ উচ্যতে।” ১

এই শ্লোক-রচয়িতার কল্পনা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক মাত্র। তাহার প্রতিপাদিত মতের
 স্বপক্ষে যুক্তির নিতান্ত অভাব। নিরুপদ্রব আদর্শদেবকে লইয়া কেবল মাত্র একটি উপাখ্যান
 রচনায় প্রমাণ প্রবল হয় না। আমি অনেক কোচকে “শিববংশী” বলিয়া পরিচিত হইতে
 যত্নশীল দেখিয়াছি। ‘কোচ’ বলিলে তাহারা অসম্ভব হয়। বস্তুতঃ, “শিববংশী” আখ্যা
 কোচেরই শ্রুতিস্মৃতকর নামান্তর মাত্র। রাজবংশীগণ কোচের জায় উৎপত্তি স্বীকার করে

না। তাহারা ষোগিনীতন্ত্রোক্ত পরিচয় প্রদান করে না। ত্রাত্যক্ষত্রিয় হইলেও তাহা-
দিগের আচারব্যবহার যে অত্যন্ত হান হইয়া পড়িয়াছে, ভবিষ্যে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোচ ও রাজবংশী জাতির পার্থক্য নির্দেশের পর অপর একটা প্রশ্ন স্বতঃ উদ্ভূত
হয়। কোচ ও রাজবংশীগণ কি আৰ্য্য জাতি? আমরা ষোগিনীতন্ত্রের মত স্বীকার
করি নাই। অতএব পূর্ববর্তী যুক্তির সাহায্যে কোচদিগকে মঙ্গোলীয় জাতি বলিব। পক্ষা-
ন্তরে, রাজবংশীগণ ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত বলিয়া তাহারা আৰ্য্যসন্ততি। কোচেরা বিশুসিংহের
রাজত্বকালে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত (Converted) হয়। কিন্তু রাজবংশীগণ পূর্বাধি হিন্দু।
যদিও তাহাদের অনেক আচার ব্যবহার হিন্দুধর্মবিগর্হিত, তথাপি আকৃতি, ভাষা ও ধর্ম্মাঙ্-
গঠান প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে আৰ্য্যমূলক। পৌণ্ড দেশে বাসের পর হীনজাতির সংমিশ্রণে
যে আচারভ্রষ্টতা রাজবংশীগণের অধোগতির কারণ হইয়াছে, কেবল তদ্ব্যতীত উহাদিগের
অনার্য্যত্ব প্রতিপালনপ্রয়াসী হওয়া নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল।

কোচ ও রাজবংশী শব্দ-সংগ্রহ

আমার ধারণা, রাজবংশীদিগের প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত ও মৈথিলী শব্দ হইতে উৎপন্ন।
বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষে যে সকল শব্দ রাজবংশীদিগের ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা
পৃথক্ রূপে প্রদর্শন করা সহজ সাধ্য। মূলতঃ, সংস্কৃত ভাষাই রাজবংশী ভাষারও মাতানহী।
কিন্তু, কোচ শব্দের দ্রুত ধাতুগত ব্যুৎপত্তি কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। পিয়াস—পিপাসা,
চিন্—চিহ্ন, পখী—পক্ষী—পাখী, মোর—আমর, মোক্—আমাকে, গরা—গোরা—গৌর,
নিরিখ্—নিরীক্ষণ, গির্থাগী—গৃহিণী, কর্ত্তী, ইত্যাদি রাজবংশী শব্দ। ইহাদের উৎপত্তি
নির্ণয়ে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। কিন্তু কোচ শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃতমূলক না হওয়ায়
উহার উৎপত্তি নির্ণয় করা দুষ্কর ব্যাপার। আমার বিশ্বাস, ঝিং—চূপ কর, চাকুলা—পজু,
ডেকু—কাঁকড়া মৎস্তের বড় পা, ভ্যারাং ঝাটাং—জীর্ণ ভয়, আয়ু—ভয়ীপতি, ছ্যাকা—ক্ষার
‘খার’ রাজবংশী শব্দ ইত্যাদি কোচ শব্দ। বিভিন্ন ভাষার শব্দ সংমিশ্রণে কোচ ও রাজবংশী
শব্দমালা পৃথক্ রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা সাধারণ চেষ্টার অতীত কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি
কেহ কেবল মাত্র এই দুই জাতির ভাষাতত্ত্বে সময়াতিপাত করিতে সমর্থ হন, তবে তাহারা
চেষ্টায় প্রস্তাবিত বিভিন্ন সম্পাদন সম্ভাবিত হইতে পারে। আমিও রাজবংশী শব্দাবলী
সংগ্রহ করিয়া বিশেষ্য ও বিশেষণাদি ক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

মাসের নাম

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কা্তিক, অঘন, পুষ, মাঘ, ফাগুন, চৈত্র।

বারের নাম

সো (রবি), সপ, মঙ্গোল, বুধ, বিস্তি, শুক্র, শনি।

তিথির নাম

ঘটি—তিথি। ১ ঘটি, ২ ঘটি, ৩ ঘটি ইত্যাদি প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া অর্থ ব্যাহত হয়। পূর্ণিমা—পূর্ণিমা। অমাবসী—অমাবস্যা।

পক্ষ। দ্বোনাক্ষ—শুক্লপক্ষ।

আদ্বার—কৃষ্ণপক্ষ।

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবাক্য সাধারণ শব্দাবলী

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
কাণ	কর্ণ।	চাম্‌রা	চন্দ্র।
নহক, নখুন	নখ।	বুক	বৃক, বক্ষঃস্থল।
গতর, গাও	গাত্র, গা।	পিঠী	পিঠ, পৃষ্ঠ।
দাত	দন্ত।	আঙ্গুল, অঙ্গুলী	অঙ্গুলী।
গালা	গলা, গ্রীব।	পাও, ঠাং	পা, পদ।
গলা	গলিত।	চরু	উরু।
তালু	তালু।	থলু মা	উরু।
কাং	কাঁধ, স্বজ।	হাঁটু	হাঁটু, জঙ্ঘ।
ভুরু	ভ্রু।	কমর	কোমর।
চখু	চক্ষু।	গদান	গদান (হিন্দী)
গাল	গণ্ড।		ঘাড়, গ্রীব।
মণি	চক্ষুর তারকা বা মণি।	হোংলাই, থুতুলী, থুতী	চিবুক।
জিভা	জিহ্বা।	কটি	গুহ্বার; কটিদেশ
কণ্ঠা	কণ্ঠ।		অর্থে এই শব্দ প্রযুক্ত হয় না।
ওঠ	ওষ্ঠ।	কিল্কানি	কম্বুই।
		টিকা	গুহ্বার।

সংখ্যায় নাম

আক, দুই, তিন, চার, পাচ, ছয়, সাত, আট, নও, দশ, আগার, বার, তার, চৌদ, পোন্দরো, ষোল্লো, সোত্তোরো, আঠার, উল্লিশ, বিশ, একইশ, বাইশ, তেইশ, চৌবিশ, পচিশ, ছাব্বিশ, সাতাইশ, আটাইশ, উত্তিশ, তিশ, একুতিশ, বত্তিশ, তেত্তিশ, চৌতিশ, পয়তিশ, ছত্তিশ, সাত্তিশ, আটতিশ, উনচাল্লিশ, চাল্লিশ, ইত্যাদি। কিন্তু সচরাচর শিক্ষিত ব্যক্তিগণই এক শতাধিক সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ। সাধারণতঃ সকলে কুড়ি পর্য্যন্তই গণনা করে। কুড়ির অধিক হইলে কত কুড়ি কেবল তাহাই বলে।

বিবিধ শব্দাবলী

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
চামগাহেন	উল্কা ।	“মোর আগত্ হনম্ ঠাই করিবার	
গুড়া বা গুড়া	ছাত্ত ।	না লাগে ।”	
ছাওয়া	ছেলে ।	অর্থাৎ আমার সম্মুখে ওরূপ ভ্রাকাম	১
বেটা ছাওয়া,	পুত্র ।	করিও না ।	
বেটা ছাওয়া	কন্যা ।	বাঁদী	চাকরানী, বাঁদী ।
ডিল্	আকার ।	ধাপত, চালিত্	বারান্দায় ।
চেন্‌রা	ছেলে ।	দশি	কাঁপড়ের ছিলা ।
চেন্‌রী	মেয়ে ।	দশি বুলা	কৌঁচা বুলাইয়া দেওয়া
টক্	রূপ, শ্রী ।		অর্থাৎ কৌঁচা ছেড়ে দেওয়া ।
নাউয়া	নাশিত ।	এই অর্থে একটি শ্লোক	
নাউয়ানী	নাশিতাঙ্গনা ।	প্রচলিত আছে । যথা—	
কাওলা, কাওলি	ধেঁসকঁদা কাসে ।	“খুতি সে জারাম্ খারাম্ দশি সে নাই ।	
সাত গোভে	সাত গোত্রে, সাত	মুখে সে মটর বটর টাকায় সে নাই ॥”	
	গুরুষে ।	জাণ্যাম্ খারাম্—	মাটিতে হেঁচড়াইয়া
ছাঁকা	একপ্রকার ফারের		যাওয়া । (যেমন—
	জল (লবণের পরিবর্তে ব্যব-		কাঁপড়ের কৌঁচা ।)
	হৃত) ; ফার ।	শ্লোক পাঠকালে “টাকায়” “টাকায়”	
ছাঁকা (ক্রিয়া)	দোহন করা এবং	রূপে পঠিত হইবে । শ্লোকটি হাত্ত-	
	ছাঁকিয়া ফেলা ।	দীপক অথচ নীতি প্রদ ।	
“ছাঁকা” এখনও প্রায় প্রত্যেক		ফাটরা	এক লম্বা ফাইল
গৃহস্থ-বাটিতে ব্যবহৃত হয় । তবে যে			(বা খণ্ড) ; চট্ বা মাজরের খণ্ড
সকল গৃহে ইদানীন্তন কালের শিক্ষা			অর্থে ব্যবহৃত হয় ।
প্রবেশলাভ করিয়াছে তথায় কিয়ৎ		ফাইল বা ফালি	চারি আইল বেষ্টিত
পরিমাণে লবণের ব্যবহার প্রচলিত হই-			একখণ্ড জমি ।
য়াছে । “ছাঁকার” প্রলোভন এখনও		ভাস্কি, পেচি	তৈল রাখিবার এক
প্রায় সমভাবে বর্ধমান ।			প্রকার ভাণ্ড । উহার
“ছাঁকা পারিবার গেইছে” অর্থাৎ ছাঁকা			গলা মুখ সুরু ।
জলে নিশ্চিত করিয়া তন্দ্বারা বস্ত্র		খুটি	ইহাও তৈল রাখি-
ধৌত করিতে গিয়াছে ।			বার ভাণ্ডবিশেষ,
“ছাঁকা বাধুলা করিবার গেইছে” অর্থাৎ			ইহার মুখ প্রশস্ত ।
গাছ ইত্যাদি পুড়াইয়া ছাঁকার		কাঁকই	চিরুণী ।
অন্ত ফার প্রস্তুত করিতে গিয়াছে ।		গিরখানী	গৃহিণী, কত্রী ।
ঠাই	অজডলী, ভ্রাকাম । যথা—	গিরন্ত	গৃহস্থ ।

শব্দ	অর্থ
যাধুরি	জেবু।
ভুইদম্কা	ঘাটিতে স্থাণু দাপ্ শব্দ করিয়া যে হাঁটে। কস্তী।
মুলাঠ দাঁতা	মূলো দাঁতী; মুলার তায় দাঁত বাহার, অর্থাৎ হাতী।
ডেহু	কাঁকড়া মংছের বড় পা।
বঁটা	পথ।
বখিল, কিপিণ	কৃপণ।
যথা—“বখিলারে খা।”	
পোষন্, পোরশন্, চাকন্,	} দয়া।
শনকি ও শান্কাউ	
বান্, গিঠো, গাঠি—গাঁঠট্।	
ভাকন (দেওয়া)	পাকস্পর্শ, নব- বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা আত্মীয়- স্বজনকে প্রথম ভাত দেওয়া।
কাতার বা তাতার	সারি বা শ্রেণী।
দেউলিগা	কোন পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয় লইয়া নানাস্থানে যাতায়াত করে ও ঐ সকল কার্য্য বাহার তত্ত্বাব- ধানে থাকে।
দেওয়ানীয়া	অপরের পক্ষে নামক দৌলদমা ঠালান বাহার ব্যবসা।
ঠাল্	ভাল, শাখা।
গাছ, বিরখ্	গাছ, বৃক্ষ।
খগ, চকুল্, চুকুল্	যে কাছাকাড় মিন্দা- বাদ করে।
কিড়া	শপথ।
বাটৈ, বাউ, বাছা	(ইহা মথোদন পদেও ব্যবহৃত হয়।) বৎস, বাছা, বাবা, বাবুয়া (হিন্দী)—বাউ। আদামে— বাপুয়া, বাপ, বাবা, বাছা।
মাই, মাও	মা।
মাই	অবৈ (মা)।

শব্দ	অর্থ
হাউন্	মথ্, আশা।
দোহর, শিলাখ	দুই ভাঁজ করা উড়ানী (বস্ত্র)।
লাজ	লাজ, লজ্জা।
আমলটা	আদতটি, সম্পূর্ণটি।
কৈল্যা, আল্‌রা	কয়লা। ইহাকে ‘টিকিয়া’ বা ‘টিকা’ বলে না।
শায়া	শয্যা।
ঝাপ	সেকি, চিক্।
ঝাপি বা ঝাপ	বংশ ও বংশপত্র- নির্মিত ছত্রবিশেষ।
চান্দিয়া	চাঁদি, আখা।
চান্দিয়া মুড়া	নেড়া (মাছ)।
চিহিয়া	চোহারা।
ঠক্ঠক্	পলবিশেষ।
ছা	ছেলে, ‘ছাওয়া’।
‘ছা’ ক্রিয়া	ছোঁয়া।
আঙাবাচ্চা	সগোষ্ঠী, সহগোষ্ঠী।
রম, লম	রোম, লোম।
চুল্	চুলী।
ভোজ-ভেঙেরা	ভোজ।
ভেঙেরা	ভাঙার। মানুষিগের ভোজকে ‘ভাঙার’ কহে। তাহা হইতে বর্তমান অর্থ।
পখী	পক্ষী, পাখী।
ভাটি	ভাটা।
অঘন্	অগুণ।
ঘিণ্	ঘৃণা।
মিছা কাণ্	মিথ্যা কথা।
মজ্যা	মজা।
রতি	রাত্রি।
আৎ	রাত।
সওয়াদ	বাদ। (ইহাও বিজ্ঞ- উচ্চারণ কতক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে।)

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
নিন্	নিদ্, সিদ্ধি।	দ্রাব	(বিশুদ্ধ উচ্চারণ, দ্রব্য)
তার	তারকা।	অজ্ঞ	ভগিনীপতি।
চান্	চান্দ, চাঁদ, চন্দ্র।	আবো	ঠাকুরমা।
গুয়া	গুয়া, গুবাক।	গুফা	গুহা, গহ্বর।
নারকোল্	নারিকেল।	তাল	তেল, তৈল। প্রচ-
ক্যাদো	কাদা, কর্দম।	লিও	তেলীর ভাষা,—ভ্যাগ্
পাশ্	পার্শ্ব।	নিব্যান্	বাঁহে ত্যাগ্।
পাত্	পত্র।	আং	রাত, রাত্রি। 'র'
বাশ	বাঁশ, বংশ।		বর্ণের উচ্চারণ 'অ' র স্থান ঘণা,
গান	গীত।		আমপ্রসাদ—রামপ্রসাদ, ইত্যাদি।
হাম্	হিমা।		ইহার বিপরীত অগাণীও আছে,
আক্শন্	রক্ষন।		তাহা স্থানান্তরে প্রদর্শন করা
দেউশি, দেন্খা, দেহরি, মন্দিরের পরিচাবক,			যাটবে।
(এখানে শি = ঝি = ঝা = ওয়া		পরধ্	পরীক্ষা।
(উপাখ্যায়)। অঝা—রোজা।		মন্দির	মন্দির।
'ওঝা' হইতে 'রোজার' বর্তমান		পিঠা	পিঠক।
অর্থ।		খজা	খনিজ।
আথাই গোথাই	একপ্রকার পূজা।	ধআ, ধুরা	ধূম। ধআ (ক্রিয়া)
বৈদ	বৈজ্ঞ		ধোয়া।
তির্বা	তৃষা, তৃষা।	ধুয়া	পরিষ্কার, শুষ্ক কঙ্ক-
পিরাস্	পিপাসা।		লাদি পরিষ্কারার্থে ব্যবহৃত হয়।
জাও	দেও, দেব	ফুক্	ফুৎকার।
	(অপদেবতা)	ফুলুয়া	ফুলুগা।
চিন্	চিহ্ন।	ঠাই	স্থান।
পথ	পস্থা।	ঘরটা, ঘরকোনা	ঘরটি, গৃহটি।
কাম	কর্ম।	তাও	তাপ।
কাব	কার্য।	শিয়াল	শৃগাল।
ধরম	ধর্ম। 'ধরমপূজা'	শোক	শোক।
রাজবংশীদিগের মধ্যে প্রচলিত		হুথ	হুঃধঃ
পূজাবিশেষ।		টিনা	তৃণজলোকা,—
ভোক্	বুড়ুকা।		ছিনে জোঁক।
সিঁদুর	সিন্দূর।	জোক্, জলুক	জলোকা। দীন-
বীচন	বীজন।		বন্ধ,—“চিহ্না জোহে কামড় দিলে
পাকুই	পাকুই। সংস্কৃত		ভুবভুরাইয়া নাচে।” ইহা ভিন্ন
	অলসক রোগ।		প্রাদেপিক ভাষা।

শব্দ	অর্থ
কাজল	কঙ্কাল
আম, (রাম)	আম্র। [রা=আ ; আ=রা। রাম=আম ; আমনাথ=রামনাথ]
ডাণ্ডিম,	ঘাড়িম দাড়িম।
তাল	তাল।
খেজুর	খজুর।
শিমলা	শাল্মলী, শিমুল।
সাল	সাল।
সিনান	স্নান। যথা স্নান- দাস,—“অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।”
শরীর	শরীর।
পহর	প্রহর।
লুন, লুন্	লবণ।
ছেন্দা	ছিদ্র।
দোষ	দোষ।
যুঝ, যুদ্ধ	যুদ্ধ।
মানুষ, মান্বি	মনুষ্য।
হুধ	হুধ।
নদী	নদী
শিকা	শিখা, শিক্কা।
বস্তুর	বস্ত্র।
কফুর	কপূর।
কোম, কোমী	বিকল্প, বিহঙ্গী
নাও	নৌকা।
পাতর	পাথর, প্রস্তর।
হল্দি	হরিদ্রা
দারু হল্দি	দারুহরিদ্রা।
বরণ	বরণ, বর্ণ।
অব্যাহত	অব্যাহতি।
খাতা	ন্যাকড়া।
লৈচ্ছন্	লক্ষণ।
পার, কিনারা	‘পারম্’, সীমা।
পাপি	জল।

শব্দ	অর্থ
ভাতার	ভর্তা।
পাউক্, পাক্	পাক।
গুটি	গোষ্ঠী।
গছা	গোছা, গুচ্ছ।
কাল্লার বই	মুখা, মুতা, মুস্তক।
কাউরা	কাক
কাঠোয়াল	(জলপাই জড়িতে), কাটোল (রঙ্গপুর ও কোচবিহারে) কাটাল।
নেংটি	লেন্ডুটি
তোলা	জীলোকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত বক্ষের উপরিভাগের আবরণ বস্ত্রবিশেষ। উহা মাত্র আল্প পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
পত্‌নি	জীলোকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত কটিবস্ত্রবিশেষ।
আগ্রন্	জীলোকদিগের বক্ষাবরণবস্ত্র। [সংস্কৃত, কুক্ষিকা]
নাড়ী কাটা মাই	খাই, বে জীলোক স্মৃতিকাগারে সস্তানের নাড়ী ছেদ করে।
ভাত ছোরা	অন্নপ্রাশন।
দো-কাপড়া	বালিকার প্রথম রজো- দর্শনে অনুষ্ঠিত সংস্কার-বিশেষ। ইহা অপর হিন্দু জীলোকদিগের দ্বিতীয় সংস্কারের অন্তর্করণ মাত্র। “দো-কাপড়া” উপলক্ষে নব যৌবনার বক্ষে সর্প প্রথম ‘আগ্রন্’ বাঁধিয়া দেওয়া হয়।
ভাতাইত	ভাতাইত (বদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন) ঘটক।
বৈরাতি	আয়তি, আয়ো।
পাণি ছিটা বাপ্	বিবাহে কস্তার পিতার অবর্তমানে যে উদক সেচন করে।
ডাঙ্কুয়া (জী)	কোন বিধবা একা-

শব্দ

অর্থ

কিনী বাস করিলে তাহার গৃহে
বদি কোন পুরুষ ডাঙ্গ বা যষ্টি
হস্তে আগমন করিয়া তাহার
চালাতে তদ্বারা আঘাত করে ও
তদনন্তর সেই বিধবার শূন্যগৃহে
প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহার
পাণিপীড়ন করে, তবে সেই দ্রোকে
ডাঙ্গর স্ত্রী কহে। একরূপ স্ত্রী রাজ-
বংশীগণের মধ্যেও হয়। (ডাঙ্গ বা
যষ্টি দ্বারা প্রাপ্ত ইতি ডাঙ্গরা)

ডাঙ্গ যষ্টি। যষ্টি দ্বারা গ্রহণকার্য্য।
ধোকা (স্ত্রী) কোন বিধবা
স্বৈচ্ছায় কোন পুরুষের বাটীতে
প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ বিবাহিতা
হইলে তাহাকে ধোকা স্ত্রী কহে।
একরূপ স্ত্রী ও রাজবংশীগণের মধ্যে
হয়।

পাছুয়া (স্ত্রী) পশ্চাৎ বিবাহিতা
বিধবা স্ত্রী।

ইহা বিধবা-বিবাহের নামান্তর।

পুত্র ও কন্যাগণের ডাক নামের কিঞ্চিৎ
পরিচয় বিশেষ্য-পরিচ্ছেদে দেওয়া
বিধেয়। উদাহরণ স্বরূপ জলপাত-
গুড়ির স্বনামপত্র রাখকত সর্প-
দেবের কতিপয় কন্যা ও রাণীগণের
ডাক নাম লিখিত হইল—

পুত্রগণের ডাক নাম, যথা—মুগিয়া,
ঘুরঘুত, মুক, ভেলক, শিকার, গুজু হল্য,
ঘুটু, ভোলা ইত্যাদি।

রাজকুমারীগণের ডাকনাম—চেউ
রাজকুমারী, টিরি, লোটকো, গোড়ল,
বেদো, বিলাতি, মেনী, ঘেনী, ইতি, গুদি
ইত্যাদি।

রাণীগণের ডাক নাম—বিলহানি,
বিদেনী, বোদা আই, ইত্যাদি।

শব্দ

অর্থ

কতকগুলি ক্রীড়ার নাম। যথা—
চোপ, চুটকি, ধাপ, কুতি, নেদাইপাটি,
তুতুতুতু, বোড়াখাই, লুকাটুহু, হুহু-
চুকা, ছোঁরে বচাছো, ডমনারে ডুমুনি
ঠনা মাছের ঘুমুনি, কাউয়া, চাপিচুপি,
বিষহরির মত বান্ধা।

বিশেষণ—

ইহাতে বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশে-
ষণের বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ একত্র
সমাবেশ করা গিয়াছে।

(চান্দিয়া) মুড়া	নেড়া (মাথা)
ঘাচ কাটা	ভোতা।
ছনম্	ওরকম, ঐরূপ।
চিলাং ঝাটাং	} জীর্ণ ও ভয়।
তারাং ঝাটাং	

ইহা গৃহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। যথা—
“ঘরটা (বা ঘরকোণা) তারাং ঝাটাং
হইয়াছে” অর্থাৎ গৃহটি জীর্ণ ও ভয়
হইয়াছে।

আরাম্ থারাম্—মাটিতে ছেঁচড়ান ;
যেমন, কাপড়ের কোঁচা। উদাহরণ,—

“ধুতি সে আরাম্ থারাম্”
হালাম্ ব্যাটাম্ লদা চোড়া,
হাঃতাল্ দ্যাং টিলা।

(চুল এলোমেলো বাঁধা হইলে বলা হয়
বা টিলাভাবে ধুতি পড়িলে ঐরূপ বলা
হয়।)

ছাপ্কা চপ্টা বা চাপা
নৌচ, বোঁচা।

কাণে কাপাল্	} 'কাণে কাণ্' (খনা) পরিপূর্ণ, আঠে পুষ্ট।
কাণে কাপালি	

থব্ থব্ চতুর, পারগ।
ভজুদ বার্থ, পণ্ডিত

শব্দ	অর্থ
গর।	গোরা গোর।
ধক্ ধক্	তাড়াতাড়ি, ব্যগ্রগতি।
কিডায়	কি ভুল ?
হাবের ব্যাবের	এলোমেলো।
চাকলা	পদ্ম, মুলো।
বহিরা	বদির।
গঙ্গা	বোবা।
চুটা	নেড়া।
শাখা : প্রশাখা ও পত্রবিহীন বৃক্ষ বুঝাটতে হইলে 'চুটা গাছ' বলা হয়।	
তার সময়	তাহা বাতীত।
ছাপ্‌কা বা ছাপ্‌পা	নীচু।
নীচা	নীচু।
সুদা	সুদ সমেত।
আউলিয়া	এলোমেলো।
হিথান্‌ হুথান্‌	'এখান ওখান,' (হি = এ, হু = ও) এটি উটি।
থারু	সিদ্ধা, সিধা।
দোহার।	খুব সবল বা খুব দুর্বল নয় এরূপ চেহার।
আসলং	অর্থহীন
আসলতে	} মোটেট।
অর্থাতে	
মোটং	
ফাইক	বেশী। বধা - ফাউ, ফাও, অতিরিক্ত।
আথে ব্যালায়	একেবারে।
আথে প্যালায়	এক ধাক্কায়,
হলা সুদার	ঐ গুলি সুদ
(সমেত) 'লা' বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে।	
তামান্‌ লায়	সমস্তগুলি।
কুল্‌টাকে	সমস্তটিকে। = 'বিলকুল।'

শব্দ	অর্থ
গা'দাঘাট,	} এলোমেলো,
আউলা ঝাউলা	
তানে	} ভুল।
বাদে	
ওং	আড়ালে।
বাকুয়া	বাক, ধন্যকাকুতি বংশনির্গত দণ্ডবিশেষ। = নদীতটীক।
ছাকা ছাকা	বাচা ব'ছা
চিহিরা	উচৈঃস্বরে।
আথে হম্কে	} একধমকে, ঠঠাৎ।
আথে হম্কার	

উদাহরণ -

"মুই আথে হম্কে মাটি পাছু,
মিছায় তোকে আসিবার কহু।"

তিওর ছুট।
(তিওর এক প্রকার জাতিবিশেষ।
স্বার্থ ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার হণ্ডির
তিওরকে রাজবংশী ও কোচ
জাতিভুক্ত করিয়াছেন। এক
জাতিভুক্ত হইলে ঐ শব্দ স্বার্থ
প্রযুক্ত হইত না।)

অ্যালাও	এখনও।
অ্যালায়	এখন।
অ্যালায়	সেখানে, তখনই।
যালায়	যখন।
আজিলেকে	আজ পর্য্যন্ত।
ঝল্‌ ঝল্‌	ঝল ঝল্‌, উজ্জল।
তিত্‌	তিক্ত।
মিঠা	মিষ্ট।
কোঠে	কোনস্থানে ?
পাছং	পশ্চাৎ।
সয়	ব্যতীত, বাদে, ছাড়া।

শব্দ	অর্থ
নিন্দালু	নিন্দালু।
এতি, এত্তি	এদিকে, এখানে, এখানে।
কেনে	কেন।
আগং	অগতঃ, অগ্রে।
ষাবং	ষাবৎ।
তাবং	তাবৎ।
শাগ্গির	শীঘ্র।
শুন	শ্রু।
গলা	গলিত।
তাও	তপ্ত, তাপ
ঝট্ (করিয়া)	ঝট্টি, শীঘ্র।
ধীর	ধীর।
তলে তলে	ভিতরে ভিতরে।
ভাঙ্গা	ভগ্ন।
সাদা, লাল, নীল,	বর্ণের নাম।
জর্দা ইত্যাদি	
সদা, সদায়	সদা, সর্বদা।
বিনা	বিহনে।
ফচ্	শীঘ্র, চটপট্।

যথা,—“আমপ্রসাদ ফচ্ করি
গেল” অর্থাৎ রামপ্রসাদ শীঘ্র
চলিয়া গেল।

সোকগুলা সকল।

সর্বনাম—

মুই	আমি।
হামেরা, হামরা	আমরা।
মোন্	আমার।
হামার, হামার্ গুলা	আমাদের।
“গুলা”	গুলি।
মহাবচনাস্থক। গুলা যথা—হামার	
গুলা, তমার গুলা, হামরা	
গুলা, তমরা গুলা, মোক্গুলা,	
মোক্	আমাকে

শব্দ	অর্থ
হামাক্	আমাদিগকে।
(মুই আন	আমি আনি;
হামরা আন	আমরা আনি)
তুই	তুমি।
তমার, তোর	তোমার, তব।
তোক্	তোমাকে।
তমাক্, তম্হাক্	তোমাদিগকে।
উয়ার	সে।
হুয়ার	তাহারা।
উয়ার, ডার	তাহার।
হমার	তাহাদিগের।
উয়াক্	তাহাকে।
হমাক্	তাহাদিগকে।
কায়্	কে,
বেইটা	যেটি, যাহা,
সেইটা, যেইটা	যাহা,
হি	ইদম্ (এ)
হ	অদম্ (ও)।

অব্যয়—

কোচ ও রাজবংশী ভাষায় অল্পত
অব্যয় শব্দ আছে। যথা,—
হোকোর,—পাদপূরণে ব্যবহৃত হয়।
অসভ্যভাষার মধ্যে ছোটক ও বাচক
শব্দের অন্ততানিবন্ধন অব্যয় শব্দ কম।

ক্রিয়া—

গজ্জা	গজ্জন করা।
অনুমান	অনুমান করা।
বান	বন্ধন করা।
জুহরণ	শ্রবণ করা।
লুট্	লুট, লুণ্ঠন করা।
বয়া	বৃণন করা।
রোয়া	রোপণ করা।
উপ্তন্	উৎপন্ন করা।
মখ্ ল	মস্থন করা।

শব্দ	অর্থ
মণিয়া	মণিয়া, ঘন করিয়া।
ছাকা	দোহন করা।
ছাকা	ছাকিয়া ফেলা (ঘসা, জল প্রভৃতি তরল পদার্থ।)
ঠাট্	অঙ্গ ভঙ্গী করা, আকাম করা।
দশিঝুলা	কৌচা ঝুলাইয়া দেওয়া অর্থাৎ কৌচা ছেড়ে দেওয়া। বিশেষ্য দশি প্রচলিত।
পালে, পালেক	পাইল।
পাইছে	পাইয়াছে।
ছেলুনিয়া পড়া	ঝুলিয়া পড়া।
বলা'ল্	বিস্তৃত করিল।
পুছা	জিজ্ঞাসা করা=
	হিন্দী শব্দ। সংস্কৃত প্রচ্ছ।
পুছি	জিজ্ঞাসা করি,=
	পুছিস। যথা—“পথি কি পুছিস মোহা।”
বান্ বাহান্	মস্ত দ্বারা শারীরিক আঘাত করা।
ঝিৎ	চূপ করা।
বাহো মারা	বিল কিম্বা অস্ত্র জলাশয়ে অনেকে একত্র হইয়া মৎস্ত ধরা।
বহেয়া পাঠান	নষ্ট করিয়া ফেলা।
গড়া	শেষ হওয়া (বেলা গড়িয়া যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।)
গড়া	পরিবার জন্ত জলে দেওয়া (যথা, “পাটা গড়াইছিস্”।) বিশেষণ গরা—গোরা, গোর।
থ্যাস্তস্	মারিয়া জড়বৎ করা।
জাঙলা	রোমন্থন করা।
খস্তেয়া ঝাও, হৌকায়া ঝাও—খসাইয়া	দেও, বাহির করিয়া দেও। পাস্ত

শব্দ	অর্থ
ভাত বাহির করা	বিষয়ে এই শব্দ প্রযুক্ত হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে ইহা অধিক প্রচলিত। খস্তেয়া— অলিত করিয়া।
ছাপা	আলি দিয়া জলের গতিরুদ্ধ করিয়া মাছ ধরা।
প্যাংগা ঠাংগা	পেগা ঠেলা, শোক পারিছ শোকে অভিভূত করিলাম। (পারিছ—করিছ)
অ'টুন্	আবদার করা।
ধাড়া	১। কাঁধা শেষ করা ২। মৌজা করা বিশেষণ ‘থার’—সিধা।
দোহর, তাও	তুই ভাঁজ করা, ভাঁজ করা,
(নাছ) নাগেছে	লজ্জা করিতেছে।
চিহিরাণ্	গোড়াগি তুলিয়া দাঁড়ান, এই শব্দ সচরাচর ব্যব- হৃত হয় না।
আইসেক্	এস।
কাউচালি	বারবার ডাকা। যথা—“ছাওয়া ছোটবে গেঙ্গের বেঙ্গের করিয়া মার দে কাউচালি করিয়া ডাক্ছে তুই গুনিম্ মর কেনে?”
ঘুহৎ করিয়া	হঠাৎ, বুণ করিয়া।
ঝাপিয়া ধরা	ঢাকা, লাফাইয়া ধরা।
ঝাপেরা দেওয়া	ঢাকিয়া দেওয়া।
পরশ	স্পর্শ করা, ঢোকা।
ছায়া	ছোঁয়া, স্পর্শ করা।
ঝ্যাটেয়া দেওয়া	ঢুকাইয়া দেওয়া, প্রবেশ করান।
(চাল) জ্বাছে	(চাল) ছাউনি কড়ি- তেছে; আচ্ছাদন করা।

শব্দ অর্থ
ছায়া ফালায়িছে আচ্ছাদন করিয়াছে,
আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে।

গোচরণে গোচরণে, গল্প
চড়াইতে।

জিলিক বা ঝিলিক দেওয়া—বিছাতের মত
ছুতি প্রকাশ করা।

পসিন্ পছন্দ করা।

খিলাবো খাওয়াইব।

নিরিখ্ নিরীকণ করা।

ছাপাইয়া (রাখা) লুকাইয়া (রাখা)।

আনি আনি। যথা—যুই
আনি, আমি আনি।

খাছি, খাইন্ খাইতেছি বা খাইব।

হ'ল্ হইল।

হইছে, হইয়া গেইছে হইয়াছিল।

আকু আসিয়াছি।

আসিল্ আসিল।

(যুই) কঁও (আমি) কহি।

কিনা কেনা, ক্রয় করা।

মোতাইন্ বিশেষরূপে মারিব।

যথা—“বাকুয়া মোতাইন্” বাক-

দারা বিশেষরূপে প্রহার করিব।

গাড়া রোপণ করা।

চান্দা অলুসন্ধান করা।

আইসেন্ আছেন; কিন্তু

‘আসিতেছেন’ অর্থে প্রযুক্ত নহে।

যথা—“তমরা গুলা এতি আইসেন

বাছে” অর্থাৎ তোমরা (সকলে)

এদিকে এস। “ভোঁমরা” (তমরা)

শব্দের সহিত সম্মানসূচক “ন”

এ দেশীয় ভাষায় সর্বদা একত্র

প্রয়োগ করা হয়। বাছে—বাপুছে

শব্দ অর্থ
অর্থাৎ মহাশয়গণ অথবা ওহে!
সম্বোধন পদমাত্র।

মারি মারিয়া।

ধরি ধরিয়া।

দিম্ দিব।

নিম্ লইব।

করিম্ করিব।

নিব্যান্ লইবেন।

উঠা উঠান করা।

ধআ ধোয়া, ধোঁত করি।

পাইছে পাইয়াছে।

বাট বাটা, বণ্টন করা।

পাহরা সস্তরণ করা।

কইবার, কহার কহিবার।

গাঢ় গাড়া।

পাইলে প্রাপ্ত হইলে।

খাওরা খাবন করা।

চাবা চর্বণ করা।

পিষা পেষণ করা।

বিষ্কা বিঁধা, বিচ্ছন।

মাঞ্জা মজ্জন, মাজা।

সসেরা স্ন স্ন করিয়া।

যথা—“সসেরা নিন্দাছে”—নাক

ডাকিয়া ঘুমাইতেছে।

আফা রাঁধা, রন্ধন করা।

ডাপান্ যষ্টিদ্বারা প্রহার করি।

সম্বোধন পদ—

হা এরে মোর হো

হা এরে মোর হি।

গে গো।

বাহে বাপুহে। মহাশয়-

গণ অথবা ওহে! রে, হে।

শ্রীসত্যেন্দ্র বসু।

সিলেট নাগরী

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে মোসলমানী কেতাবগুলির কোনও বিবরণী দেখা যায় না। অথচ সংখ্যার ও কাট্টিতে এই সকল কেতাব যে নেহাৎ কম সে কথা বলা যায় না। মোসলমানী বাঙ্গালা বঙ্গভাষার উর্দু; তবে উর্দু হিন্দী হইতে ভিন্ন অক্ষরে লিখিত, কিন্তু মোসলমানী বাঙ্গালা বঙ্গাক্ষরেই লিখিত। বৃষ্টি এই বিশেষত্বটুকু বজায় থাকিতেছে না, লতাই বোধ হয় সমগ্র মোসলমানী কেতাব ভিন্ন অক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাইব।

পূর্ববঙ্গ মোসলমান প্রধান স্থান; তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রায় পূর্বতম অংশ শ্রীহট্ট-অঞ্চলে মোসলমানের সবিশেষ প্রাধান্য। সুতরাং মোসলমানী বাঙ্গালারও শ্রীহট্ট একটা প্রধান আড্ডা।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে শাহজালাল নামক এক অতিশক্তিশালী মহাপুরুষ আরবদেশের এমন-প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন; ঘটাক্রমে তাঁহাকে দিগ্বিজয়ীর বেশে সৈন্ত-সামন্ত সহ শ্রীহট্টের তদানীন্তন হিন্দুভূপতি গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল; একপ্রকার বিনা রক্তপাতেই শ্রীহট্ট মোসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। শাহজালালের সঙ্গে ৩৬০ জন মোসলমান আউলিয়া আইসেন; উহারা এবং সৈন্ত-সামন্তেরও অনেকে শ্রীহট্টের নানাহানে উপনিবিষ্ট হইয়া বস-বাস করিতে লাগিলেন।

ইহাদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তখনও বোধ হয় আরব্য অক্ষরে হিন্দী ভাষা লিখিত হইয়া উর্দুর সৃষ্টি হয় নাই। তাই এই সকল মোসলমান প্রাধানতঃ হিন্দী-ভাষারই চর্চা করিয়া দেবনাগরাক্ষরে লেখা পড়া করিতেন। তাঁহাদের অল্পকরণে শ্রীহট্টের সাধারণ মোসলমানের মধ্যেও নাগরাক্ষর লক্ষ-প্রসার হইল। কালক্রমে যদিও পশ্চিমাঞ্চলে মোসলমান সমাজে হিন্দী আরব্য অক্ষরে লিখিত হইয়া আরব্য-পারস্ত-ক্ষর বহুল হইয়া উর্দুতে পরিণত হইল, এবং সেই উর্দু ক্রমশঃ সমগ্র মুসলমানাধিকৃত ভারত-বর্ষে প্রসৃত হইয়া শ্রীহট্টেও পৌছিল, তথাপি এই অঞ্চলের মোসলমানেরা নাগরাক্ষর এক-বার পরিভাষা করিল না। তবে এই নাগরাক্ষরের প্রসার অনেকটা ধ্বংস হইল; একদিকে স্থানীয় বঙ্গভাষা অতীতকালে মোসলমানের আলোচ্য আরব্য, পারস্ত ও উর্দু এই উভয় সঙ্ঘটে পড়িয়া নাগরাক্ষর হীনপ্রভ এবং নীর্ণ ও বিকৃত হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অধ্যভাগে ইহার অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছিল যে নিম্নস্তরের মোসলমানদের মধ্যে যাহারা বঙ্গাক্ষর জানিত না তাহারা পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রে মাত্র এই অক্ষরের ব্যবহার করিত। ইহাদের হাতে পড়িয়া দেবনাগরের যে ছর্গতি ঘটয়াছে তাহা অচিরেই দৃষ্ট হইবে।

আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, মৌলী আব্দুল করিম * নামক কঠোর শ্রীহট্টাঙ্গী শিক্ষিত ব্যক্তি কর্তৃক এই বিকৃত নাগরাকর “সিলেট নাগরী” সংজ্ঞা লাভ হইয়া মুদ্রাবদ্ধ হইয়াছে। ইতিপূর্বেই আরব্য-পারস্ত পুস্তকের জ্ঞান, এই অক্ষরে দুই একখানি পুথি নাকি লিখোৎপাদে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রাবদ্ধে ছাপা হওয়ার পর হইতেই যে এই অক্ষরের পুথির বহু প্রচলন হইতেছে, সেই বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্বে এই অক্ষর শ্রীহট্ট সহরের আশে পাশে মাত্র প্রচলিত ছিল। ছাপার পর এইক্ষেণে শ্রীহট্ট জেলার সমগ্র, কাছাড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগাম, ময়মনসিংহ ও ঢাকা অর্থাৎ পদ্মার পূর্বদিকে বঙ্গভূমির সর্বত্র এই অক্ষর মোসমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সিলেট নাগরীতে ৩২টি মাত্র অক্ষর, পাঁচটি স্বর এবং ২৭টি বাঞ্জন। অল্পস্বর এবং ৫টি মাত্র স্বর-চিহ্ন আছে; আকার, একটি জঁকার (ী), একটি উঁকার (ু), একার ও ঐকার।

অক্ষরগুলির আকৃতি স্বতন্ত্র প্রদর্শিত হইল :—[ক চিত্র দ্রষ্টব্য]

অক্ষরগুলির প্রতি অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে যে ‘অ’, ‘ও’, ‘খ’, ‘ছ’, ‘ঝ’, ‘ল’ এবং ‘হ’ এইগুলির আকৃতি নাগরাকর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। স্বর-চিহ্নগুলি ঠিক দেবনাগরের মতই। সমস্ত অক্ষরনামিক বর্ণ মণ্ডো ন এবং স ই আছে। ন ও স এ এক একটি এবং অন্তঃস্থ ‘ব’ টি লোপ পাইয়াছে। অথচ এত কাট-ছাটের মণ্ডো অতিক্রম ‘ড’ একটি নিতান্ত আবশ্যক ভাবে রাখা হইয়াছে; ইহার কাজ ‘ড’ কিংবা ‘র’ দ্বারা অনায়াসে চলিতে পারিত। স্বরবর্ণেই সংক্ষেপটা কিছু বেশী; অ, ঈ, উ, ঋ, ঌ, ঐ এই অত্যাশ্রয়ক স্বরগুলি বর্জিত হইয়াছে।

সংযুক্ত বর্ণের তালিকা স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইল :—[‘খ’ চিহ্নিত চিত্র দ্রষ্টব্য]

মাত্র ১৬টি সংযুক্ত বর্ণ রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি বঙ্গ বা সংস্কৃত ভাষায় কোণাও পাওয়া যাইবে না; ইহা আলেক্স-ল্যাম্ আল, কেবল ‘আল্লা’ শব্দটি লিখিতেই ইহার প্রয়োজন দেখা যায়। বাকী ১৫টি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে সাধারণতঃ আরবী বা পারসী শব্দে সচরাচর যে সকল সংযুক্ত-বর্ণের প্রয়োগ আছে, তাহাই মাত্র রাখা হইয়াছে। এই স্থলেই সিলেট নাগরীর সংস্কারকের + কৃতিত্ব কৌশলের সমধিক পরিচয়

* ইনি আরব, মিসর ও ইউরোপের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশে আসিয়া নিজ সমাজের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় নৈয়াং নদীগর্ভে আহাজ হইতে নিপতিত হইয়া অকালে এই কণ্ঠ জীবনের অবসান হইয়াছে।

+ প্রাগুক্ত মৌলী আব্দুল করিম যখন এই অক্ষরগুলির টাইপ করেন, তখন তিনি বর্ণমালার এবং সংযুক্ত বর্ণের ক্রমেকটা সংস্কার সাধন করেন। ফলতঃ ইহার হস্তক্ষেপের পূর্বে এই নাগরীর যে কি অবস্থা ছিল তাহা নির্ণয় করা গরুটিন।

ক-খ চিত্র

क

ন	হ	ক	ট	ক	চ
আ	ই	খ	এ	ঘ	ড
মা	দু	ধ	ব্র	ল	ব
কু	খ	জ	য	ন	চ
হু	ল	প	কু	চ	ত
ত	প	ন	ট	ড	দ
ত	ত	ব	দ	প	ন
ক	ব	দ	ম	ন	ল
ল	হ	হ	য	ই	ত
ম			।		

५

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ
জ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন	প
ফ	ব	ভ	ষ	ষ	ম
য	র	ল	শ	স	হ
ঝ	ঞ	ঝ	য়	৞	ৠ
ৡ	ৢ	ৣ	৤	৥	০

१. नम्रान देहाए० देह जाती० ने नम्रान नुमा०
 २. नम्रान देहाए० देह जाती० । नम्रान ॥
 ३. नम्रान देहाए० देह जाती० । नम्रान ॥
 ४. नम्रान देहाए० देह जाती० । नम्रान ॥
 ५. नम्रान देहाए० देह जाती० । नम्रान ॥
 ६. नम्रान देहाए० देह जाती० । नम्रान ॥
 ७. नम्रान देहाए० देह जाती० । नम्रान ॥
 ८. नम्रान देहाए० देह जाती० । नम्रान ॥
 ९. नम्रान देहाए० देह जाती० । नम्रान ॥
 १०. नम्रान देहाए० देह जाती० । नम्रान ॥

[illegible]

੧ ਸੁਨਦ ਸੁਮੀਨ ਨਾਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮਾਨ ॥
 ੨ ਨਾਮਨੀ ਦਰੇਸ਼ ਨਨ ਨੁਮ ਵੇਸੁਮਾਨ ॥
 ੩ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਮੇਨ ਮੀਨੇ ਸੀਮੀਨੇ ਨਾਮਾਨ ॥
 ੪ ਸਦੇਸ਼ ਸੇਤਾਥ ਨਾਨਕ ਮੁਕੀ ਨਾਮੀ ਸਾਧੇ ॥
 ੫ ਸਦਨ ਦਰੀਸ਼ ਪੈਦਾ ਸੀਨੇਕ ਨਾਮਨੀ ॥
 ੬ ਸੀਮੇ ਸਥ ਨੁਮੇ ਬਠ ਸੇਦੇਨਤ ਸਨੀ ॥
 ੭ ਸੇਦੀਨ ਪੈਸਤ ਨਮੀ ਨਾਮੀਨੁ ਦੇਵੇਨੇ ॥
 ੮ ਸਦੇਸ਼ ਸੇਤਾਥ ਸੁਣੇ ਨਾਮਾਨ ਸੁਣੇ ਨਾਨੇ ॥

੯ ਸੁਮੀਨੇਨ ਸੀਨੇ ਕਰੇ ਸੇਦੀਨੁ ਆਦੇਸ਼ ॥
 ੧੦ ਨਾਮੇਨ ਨਾਮੀਨੀ ਨਨ ਸਨੀਨ ਸੁਮੀਨ ॥
 ੧੧ ਸੇਦੀਨੁ ਸਨਾਥ ਸਥ ਸਨੀ ਜੁਮਾ ਜੁਮਾ ॥
 ੧੨ ਸਿਧ ਸੀਨੇ ਸੀਮੀ ਵੀਰੇ ਕਮੀ ਸਨ ਮੁਮਾ ॥
 ੧੩ ਸਾਮਾਨੁ ਸਨਾਥ ਸੀਨੁ ਕੀਰੇ ਨਾਮਾਨ ॥
 ੧੪ ਸਾਮਾਨੁ ਕਾਨਕ ਕਾਨਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਮਾਨ ॥
 ੧੫ ਸਾਮਾਨੁ ਸਨਾਥ ਸੇਦੇ ਨਾਮੇ ਰੀਧੇ ਸੀਮੇ ॥
 ੧੬ ਉਦਯਾਨੁ ਸਨੀਨੇ ਸੀਥਾ ਸਾਥ ਨਾਮੇ ਨਾਮੇ ॥

੧੭ ਸੁਨਦੇਸ਼ ਬੇਨਾਨ ਸਨ ਸੇਦੀ ਸੀਨੁ ਸੀਤ ॥
 ੧੮ ਸੁਨਦੁਨਾਨ ਨਾਨਕ ਸਥੀ ਮੁਕੀ ਸੁਦਰ ਵੀਤ ॥
 ੧੯ ਨਾਨਕ ਸਨ ਨਾਨਕ ਸਨੀ ਸਨੀਨੁ ਨਾਮਾਨ ॥
 ੨੦ ਸੀਨਕੀ ਨਾਮਨੀ ਸੁਨੀ ਸਦੇਸ਼ ਸੇਤਾਥ ਨਾਮ ॥
 ੨੧ ਬਸੁਤ ਸੇਦੇਨੇ ਪੈਦਾ ਸੁਮੀਨ ਸਨੀਨ ॥
 ੨੨ ਕੀਜ ਸਨਵੇਨੇ ਕਮੀ ਮੁਮਾਥੇ ਨਾਮੀਨ ॥
 ੨੩ ਸਥੀਨ ਸੁਮੀਨ ਸਥ ਸਾਨ ਸਨੀਨੇ ॥
 ੨੪ ਸੇਦੇਨਤ ਸਾਥ ਸਥ ਮੁਕੀ ਸੁਣੇ ਸੇਦੇ ॥
 ੨੫ ਨਾਮਾ ਸਨੀ ਸੁਮੀਨਾਨੇ ਸੇਦੇਨ ਸਨੀਨ ॥
 ੨੬ ਕੇਸ ਸੁਨ ਸੇਵਾ ਸੇਨਾ ਨਾਮੇਨ ਨਾਮੀਨ ॥
 ੨੭ ਸੁਨਦੁਨ ਨਾਨਕੁ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕੇਨ ਨਾਮ ॥
 ੨੮ ਸੀਨਕ ਸਾਨਕ ਕੀਰੇ ਨਾਮੀਨੁ ਸੁਮਾਨ ॥
 ੨੯ ਸਾਨਕ ਜੁਥੇ ਸਾਮੀ ਪੈਰੇ ਜੁਮਾਥੇ ਸਾਨਾਨ ॥
 ੩੦ ਸੁਮੀਨੇਨ ਸੇਦੇਨੇ ਸਾਨਾਨ ਸੁਮਾਨ ॥

পাওয়া যায়। বাঙ্গালার সংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইবে; এইগুলি শিক্ষা করাই বঙ্গভাষাধ্যায়ীর পক্ষে বড় স্বকঠিন কাজ। ইহার সংখ্যা মাত্র ১৫তে পরিণত হওয়ায় এই নাগরী সাধারণ মোসলমানের পক্ষে অগম হইয়াছে, তাই ইহার আদর দিন দিন বাড়িতেছে। 'জ'তে 'ঞ' এর কাণ্ড 'ন' দ্বারা করা হইয়াছে এবং 'স্চ' স্থলে 'শ' এর কাজ 'স' দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা এবং মুষ্টিমেয় যুক্তাক্ষর লইয়া কাজ করিতে সম্পন্ন হয় তাহা প্রদর্শন নিমিত্তে নিম্নে দুইটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রথমটি দৈ-খোর উপনামক জনৈক মোসলমান সাধুর * গীত; দ্বিতীয়টি 'সিলেট নাগরীর পহেলা কেতা' প্রকাশকের বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হইতে সূচিত হইবে, মোসলমান সাধারণের এই নাগরীর পৃথি পড়িবার ক্ষমতা এবং প্রকাশকদেরই বা ইহার প্রচারকল্পে কত আগ্রহ।

দৈ-খোরার গীত।

[গ চিহ্নিত চিত্র দ্রষ্টব্য—এক একটি লাইনের নিম্নে ১ক, ১খ, ২ক, ২খ, এইরূপ দুই দুইটি লাইন চিহ্নিত করা হইল, ১ক-তে মূলের বঙ্গাক্ষরে যথাযথ প্রতিলিপি; ১খ-তে সাধারণ বাঙ্গালার পরিবর্তন।]

১।

১ক। আমার হেলাএ হেলাএ গেল জাতী রে পাড়ার লুক।

১খ। আমার হেলার হেলার গেল জাতি রে পাড়ার লোক ॥

২।

২ক। ও আমার হেলাএ হেলাএ গেল জাতী। ধুআ ॥

২খ। ও আমার হেলার হেলার গেল জাতি। ধুয়া ॥

৩।

৩ক। সীন্ত-কালে হইল বিয়া না ভজিগাম পরাণ দীআ।

৩খ। শিশুকালে হইল বিয়া না ভজিগাম পাণ দিয়া।

* ইহার প্রকৃত নাম জানা যায় না। ইনি সম্ভবতঃ "সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া "দৈ-খোরা" নামে খিহটু অঙ্কে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সাধু রামপ্রসাদের স্থায় সাধন ভক্তনের সঙ্গে সঙ্গীতেরও চর্চা করিতেন। ইহার স্বর অতিশয় মধুর ছিল। জনসাধারণ কি মুসলমান কি হিন্দু—ইহার স্নগ্ধ স্বরে এবং সঙ্গীতের সরল ভাষা ও নিগূঢ় ভাবে আকৃষ্ট হইয়া ত্রুটিত অনেক গান কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। বহুদিন হইল ইহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, কিন্তু আজিও খিহটের পূর্বোক্তরাকালে সাধারণ লোকেরা আগ্রহসহকারে ইহার গান করিয়া থাকে। এই মহাত্মার জন্মস্থান নোয়াখালি ছিল বলিয়া প্রবাদ; কিন্তু সংসার ছাড়িয়া তিনি জীবনের শেষাংশ খিহট নগর ও তন্নিকটস্থ স্থানেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন; কেন না খিহট ভূমি শাহজালাল কর্তৃক গরম পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে মোসলমানের নিকট এক পুণ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

৪।

৪ক। জুবত কালে হইল ওইনর সাথা।

৪খ। যুবতী কালে হইল (হইলু) অন্নের সাথী।

৫।

৫ক। জউবন গাইয়া গেল সংগী সব পলাইল।

৫খ। যৌবন গৈয়া গেল সঙ্গী সব পলাইল।

৬।

৬ক। ওবে বল কি হালে বসতী * রে।

৬খ। হবে (?) বল কি হালে বসতি ॥ রে।

৭।

৭ক। সন্ময় হইলা কঠুর—ভাসুর হইলা নীসঠুর।

৭খ। ষষ্ঠুর হইলা কঠোর ভাসুর হইলা নিষ্ঠুর।

৮।

৮ক। দেওর হইলা বাউর মতি।

৮খ। দেবর হইলা বায়ুর (পাগলের) মতি।

৯।

৯ক। ভবের জন্জালে ওতী সাস্ত্রীএ শুরজে নীতী।

৯খ। ভবের জঞ্জালে অতি শান্ত্রীয়ে গর্জে নিতি।

১০।

১০ক। কাল ননদীএ করেন দুরগতী * রে।

১০খ। কাল ননদীয়ে করেন দুর্গতি ॥ রে।

১১।

১১ক। ঈশট ভিতর জন ভাই বন্ধু গণ।

১১খ। ইষ্ট ভিতর জন ভাই বন্ধু গণ।

১২।

১২ক। এই সব সমপদর সাতী।

১২খ। এই সব সম্পদের সাথী।

১৩।

১৩ক। ধন মান হারাইলু হুখে আসী পরবেদীলু।

১৩খ। ধন মান হারাইলু হুখে আসি প্রবেশিলু।

১৪।

১৪ক। সংকট কালে কুণাএ রইলাএ গীআতী *

১৪খ। সঙ্কট কালে কোণায় রইলা জ্ঞাতি ॥

১৫।

১৫ক। দই খুরা পাগলে বলে জনম গেল মর বীকলে।

১৫খ। দৈ-খোরা পাগলে বলে জনম গেল মোর বিফলে।

১৬।

১৬ক। বীচারেতে না হইলাম সতী।

১৬খ। বিচারেতে না হইলাম সতী।

১৭।

১৭ক। খেমাইর ঘরে দীআ বাতী চিন্তা কর সঙ্গের সাতী।

১৭খ। ক্ষমার ঘরে দিয়া বাতি চিন্তা কর সঙ্গের সাথী।

১৮।

১৮ক। একমনে না ভজিলাম পতী * রে।

১৮খ। একমনে না ভজিলাম পতি ॥ রে।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

[য ও উ চিহ্নিত চিত্র দ্রষ্টব্য]

১।

১ ক। সুনহ মুমীন ভাই আরজ আমার।

১ খ। সুনহ মোমিন (বিশ্বাসী) ভাই আরজ (নিবেদন) আমার।

২।

২ ক। নাগরী ইলিম তার লুক বেস্তমার *

২ খ। নাগরী ইলিম (বিজ্ঞা) তারে (জন্ত) লোক বেস্তমার (অসংখ্য)

৩।

৩ ক। খাহেস রাথেন দীলে শিখিতে তাহাএ ॥

৩ খ। খাহেশ (ইচ্ছা) রাথেন দেলে (চিন্তে) শিখিতে তাহায়।

৪।

৪ ক। পহেলা কেতাব তার খুজী নাহি পাএ *

৪ খ। (প্রথম) কেতাব (পুথি) তার খুজী নাহি পায় ॥

৫।

৫ ক। ছহল ইলীম এরা ছীলেট নাগরী ॥

৫ খ। সহল (সোজা) ইলিম ইহা সিলেট নাগরী।

৬।

৬ ক। সীথে সব লুকে বড় মেহেনত করী *

৬ খ। শিথে সব লোকে বড় মেহনৎ (শ্রম) করি ॥

৭।

৭ ক। দেখীআ এমত অমী ভাবীহু দেলেতে ॥

৭ খ। দেখিরা এমত আমি ভাবিহু দেলেতে ।

৮।

৮ ক। পহেলা কেতাব হগে আছান হবে তাতে *

৮ খ। পহেলা কেতাব হ'লে আনান (সহজ) হবে তা'তে ॥

৯।

৯ ক। মুমীনের দীলে জবে দেখীহু থাহেস্ ।

৯ খ। মোমিনের দিলে যবে দেখিহু থাহেস্ ।

১০।

১০ ক। তাদের আছানী তর করীআ কুগাস্ *

১০ খ। তাদের আগনি তর করিরা কুশিশ্ (চেষ্টা) ॥

১১।

১১ ক। লেখীহু হরফ সব করী জুনা জুনা ॥

১১ খ। লিখিহু হরফ্ (অক্ষর) সব করি জুনা (পূণক্) জুনা ।

১২।

১২ ক। এক দিনে সীথী নীবে জদী করে খুদা *

১২ খ। একদিনে শিথি নীবে যদি করে খোদা (ঈশ্বর) ॥

১৩।

১৩ ক। বাংলা হরফ দীহু নীচেতে তাহার ॥

১৩ খ। বাংলা হরফ্ দিহু নীচেতে তাহার ।

১৪।

১৪ ক। বাংলা জানন জারা খাতের তারার *

১৪ খ। বাংলা জানেন যারা খাতের (অক্ষরোপ) তাঁদের ॥

১৫।

১৫ ক। বাংলা হরফ দেখে আপে লীবে সীথে ॥

১৫ খ। বাংলা হরফ্ দেখে আপে (নিজে) ল'বে শিথে ।

১৬।

১৬ ক। উছভাদ ধরীতে কীবা কাজ আছে তাকে *

১৬ খ। ওস্তাদ (শিক্ষক) ধরিতে কিবা কাজ আছে তাঁকে ॥

১৭।

১৭ ক। হরফের বএআন পর লেখী দীঘু গীত ॥

১৭ খ। হরফের বয়ান (বর্ণনা) পর লিখি দিঘু গীত ।

১৮।

১৮ ক। দইধুরার রাগ পড়ী খুশী হইব চীত *

১৮ খ। দৈধোরার রাগ (গীত) পড়ি খুশি (আনন্দিত) হবে চিত্ত ॥

১৯।

১৯ ক। তারপর আরজ করী করীহু তামাম ।

১৯ খ। তারপর আরজ করি করিহু তামাম (শেষ) ।

২০।

২০ ক। ছোলটী নাগরী পুখি পহেলা কেতাব নাম *

২০ খ। সিলেট নাগরী পুখি পহেলা কেতাব নাম ॥

২১।

২১ ক। বহুত মেহেনতে এহা কুনীস করিয়া ॥

২১ খ। বহু মেহেনতে ইহা কুশিশ করিয়া ।

২২।

২২ ক। নীজ থরচেতে ছাপী খুদাকে ভাবীয়া *

২২ খ। নিজ থরচেতে ছাপি খোদাকে ভাবিয়া ॥

২৩।

২৩ ক। পড়ীয়া মুমীন সবে কদর করিলে ॥

২৩ খ। পড়িয়া মোমিন সবে কদর (আদর) করিলে ।

২৪।

২৪ ক। মেহেনত সফল হবে খুশী হব দেলে *

২৪ খ। মেহেনৎ সফল হবে খুশি হব দেলে ॥

২৫।

২৫ ক। আশা করি মুমীনানে মেহের করীয়া ॥

২৫ খ। আশা করি মোমিনগণে মেহের (অল্পগ্রহ) করিয়া ।

২৬।

২৬ ক। নেক ছায়া দীবা মেরা আখের লাগীয়া

২৬ খ। নেক (শুভ) দুরা (আশীর্বাদ) দিবেন মেরা (আমার) আখের (পরকাল)
লাগিয়া ।

২৭।

২৭ ক। মহম্মদ আবদুল লতীফ ওধমের নাম ॥

২৭ খ। মোহম্মদ আব্দুল লোতিফ্ অধমের নাম ।

২৮।

২৮ ক। ছীলট মহর বীচে রাখীছ মুকাম *

২৮ খ। সিলেট মহর (নগর) বিচে (মধ্যে) রাখীছ মোকাম (আবাস) ট

২৯।

২৯ ক। হাত জুড়ে কহী এবে জুনাবে সবার।

২৯ খ। হাত জুড়ি কহি এবে জোনাবে (সাক্ষাৎ) সবার।

৩০।

৩০ ক। মুমীনের খেদমতে ছেলাম হাজার *

৩০ খ। মোমিনের খেদমতে (সকালে) সালাম (অভিবাদন) হাজার।

এবদ্ধয়র হইতে প্রতীত হইবে যে স্বরের প্রধান অ-কারের কার্য 'ও' দ্বারা সাধিত হইতেছে। ওকারের স্বরচিহ্ন (০) না থাকিলেও উহার কার্য উকার দ্বারা (যথা লোকের পরিবর্তে লুক) নিম্পন্ন হয়। ঐকার থাকিলেও সচরাচর ইহার স্থানে 'অই' এবং ওকারের স্থানে 'অউ' ব্যবহৃত হয়। ফলকথা আ-ব্য পারন্তে যদি জের-জবর-পেশ এই তিনটি মাত্র স্বরচিহ্ন দ্বারা কাজ চলিতে পারে, যদি ঐ তিনটিরই মাত্র সহায়তায় হিন্দীকে উদ্ভূত পরিণত করা যাইতে পারে, তবে এইস্থলেও কাজ না চলিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। ব্যঞ্জনবর্ণ সম্বন্ধেও ঐ কথা। আরব্য বর্ণমালাকে মূল্যায়ন করিয়া দুই চারিটি মাত্র অতিরিক্ত (যথা পারন্ত—চ, গ, প এবং উর্দু ট, ড) বর্ণ নাক্তা যুক্তিয়া তৈয়ার করিয়া যদি তৎসাম্যে হিন্দীভাষা লিখিতে পারা যায়, তবে এই স্বল্প-ব্যঞ্জনের সহায়তায় বাঙ্গালাভাষা লিখিতে বিশেষ অসুবিধা হইবার কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ ইহাতে মাত্র মোসলমানী বাঙ্গালা লিখিবারই প্রয়াস হইতেছে; এই বাঙ্গালীর সচরাচর আরব্য-পারন্তা শব্দেরই বহুল ব্যবহার দেখা যায়, সংস্কৃত শব্দ অতি কমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত শব্দের বিরলতায় দুটি বিষয়ে অসুবিধা হইতেছে এক বর্ণান্তর হইলেও তেমনি বাধে না, অপর সংস্কৃতবর্ণের অন্তর্ভুক্ত কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

একটা অভাব কিছু বড়ই অনুভূত হয়; যদি হসন্ত চিহ্নটি পরিগৃহীত হইত, তাহাহইলে "সম্পদ" যে "সম্পন্ন" তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইত। এই নাগরীতে পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ ইতিপূর্বে কেবল শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্যের চিংপুর রোডস্থিত জেনারেল শ্রিষ্টিং প্রেসেই হইত। সম্প্রতি আরও দুইটি প্রেস স্থাপিত হইয়াছে; এক হামিদী প্রেস শিরাদিন্দহ (কলিকাতা); অপর ইসলামীয়া প্রেস শ্রীহট্ট। ইতিপূর্বে দুই চারিখানি মাত্র মোসলমানী কেতাব এই অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল; সম্প্রতি বহু পুস্তক এই হরকে মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রকাশকদের সংকল্প এই যে যত মোসলমানী গুণি বঙ্গাক্ষরে আছে তাহা এই অক্ষরে গুনমুদ্রিত করিতে হইবে, নূতন পুস্তকের ত কথাই নাই।

* সম্প্রতি এই হরকের কেতাব বাহারী পড়ে উহার প্রায়শঃ বঙ্গভাষান্ভিত নিম্নশ্রেণীর

মে'সলমান। যথা—কৃষক, মৎস্যারী, নৌকার মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি। যদিও ইহারা এই অক্ষরে লিখিত পুস্তক পড়িতে পারে এবং এই অক্ষরে চিঠি-পত্র লিখে, তথাপি আদম-তমারিতে (সেনসসে) ইহারা “লিখা পড়া জানেন না” এই শ্রেণীতেই ভুক্ত হইয়াছে। এখনও দলিলাদি কাগজ পত্রে এই অক্ষর ব্যবহৃত হয় না এবং সরকারি চালান বা সমন প্রভৃতিতে এই অক্ষরের দস্তখত গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু ইহারা এই হীন অবস্থা বোধ হয় অধি ৮ দিন আর থাকিতেছে না। পূর্বেই বলিয়াছি চট্টগ্রাম ও ঢাকা পর্যন্ত ইতিমধ্যেই ইহার প্রচার হইয়াছে। শুনিতেছি এই অক্ষরে শ্রীহট্টসহর হইতে নাকি একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারেরও প্রস্তাব চলিতেছে।

এই অক্ষরের পুস্তকাদির প্রচার এবং উন্নতিতে বঙ্গভাষার শুভাভিযায়িবর্গের কোনও ভয়ের কারণ আছে কিনা এই বিষয়ে কোনও কিছু বলিতে নানা কারণে আমি অনধিকারী। যাহারা অধিকারী তাহারা অবশ্যই বিষয়টা ভাবিয়া দেখিবেন।

যাহারা এক-লিপি-প্রচার-কল্পে বঙ্গপরিষদের হট্টস বঙ্গভাষা দেবনাগরীকরে লিখিতে চান তাহারা এট সিলেট-নাগরীর সংবাদে আনন্নিত হইবেন কি বিষাদিত হইবেন, জাতি না। আনন্দের কারণ, স্থানবিশেষে বাঙ্গালীভাষা কতকটা নাগরীকরে লিখিত হইতেছে; আবার বিষাদের কারণ এই যে একই বঙ্গভাষা বোধ হয় অধুনা ভবিষ্যতে ছইটি বিভিন্ন আকৃতিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে।

আবার যাহারা বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কারপ্রয়াণী তাহাদের নিকট সিলেটনাগরী কাহিনী কি ভাবে পরিগৃহীত হইবে বলিতে পারি না। তাহারা বোধ হয় স্বীয় মত তেমন আনুষ্ঠানিকতা সহকারে পরিপোষণ করেন না, নচেৎ “দেবনাগরী” পত্রিকার জায় তাহাদেরও কথা ও কাজের সমন্বয়শূচক কোনও কিছু দেখিতে পাইতাম। যাহা হউক, বঙ্গের এক প্রান্তে প্রচারান্তরে তাহাদের মত-পরিপোষক কাজ হইতেছে দেখিয়া তাহারাও খুঁট তটতে পারেন। তবে এই সংস্কারিত বর্ণমালা বাঙ্গালা অক্ষরে হইলেই বোধ হয় তাহাদের সম্যক তৃপ্তি হইত। আমি কিন্তু কোনও প্রকারেই বর্ণমালার কাট ছাট দেখিতে প্রস্তুত নহি; এই বর্ণমালাই আমাদিগকে—হিন্দী ভাষা, মরাঠী ভাষা, বঙ্গভাষা প্রভৃতি আৰ্য-সম্মানদিগকে—একতার সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—তা সেই সূত্র যতই ফাঁগ হউক না কেন; এবং কোনও দিন আমরা সকলে এক হইলেও হইতে পারি, এই জগৎ আশাটুকুও দিতেছে।

বঙ্গভাষার প্রচার অনেক কমিয়াছে; ইতিপূর্বে আসাম উপত্যকার বঙ্গভাষাট পণ্ডাশালায় পর্যন্ত অধীত হইত; এইক্ষেণে এক গোয়ালপাড়া ব্যতীত আসামের সর্বত্র আসমীয়া ভাষার অধিকার হইয়াছে। পূর্বে গারোখাসি কাছাড়ী মণিপুরী প্রভৃতি পার্বত্য জাতীয়েরা বাঙ্গালা শিখিত এবং এখন উহাদের আপন ভাষায় কোনও পুস্তক লিখিত হইত, তখন বঙ্গাক্ষরেরই ব্যবহার হইত। এইক্ষেণে কেবল যে বাঙ্গালা ভাষা উহাদের নিকট

হইতে দূরীভূত হইয়াছে, এমন নহে, উহাদের বর্ণমালাও বাঙ্গালার পরিবর্তে ইংরেজী হইয়াছে।* তাই-ভয় হয়, বাঙ্গালার ভাষা কপালে বৃষ্টি বিধাতা আরও কিছু অন্তর্ভোগি লিখিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা ।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রাচীন কবি

১—ডাক

ডাক মহাপুরুষ ছিলেন। এই মহাপুরুষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু ইচ্ছা হইলে কি হয়, ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন কোথায়? শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে লিখিয়াছেন, “তাঁহাদের (ডাক ও খনার) জীবনের উদয়-অস্ত পৰ্ব্বতপ্রমাণ কুসংস্কারের দ্বারা আবৃত, আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে পারিলাম না। * * * * * হয়ত প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অজ্ঞাতসারে উহাদের (বচনরাশির) রচনার সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।” তাঁহার ভ্রায় প্রাচীন সাহিত্যসেবী পণ্ডিতই যখন ডাকের অস্তিত্বে সন্দেহান, তখন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় কোথায়? বাহা হউক এই সুদূর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ডাকের বিষয় কিছু জানা যায় কি না তাহার অন্বেষণে রত হইয়া বাহা কিছু পাইয়াছি, তাহাই নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

“একদিন ডাক জন্ম লভিলা ।

ভূমিতে পরিয়া মনে গুণিলা ॥

দেখে অন্ধকার প্রদীপ নাই।

চক্ষু-টের করি মাবক চাই ॥ * * *

হেন দেখি পাছে মাতিলা ডাক ॥

গোবাতী রাখিয়া চা পুতাক ॥†

ডাক জন্ম মাত্রই অমর-বচনে সকলকে ভুট্ট করিতে লাগিল। মহাপুরুষ ভিন্ন জন্ম

* একবার কোনও সাহেব সিভিলিয়ান বাঙ্গালা ভাষাটি ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার জন্ত উদ্ভম করিয়াছিলেন তৎসঙ্গে অনেক শাস্ত্রীও জুটিয়াছিলেন, তাঁহারা “দ্রুর্গেশনন্দিনী” ইংরেজী অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সেই খেলাটো সত্তরই চাপা পড়িয়া যায়।

† গুণিলা—ভাবিলা।

টের—টেরা।

মাবক—ব=উ।

চাই—দেখি।

পাছে—পারে।

মাতিলা—ডাকিল।

চা—দেখ।

মাত্র কাহারও কথা নির্গত হয় না। পুরুষ-প্রধান কৃষক জন্ম মাত্রই বলিয়াছিলেন “আনাকে যশোদা অঙ্গে রাখিয়া এস।” ডাকও জন্মমাত্র বলিয়াছিলেন “পো এড়িয়া পোয়াতি রাখ।” ডাকের মৃত্যুও অকস্মাৎ ঘটয়াছিল।

“ডাক মরে আপোন বৃদ্ধি।

অপঘাত মৃত্যুর তেরাত্তিত শুদ্ধি ॥”

ডাক জীবিত থাকিলে ব্রাহ্মণ ও গণকদিগের জীবিকা অর্জনের অন্তরায় হইবে, এই চিন্তা করিয়া সকলে একত্র হইয়া ডাককে ব্রহ্মপুত্রে ডুবাইয়া মারিয়াছিল।

“হীথাকে যদি ডাক ভাবিলা মনত।

আমার জিহ্বাকা সবে গুছিব তাবত ॥

ডাকক মারহো সবে স্তান সময়ত।

লেহি ডঙ্গরা ডাকর গাঁও।

তিনি-শ পথুরির তিনি-শ পাও ॥”

প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের তীর্থ বরণেটা হইতে ৭ মাইল দূরে বর্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট পল্লী মনদিয়ার সন্নিকট লেহি-ডঙ্গরা নামে গ্রামে ছিল। এই গ্রামে ডাকের জন্ম। প্রবাদ আছে “ডাকের পিতার ৬টা সহোদর ছিল। এই সহোদরদিগের প্রত্যেকেরই সন্তানাদি হইয়াছিল। কিন্তু ডাকের পিতার কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় ডাকের ঠাকুরমা বড়ই দুঃখ করিতেন। সহসা একদিন সন্ধ্যার সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকের ঠাকুরমা ডাকের মাঝে সন্ন্যাসীর সেবা করিতে নিয়োগ করেন এবং বলেন দেখ মা তোমার সন্তানাদি নাই, তুমি সন্ন্যাসীর সেবা উত্তমরূপে করিবে যেন একটা পুত্র লাভ করিতে পার। পরদিন সন্ন্যাসী ডাকের মারের সেবায় তুষ্ট হইয়া বলিয়া যান, তোমার গর্ভে একটা পুত্র হইবে। এই পুত্রই ডাক।”

“সকলে শিশুক মাতি আনিল গণক।

রাখিব নোবারি ডাক আসিলা মণক ॥

ব্রহ্মপুত্রতীরে আহি বাঙ্কিলন্ত আরি।

সকলে শিশুর লগে দিলে জাপ মারি।

দেখে শিশুসব জাপ মারিলন্ত ডাক।

হেছা মারি ধরিলন্ত কেহো নেদে হাক ॥

মাজক লাগিলা সবে দিলে মারি ঢকা।

* * * *

উত্তম ব্রাহ্মণ* ঘরে জনম ধরিল।

এ দিন এক ছপুরেতে শাক্তক কহিলা ॥

* ডাক-গোয়ালকে কোন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদে বরণ করিতে পরাধুখ হন নাই।

ইহা চক্ষু সূর্য্য কোন অদি-আছে দেব ।

কিবা তাহারে সে মায়া না জানিলে কেব ।

সকল প্রাণীয়ে সিতো অদ্ভুত মানিয়া ।

অহিংসক ডাক শিশু পেলাইলে মারিয়া ৷”

ডাকের জীবন ঘোর অন্ধকারাকৃত হইলেও উক্ত মহাপুরুষের অন্তিম সন্ধিধান হইতে আমাদের শক্তি নাট, ঐ সমুদয় বর্ণনা একেবারে কল্পনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বলিতেও প্রযুক্তি হয় না। যখন দেখি ডাকপুরুষের বচনে, ডাকচরিত্রে, ও ডাক ভণিতায় ডাকগোয়াল ভণিতা দিতেছে,—

“ওলাহ গৈ নাহে সকালে ।

ছুটা জী বোলে ডাক গুয়ালে ॥

সোদ্রে কাঁটা কুটায় রাখে ।

ষড়কাট বর্ষাকে বাড়ে ॥

ছুট ভাষে ডাক গোয়ালে ।

এ গৃহিণী ঘর না টলে ॥”

এখন কেমন করিয়া বলিব ডাক গোয়ালের অন্তিম ছিল না।

২—শ্রীধর কন্দলী

কবি শ্রীধর কন্দলী কবি অনন্ত কন্দলীর পরবর্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীধরের কোন বিশেষ বিবরণ এখনো জানিতে পারি নাই। ইহার এক খানি পুঁথি পাইয়াছি, ইহাতে ১৮০টি পদ আছে। ইহা পাঠে জানা যায় ইনি বৈষ্ণব ছিলেন এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বৈষ্ণব সাহিত্যের এক জন কবি ছিলেন। এই কবি শব্দর প্রভুতির পরবর্তী। ইহার রচিত কয়েক খানি পুঁথি আছে, সংগ্রহ করিতে পারিলে যথাসময়ে পাঠকদিগের সমুখ উপস্থিত করিব। সম্প্রতি প্রাপ্ত পুঁথি খানির নাম ‘ঘুনছাচরিত’। ইহা হইতে বোন কোন অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

নমো নিরাকার জগত আধার

ভক্তর দেখা বিলাই ১।

আজোরে পিজুরে ২ শকত নলরেও

তোয়ার কুপা বিনাই ৩ ॥

নমো কুপায়স ছইয়োক ৪ সদয়

নাষহয়োক ৫ হুথ ভয় ।

১ বিলাই—দুঃখ ।

২ আজোরে পিজুরে—টানাটানি করে ।

৩ নলরে—না চলে—নড়ে না ।

৪ বিনাই—বিনা ।

৫ ছইয়োক—হও ।

৬ নাষহয়োক—নাশ কর ।

এতেক ৭ বোলন্তে শকত চলিল

ভৈলন্ত হরি সদইচ ॥

আন২ চিস্ত এরি১০ চিস্তিয়োক ১১ হরি

অন্তকে ১২ পাইবেক পরা ১৩ ।

এরি ১৪ আন কাম বোলা রাম বাস

সুখে ভব নদি তরা ১৫ ॥

এহি মতে রঙ্গে প্রভু জগনাথে

চলিলা যাত্রা করি ।

শ্রীধর কন্দলি কহে কৃষ্ণ কেলি

ডাকি বোলা হরি হরি ॥

* * * *

এই মতে চলি যাই জগত ঈশ্বর

বেলি ১৬ অবসানে পাইলা যুগুছাব ঘর ॥

যত্নপি যুগুছাব ছই দন্দ পঠ ১৭ ।

তথাপি দিনান্তে জাত গৈলা জগনাথ ॥

ইন্দ্রহুম রাজা পূর্বে মহাবদ্র করি ।

কৃষ্ণক দৌলত নিয়া খাপিলা ১৮ সাদরি ১৯ ॥

যুগুছা নামে জিব আনি সর্ব সুভাগিনি ।

কৃষ্ণক দিলন্ত বিহা বিধি মতে আনি ॥

সর্ব সুলক্ষিনি ২০ কহা গুণের ভাণ্ডারি ।

সাক্ষাতে ভৈলন্ত যেন লক্ষি অবতরি ॥

* * * *

যুগুছা সঙ্গে সঙ্গে প্রভু দেব হরি ।

খাপিলা অনঙ্গ কেলি কোতুল করি ॥

এহি মতে সঙ্গে চহে প্রভু দামোদর ।

সাত দিন বঞ্চিলন্ত যুগুছার ঘর ॥

গুনিয়োক সাবধান হইয়া সর্ব জন ।

মহা মহোৎসব কৃষ্ণ যাত্রা কীর্তন ॥

৭এতেক—এত । ৮সদই—সদয় । ৯আন—অন্ত । ১০এরি—ভাগ করি । ১১চিস্তিয়োক—চিস্তাকর ।
১২অন্তকে—অন্তে । ১৩পরা—পতি । ১৪এরি—ছাড়ি । ১৫তরা—পার হও । ১৬বেলি—বেলা ।
১৭পঠ—পাথ । ১৮খাপিলা—ছাপন করিল । ১৯সাদরি—সাদর করিয়া । ২০সুলক্ষিনি—সুলাক্ষণা ।

জগনাথ পুরাণের ইতো বধা সব ।

পদবন্ধে ২১ নিবন্ধিলো ২২ করিয়া বিচার ॥

কৃষ্ণ শে পরম বন্ধ জানিয়া সতত ।

কৃষ্ণের চরণ চিত্তিবা মনত ॥

কলিত হরিনাম বিনে নাহি আন ।

হেন জানি কৃষ্ণচরণে করা ধ্যান ॥

শ্রীধরকন্দলি কহে কৃষ্ণগুণ নাম ।

পাতেক দারোক দাকি বোলা রাম রাম ॥৪৭

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ ।

কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র-পুরাণ

(প্রতিবাদ)

১৩১৩ সনের ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পরিবর্দের সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কবি গঙ্গারাম ও তৎকৃত মহারাষ্ট্রপুরাণের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ও তৎসঙ্গে কবির সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থ টীকাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের দুই একটি কথা বলিবার আছে, নিয়ে তাহাই বিবৃত হইল।

লেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবু কবির গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া কবির জন্মস্থান সম্বন্ধে যে শেষ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা তাহার ভাষা হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

“অন্তঃপর এই গ্রন্থের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পুঁথি খানির অধিকাংশ স্থানেই রাঢ়ের উচ্চারণস্বলভ অনুমানিক ক্রিয়া পদের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া কবিকে রাঢ়ের লোক বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, আর সে অনুমান আমার নিজের পক্ষে এতটা দৃঢ় যে আমি তাহাকে রাঢ়ীয় লোক বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেছি না।”

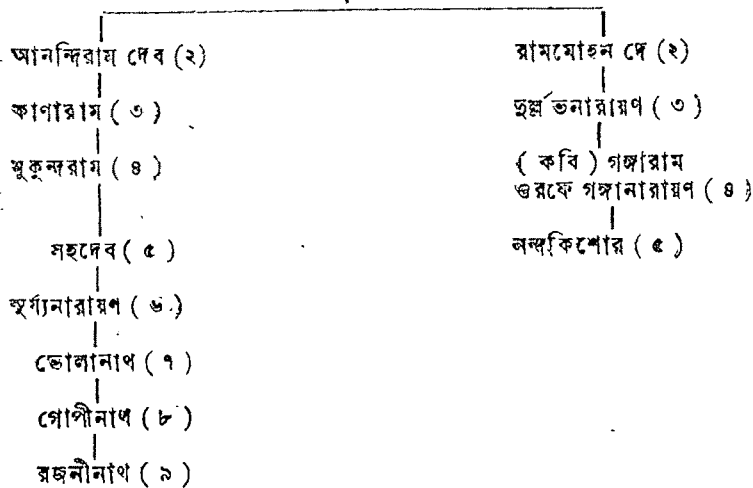
সুস্থবর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবু যে যুক্তিবলে কবি গঙ্গারামকে রাঢ়ীয় বলিতেছেন, এই যুক্তি দেখিতেছি আজকাল যে কোন অজ্ঞাত কবির উপর প্রযোজ্য হইয়া কবিকে লইয়া টানা হেঁচুরা করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কবি মুকুন্দের নাম এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। কিছুদিন পূর্বে কবি মুকুন্দের জগন্নাথমঙ্গল লইয়া পরিষৎ পত্রিকায়

এইরূপ বিচার হইতেছিল। বিশ্বকোষের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি মহাশয় তাঁহার বহু গবেষণামূলক বক্তির উপর দেখাইয়াছিলেন, কবি মুকন্দরামের বাসস্থান রাঢ়ভূমি আর আগাদের ময়মনসিংহের বন্ধার শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় দেখাইয়াছিলেন কবির নিবাস ময়মনসিংহে। সে সময় রসিকবাবুর বক্তৃতাগুলি আমাদের নিকট যেরূপ লাগিয়াছিল, অল্প সহৃদয় বোমকেশ বাবুর বক্তৃতাগুলি আমাদের নিকট সেইরূপ প্রতীয়মান। এইরূপ প্রতীয়মান হইবার কারণ, আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কবি মুকন্দ ময়মনসিংহের লোক নহেন এবং কবি গঙ্গারাম সম্বন্ধে আমি জানি তিনি ময়মনসিংহবাসী।

এই কবি গঙ্গারামের বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলা কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন ধরিশ্বর গ্রামে। আমার রচিত “ময়মনসিংহবিবরণ” নামক গ্রন্থের (১ম সংস্করণের ৭৩ পৃষ্ঠায়) প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের অধ্যায়ে কবি গঙ্গারাম বা গঙ্গানারায়ণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। আবশ্যক বোধে এখানে সংক্ষেপে পুনরাবলোচনা করিলাম।

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন ধরিশ্বর গ্রামে গঙ্গারাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গারামের প্রপিতামহ হরিদাস দেব প্রায় ২২৫ বৎসর পূর্বে আসিয়া ধরিশ্বরে বাসস্থান নির্দেশ করেন। কবি গঙ্গারামের বংশধরেরা বর্তমানে ধরিশ্বর গ্রামে তাঁহাদের পৈতৃকবাসভূমিতেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গঙ্গারামের যে বংশাবলি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্য হইতে দুই শাখা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হরিদাস দেব (১)



বঙ্গীয় “বারভূঞা” দিগের শ্রেষ্ঠ ভূঞা দেওয়ান ইশাখাঁর বংশধরেরা এখন ময়মনসিংহ

জেলায় অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীতে বস্তুমান আছেন। এক সময় তাঁহারাই এ জেলার অধিতীক্ষকমতাপন্ন জমিদার ছিলেন। কবি গঙ্গারাম সেই দেওয়ানদিগের নিকাশের সেরস্তাক্ষ কর্মচারী ছিলেন।

১৯০২ সনে আমি যখন ময়মনসিংহের কবিদিগের গ্রন্থাদি ও দলিলপত্র সংগ্রহ করিতেছিলাম, তখন কবি গঙ্গারামের বর্তমান বংশধর শ্রীমান রজনীনাথ আমাকে কবির দস্তখতি কৃতিপর দলিল প্রদর্শন করেন। এই দলিলগুলির একখানার তারিখ “সন ১১৬৩ তারিখ ২৩ আশ্বিন মোঃ ফুলদিয়া” অপর একখানার “সন ১১৬৭ তারিখ ৫ই পৌষ মোঃ মুন্সুদাবাদ” ও আর একখানির তারিখ “সন ১১৭৩ তারিখ ১৫ই চৈত্র মোঃ জঙ্গলবাড়ী।”

এই তিন খানা দলিলের আলোচনায় অবগত হওয়া যায় (১) কবি ১১৬৩ বঙ্গাব্দে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের “ফুলদিয়া” কাছারীতে চাকুরী করিতেন (২) নবাব সরকারে দেওয়ানদিগের পক্ষে নিকাশ প্রদান জন্ত ১১৬৭ অব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন এবং (৩) ১১৭৩ সনে প্রয়োজন অনুসারে দেওয়ান সাহেবদিগের জঙ্গলবাড়ীস্থিত সদর কাছারীতে উপস্থিত ছিলেন।

কবির বর্ণনা ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া ও অজ্ঞাত নানা কারণে আমি বিশ্বাস করি, কবি গঙ্গারাম বর্গীর হাজ্জামার সময় দেওয়ান সাহেবদিগের নিকাশ-কর্মচারী রূপে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন ও এই বিপদকে সম্পূর্ণ নিজ বিপদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা ইহার সম্পূর্ণ সমর্থক। তবে এমন হইতে পারে যে ১১৬৭ সনে দেওয়ান সাহেবদিগের পক্ষে নিকাশ প্রদান জন্ত মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে অবসর সময়ে কবি ভুক্তভোগীদিগের নিকট তাহাদের বিস্তৃত অবস্থা শ্রবণ করিয়া আলোচ্য “মহারাত্রীপূরণ” রচনা করিয়াছিলেন। এই অনুমান দুটির মধ্যে কোনটী প্রকৃত তাহা বলা হকঠিন। অনুমান ভিন্ন ইহার অন্য কোন প্রমাণ নাই। মুর্শিদাবাদে দস্তখতি কাগজপত্রে যে তারিখ আছে, তাহা বর্গীর হাজ্জামার ১৭ বৎসর পরের লিখিত। কবির বর্তমান বংশধর রজনীনাথ চৌধুরী (যাহার নিকট হইতে এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি) বলেন “আলোচ্য হস্তলিখিত গ্রন্থখানা গঙ্গারামের নিজ হস্তের লিখিত।” আমি ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ পাইতেছি না। গঙ্গারামের যে হস্তলিপি তখন আমাকে দেখান হইয়াছিল, তাহা কেবল দলিলের দস্তখত মাত্র; তাহা হইতে গ্রন্থের লেখার কোন সামঞ্জস্য করা যায় না। হয়ত বর্গীর ঘটনার সময় কবি মূলগ্রন্থ লিখিয়া থাকিবেন এবং পরে গ্রন্থকার সময় সময় ঐ গ্রন্থের যে মকল প্রচার করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থখানা তাহারই একখানা। কবির পক্ষে এইরূপে নিজ গ্রন্থেরই পুনঃ পুনঃ অহলিপি প্রস্তুত করার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কবি মুক্তারামের আলোচনায় (“অরতি” ১৩০৮, ২২৬ পৃঃ) আমি দেখাইয়াছি, কবি মুক্তারাম নিজকৃত বৃহৎ গ্রন্থ দুর্গাপূরণের বহুলিপি প্রস্তুত করিয়া গ্রামে গ্রামে গীত হইবার জন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ হস্তলিখিত এইরূপ একখানা গ্রন্থ আমার নিকটও

ছে; তাহা কলিকাতা সাহিত্য-প্রদর্শনীর সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমিতিতে প্রেরিত
 রাখিল।

অঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানসাহেবদিগের অধীন যাঁহারা ডিগ্রির নায়কী কার্য্য করিতেন,
 হারা চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। গঙ্গারামও তদনুসারে কার্য্য করিয়া শেষে ঢলদিয়া
 ছারির নায়কপদে প্রতিষ্ঠিত হন ও চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের বংশধরগণ সেই
 য় হইতে চৌধুরী উপাধিতে পরিচিত। অতঃপর দেওয়ানসাহেবদিগের বিরাগভাজন হইয়া
 নি চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, জমিদারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধবয়সে
 বি “শুক-সংবাদ” নামক পরমার্থতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। “লবকুশের চরিত্র”
 মক তাঁহার রচিত অন্য একখানা গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ তাঁহার কোন সময়ের
 না তাহা অবগত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক সুহৃদ্যর বোমকেশ বাবু কবির পরিচয়
 পাইয়া অনুমানের উপর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক
 হ। পরন্তু অধিক স্বাভাবিক। কারণ

(১) কবি গঙ্গারাম একজন সুশিক্ষিত লোক ছিলেন।

(২) শিক্ষিতদিগের সহবাসেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।

(৩) বিশেষ, তিনি রাজধানী সুর্শিদাবাদেই অনেক সময় বাস করিতেন।

এইরূপ হলে তাঁহার উচ্চারণ বিস্তৃত হইবে, ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। পরন্তু
 হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বিস্তৃত ভাষী হইলে রাত্বাসী হইতে হইবে একরূপ কল্পনা
 তীন কি না চিন্তার বিষয়। গঙ্গারামের গ্রন্থে বিস্তৃত উচ্চারণের দৃষ্টান্ত চোঁটা থাকিলেও
 বঙ্গের গ্রাম্যভাষার ব্যবহার পরিত্যাগের চেষ্টা আদৌ নাই। হুংথের বিষয় বোমকেশ বাবু
 দোষা এবং বুঝিয়াও, কি কারণে জানি না, তাহার উল্লেখ করিতে বিরত হইয়াছেন।
 রাত্বদেশীয় কবির কোন গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গের কোন লোক অথবা পূর্ব্ববঙ্গের কবির গ্রন্থ
 দেশীয় লোক নকল করিলে তাহাতে নকলকারকের উচ্চারণানুযায়ী বানান অন্তর্ক বা
 লিখিত হয় এবং তদ্বারা শব্দের বিকৃতি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আদত দেশজ শব্দের
 ই পরিবর্তন হয় না। এই গ্রন্থেও তাহাই হইয়াছে।

এই গ্রন্থে কবি রাঢ়ে অবস্থান করিয়া বিস্তৃত উচ্চারণে গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করিয়াও
 ভূমির পরিচিত শব্দগুলি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। যথা—বানাইল (প্রবেশ করিল),
 রা (মেঘ), বানাইল (প্রস্তুত করিল), আশুবাউক (অগ্রণয় হটক), কাউয়ার
 কের), কিরা খাইছি (শপথ করেছি), ডের হাতীর সাইর (বহু হাতীর শ্রেণী)
 কট (আর্কট নগরের টাকা) প্রভৃতি। উচ্চারণ বিষয়েও কবি যে কেবল অনুমানিক
 াপদের উচ্চারণ ব্যতীত আর কোন বিষয়ে রাঢ়ের অনুসরণ করিয়াছেন একরূপ গ্রন্থে
 যায় না। একরূপ অনুমানিক উচ্চারণ পূর্ব্ববঙ্গের অনেক কবির গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া
 । দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি প্রদান করিলাম।

নারিকেল খাইয়া রাজা সোভরে গোসাঞি ;

এমন অপূর্ব বস্তু আইল আমার ঠাঞি ॥

(পদ্মাপুরাণ—বিজয়ঙ্গীদ)

তারার উদ্দেশে আমি নোকা বাতাইনোঁ ।

রাক্ষসের দেশে ঘেরে লঙ্কাত উত্তরিলোঁ ॥ (পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দে)
প্রথমে কলির পূজা হৈল কোন ঠাঞি ।

সেই সব বিবরণ শুনিবার চাই ॥ (কলীপুরাণ—মুক্তরাম নাগ)

ভিটাদিয়া গ্রামে ক্ষত্রিয় কায়স্থের বসতি ।

মুই অধমের হইঞাছে জন্ম তণি ॥ (কৃষ্ণদাসের বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী)
তিনি মুর দীক্ষা গুরু হন উপাধায় ॥

এ শরীর আমি বিকাঞাছি তাঁর পার ॥ (ঐ—গ্রন্থ)

এতদ্ব্যতীত রামেশ্বর নন্দী ও অন্ধকবি ভবানী প্রসাদের গ্রন্থে ৬৮৬ বিদ্যুৎ ও ঐ উচ্চারণে অবধি নাই । বলা বাহুল্য ইঁহারা সকলেই ময়মনসিংহের কবি তাহা আমি আমার ময়মনসিংহ বিবরণের প্রথম সংস্করণে প্রকাশ করিয়াছিলাম ।

দুর্গাপুরাণের লেখক কবি জগন্নাথ দাস, গঙ্গারামের সহিত এক গৃহে বাস করিতে তাহা আমরা জগন্নাথের জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছি । (আরতি) । জগন্নাথও একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন । জগন্নাথ কবি মুক্তরামের একজন শিষ্য ছিলেন । কবি বিজয় দাসও গঙ্গারামের সমসাময়িক । এই চারি কবির বাসস্থল ৮১০ মাইলের ভিতর ।

এইবার ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে অগ্ৰাণু বিষয় সম্বন্ধে একটু একটু আলোচনা করি বর্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব ।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কবির লিখিত “দক্ষিণ স্রহর লইয়া” জুজুহর ব্যোমকেশ বাবু এ রসিকতা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার রসিকতার রস পাইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছি । কবির দক্ষিণ স্রহর পরিচয় করিতে যাইয়া কোন সময় যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎগণ চিহ্নিত হইবেন তাহা বোধ হয় কবি তখন মনেও স্থান দিতে পারেন নাই । বঙ্গীয় কবির সাধারণা তখন মূর্খদাবাদ ও দিল্লী স্ত্রীক্রিয় করিয়া আর একটা তৃতীয় স্রহরের আবিষ্কার করিয়াছিল, ইহা তখনকার কবির পক্ষে প্রাচীর বিষয় মনে করা উচিত । ঐতিহাসিক চক্ষে দেখিতে গেলেও দেখা যায়, তৎকালে মোগল এবং মহারাষ্ট্রই ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল অতরাং কবির পক্ষে ঐ দুই শক্তির দুইটী কেন্দ্রস্থলকেই কেবল মাত্র স্রহর বলিয়া অনুমান অসঙ্গত হইবে নাই । ভাস্করের দুর্গোৎসবের আলোচনায় ব্যোমকেশ বাবু যে সম্ভব লিপিত করিয়াছেন তাহা সমীচীন কি না বিচার্য্য বিষয় । ব্যোমকেশ বাবু লিখিয়াছেন “কবি গঙ্গারাম হিন্দু এবং সমসাময়িক কবি, তাহার সাফ্য এ বিষয় অধিক গ্রহণীয় । সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাস লেখকের পক্ষে এ তুল্য পুজার ব্যাপার অকিঞ্চির বোধে লিপিত

ওয়ার পক্ষে অগ্রাহ্য হওয়া কিছু অগ্রাহ্য নহে।" মহারাষ্ট্রীয় আচার ব্যবহারভিত্তিক পৌত্ত-
ক গ্রাম্য কবির যে কোন কল্পনা সমসাময়িকতার অজুহাতে গ্রহণ করা আমরা নিরাপদ
নে করি না। গ্রন্থের "শুকগন্তীর আরম্ভের ভাগের" তার ইহাও কবির আর একটি
রাণোচিত কল্পনা কি না কে বলিতে পারে?

ব্যোমকেশ বাবু প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন 'এই গুণিখানিতে দেইখা, দেইখা,
দেইখা, দেইখা এই চতুর্বিধরূপ উচ্চারণ আছে।' এই সম্বন্ধে আমার মত কবি
জ্ঞানীতে অবস্থিতি হেতু কোন কোন স্থলে সাবধানে অবিভক্ত উচ্চারণের অনুসরণ
করিয়া পুনরার অসাবধানতা প্রযুক্ত বাভাবিক পথে আসিরা জন্মভূমির প্রচলিত উচ্চারণে
দ্রষ্ট বিচ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন।

পরিশেষে আলোচ্য গ্রন্থের প্রাপ্তির সম্বন্ধে ২১৩টি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।
ময়মনসিংহের প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের জীবনী সংগ্রহ করিবার জন্ত আমি ১৩০৭ সালে
গ্রামে গ্রামে প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান করি। ঐ সময় কবি জগন্নাথের গ্রন্থাদি ও মানসি সঙ্গীত
সংগ্রহের জন্ত আমি কবির জনৈক আত্মীয়কে চিঠি লিখি। তিনি তদন্তরে আমাকে জানান
"কবি জগন্নাথের জীবনের অবসান কাল ধরীশ্বর গ্রামে ঘাপন করেন। সুতরাং তাঁহার
হস্তাক্ষর ও পুঁথিপত্র তথায় পাইবেন।" আমি এই চিঠি অনুসারে ধরীশ্বরে কবি
জগন্নাথের গ্রন্থ অনুসন্ধান করি ও শ্রীমান রজনীনাথ চৌধুরীর নিকট হইতে কবি জগন্নাথ
কৃত "নিগম" "হাড়মালা" নামক দুইখানা সাধন গ্রন্থ ও কবি গঙ্গারাম (গঙ্গানারায়ণ) কৃত
"শুকসংবাদ" "নবকুশলচরিত্র" "ভাস্কর পরাভব" বা মহারাষ্ট্র পুরাণ এই তিনখানা গ্রন্থ ও
অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। সেই সময় আমি ইহাও অবগত হই যে, গঙ্গারাম
সবাব সাহেবদিগের কার্য ত্যাগ করিয়া বখন পারমার্থিক চিন্তায় মন দিয়া শুকসংবাদ
লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন কবি জগন্নাথও আসিরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার
সাধনসঙ্গীত, নিগম, হাড়মালা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। জগন্নাথ কবির জন্মস্থান
দাসপাড়া, ধরীশ্বরের অতি সন্নিকটে। জগন্নাথ একজন সাধক ছিলেন। তাঁহার
সাধনসঙ্গীত দুর্গাপুরাণ এখনও গ্রামে গ্রামে শারদীয় পূজায় গীত হইয়া থাকে। মল্লিখিত
ময়মনসিংহের বিবরণের ১ম সংস্করণে আমি ময়মনসিংহবাসী কবিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী
আলোচনা করিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে পূর্ববঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের একখানা পৃথক
জীবনী-গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা হওয়ায় বিবরণের দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ প্রাচীন সাহিত্যের অপর্যাপ্ত
পরিভাগ করিয়াছি। গঙ্গারামের বিস্তৃত জীবনী "পূর্ববঙ্গের প্রাচীন কবি" গ্রন্থে
প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকেশবদাস মজুমদার।

মোসলমান নাম-তত্ত্ব

আমাদের শিক্ষিত মোসলমান ভ্রাতৃগণ বঙ্গ-সাহিত্য চর্চায় তেমন মনোযোগী নহেন মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত বাঙ্গালা গ্রন্থ-প্রণয়নে অথবা বঙ্গের মাসিক, পত্রাদিতে প্রবলিখিতে কাহাকেও দেখা যায় না। ইহা বাঙ্গালা-ভাষার পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের কথা। আরব্য ও পারস্ত-সাহিত্যে যে সকল রত্নরাজি বিরাজমান, ঐ সকল আহরণপূর্বক মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করা তাঁহাদের কর্তব্য ছিল, কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে প্রায়শঃ উদাসীন অলক্ষ-শিক্ষিত মোসলমানগণ কর্তৃক পারস্ত-ভাষার অনেক মনোহারী কাব্য বাঙ্গালা-ভাষায় অনূদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের ভাষা বাঙ্গালার উর্দু—‘হয়’ ‘করে’ প্রভৃতি দুই একটি অত্যাশ্চর্য্য বাঙ্গালা শব্দ ব্যতীত ঐ সকল মোসলমানী পুথিতে আরব্য ও পারস্ত-ভাষার শব্দই ভূরিশঃ প্রযুক্ত হইয়াছে—বাঙ্গালা-সাহিত্যের পাঠকগণ এমন কি সুশিক্ষিত মোসলমানগণ পর্য্যন্ত ঐ সকল পুথি কদাচিৎ পাঠ করিয়া থাকেন। ফলতঃ মোসলমানকর্তৃক বঙ্গসাহিত্যের সেবা অতি অল্পই হইয়াছে।

অতএব যাহা আরব্য পারস্তে সুশিক্ষিত ব্যক্তি (সুতরাং মোসলমান) কর্তৃক অনুশীলিত হওয়া উচিত ছিল তাহা, উক্ত ভাষায় নিত্য অনভিজ্ঞ মাদৃশ ব্যক্তিকর্তৃক আলোচিত হইতেছে, ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ পাকিবারই কথা।

মোসলমানের নাম বাঙ্গালায় লিখিতে অনেকেই ভুল করিয়া থাকেন। এই ভুলের প্রধান কারণ এই যে লেখকেরা পারস্ত বিবেচনায় আরব্য ভাষায় প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ; আবার যাহারা এই ভাষায় অভিজ্ঞ তাঁহারা অর্থাৎ মোসলমানগণ প্রায়শঃ বাঙ্গালা-ভাষায় বিশুদ্ধ বর্ণবিজ্ঞান করিতে তেমন মনোযোগী নহেন।

বলা বাহুল্য মোসলমানের নাম অধিকাংশই আরব্য শব্দ, কদাচিৎ দুই চারিটা পারস্ত শব্দও দেখা যায়। বর্ণমালার পে (প) চে (চ) গফ্ (গ) পারস্ত; সুতরাং এই অক্ষরগুলি সংবলিত করে কটা নাম (যথা, পির, চেরাগ, গোলা) পারস্ত। মোসলমানগণ নাম রাখিতে আরব দেশের ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষদিগের নামের ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং মোহাম্মদ, আলি হাসান ইত্যাদি নামই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এখন ‘চ’ যখন আরব্য বর্ণ নহে, তখন ‘হাসান হোসেন’ প্রভৃতি নামে ‘চ’ ব্যবহার সুতরাং নিষিদ্ধ; আমরা মধ্যে মধ্যে যে “হাচন” মর্য্য কিংবা “হুতন আলি” দেখি, তাহা ভ্রমমূলক। ‘চ’ বরং পারস্তে আছে; কিন্তু ‘হু’ আরব্য-পারস্ত উভয়েই নাই। উর্দুতে “হু” লিখিতে ইংরেজীতে যেমন মহাপ্রাণ বর্ণ লিখিতে অল্পপ্রাণ বর্ণে ‘হ’ (h) যোগ দিয়া কার্য্য সাধন হয়, তদ্রূপ ‘চ’ তেও ‘হ’ যোগ দিতে হয়। ‘সৈয়দ’* এইশব্দে অনেক স্থলে যে “ছৈয়দ” লিখা হয়, তাহা অত্যন্ত ভ্রান্তিযুক্ত। ফলতঃ

* পরিশুদ্ধভাবে লিখিতে গেলে “নামুয়দ” বা “সাইয়দ” হওয়া উচিত; যাহা হউক সুপ্রচলিত সৈয়দই গ্রহণীয়।

মোসলমানের নামে ‘হ’ কদাপি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে যে স্থলবিশেষে—বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ ও আসামে—ছ (এবং চও) ইংরেজী এন্ (S) প্রায়, উহা আরব্য-পারস্য শিন্ (س) নোয়াদ (س) এর স্থায় উচ্চারিত হয়, তখন ‘দ’ বা ‘হাচন’ লিখিতে হানি কি? ইহার উত্তরে এই বক্তব্য যে বাঙ্গার সর্বত্র ত আর ‘ছ’ S এর স্থায় উচ্চারিত হয় না। বিশেষতঃ ‘স’ এর প্রকৃত উচ্চারণ ‘S’ এর মত; বাঙ্গালা-ভাষায় তিন ‘শ’ এর উচ্চারণ একইরূপ হইলেও র বোণে এবং তত্ত্বগম্য বর্ণ যোগে ‘স-স’ এর প্রকৃত উচ্চারণ বাহির হইয়া পড়ে। আবার মোসলমানের নাম বঙ্গদেশে একরূপ লিখিত হইবে, কাশী, মহারাজ্জ অঞ্চলে অপরূপ লিখিত হইবে, তাহাও ত ভাল দেখায় না। আর্য বর্ণমালার মূল সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিয়া ভাষান্তরের শব্দ বানান করিলে সর্বত্রই একরূপ বানান হইবে; ‘সৈয়দ’ শব্দের বানান বাঙ্গালার যেকোন ‘স’ দ্বারা হইবে ভারতবর্ষে অতীত অঞ্চলেও সেইরূপ ‘স’ দ্বারাই হইবে। যাহারা বাঙ্গালা শব্দগুলির উচ্চারণ (তাহাও আবার পশ্চিম বঙ্গের) অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার বর্ণমালার উপর হস্তক্ষেপ করিতে যান, তাঁহারা যেন এই কথাটা ভাবিয়া দেখেন যে বাঙ্গালার বর্ণমালার আকৃতি পৃথক হইলেও ইহা বাঙ্গালীর নেজস্ব নহে; ইহা ভারতবর্ষীয় জনসমূহের সাধারণ সম্পত্তি “সংস্কৃত” হইতে লক্ষ্য। বর্ণমালা সর্বত্র এক থাকায় নানা সুবিধা আছে; ভারতীয় ভাষান্তর শিক্ষা করিতে বানানের জন্ত তেমন শ্রম করিতে হয় না। যাহা হউক, ইহা অবাস্তব বিষয়।

আরব্য বর্ণমালায় ‘স’ কার চারিটা আছে; ‘সে’ (ইহার উচ্চারণ ‘তে’র মতও হয়) শিন্ শিন্ নোয়াদ্; প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থকে ‘স’ দ্বারাই তরজামা করিতে হইবে—যেহা ইহাদের উচ্চারণগত পার্থক্য অবশ্যই আছে, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালা দ্বারা এই পার্থক্য বজায় রাখা যাইতে পারে না। তবে শিন্ এর উচ্চারণ অনেকটা ‘শ’ (বা ষ) প্রায়; “শেখ” “রশিদ” বখ্ শ্” প্রভৃতি শব্দ শিন্ দ্বারা লিখিত হয়, সুতরাং এই সকল বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে ‘শ’ এর ব্যবহারই করা উচিত। শেখ ও বখ্ শ্ শব্দে অনেকে ভুল করিয়া থাকেন; তাঁহারা ‘সেক’ ও ‘বক্‌স’ লিখেন। এই সকল শব্দে যে কেবল ‘শ’ হইবে তাহা নহে, ‘ক’ও ‘খ’ হইবে।

আরব্য বর্ণমালায় পাঁচটি ‘জ’ আছে; জিম্, জাল, জে, জোয়াদ ইহার উচ্চারণ (নোয়াদ্ হয়) এবং জোয়ে। কেবল প্রথমটাই উচ্চারণ বর্ণগম্য ‘জ’ এর স্থায়; গুলির উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী জেড্ (Z) এর স্থায়। আমাদের একটা মাত্র সম্বল; ইহা দ্বারা আমরা ‘জেসম্’ ও ‘এলিজাবেথ’ এই ইংরেজী জে ও জেড্ যুক্ত শব্দদ্বয় যখন লিখিয়া থাকি, ইহাওই দ্বারা সুতরাং আমাদের পক্ষেই আরব্য জ-সংবলিত শব্দ লিখিতে হইবে। কিন্তু ‘জিম্’ অক্ষরটি যে সকল শব্দের আদিতে আছে, সেই গুলির একটু পর ‘যী’ মধ্যে রাখিতে হইবে; কি জজ্, তাহা লিখিত হইতেছে।

আরব্য বর্ণমালার দুইটি বিভাগ আছে; শামসি (মৌর) ও কামুরি (চান্দ); উপরি

উল্লিখিত চারিটা স এবং জিম্ ছাড়া অপর চারিটা ‘জ’, দুইটা [তে ও তো] দ [দাল,] র [রে] ল [লাস] ও ন [ন্ন]

এই চতুর্দশটি অক্ষর সৌর ; অপরগুলি চান্দ্র । এই সৌর অক্ষরগুলির ঈদৃশ নামক কি জন্ম হইল তাহা জানি না ; তবে স্বর্যাসন্নিধানে স্থিত জ্বলাদি যেমন বাষ্পীভূত হইয়া রূপান্তরিত হয়, তদ্রূপ এইসকল অক্ষরের অবাবহিত পূর্বের আরব্য সম্বন্ধবাচক উপসর্গ ‘আল্’ * থাকিলে উহার ‘ল’ এর উচ্চারণ পরবর্তী বর্ণের সদৃশ হইয়া যায়। যথা— ‘শামস্-উজ্-জোহা’ ‘আব্-আব্ রহমান্’ ‘আব্-উন্-মুর’ ইত্যাদি। জববরের ‘জ’টি চান্দ্র ‘জিম্’ সূত্রায় আব্দুল জববর হইবে আব্দুল জববর নহে। কেহ কেহ যে হারুণ-আল্-রাশিদ বা আব্দুল রহিম লিখেন, তাহা ভ্রমমূলক।

প্রায় প্রত্যেক নামের সঙ্গেই মহাপুরুষ মোহাম্মদের নাম সংযোজিত হয় ; কিন্তু এই নামটি অনেকস্থলেই অশুদ্ধ লিখা হয় ; ‘মাহাম্মদ’ ‘মহম্মদ’ ‘মহম্মদ’ ‘মাহাম্মদ’ ইত্যাদি বহু-প্রকারে ইহার বিকৃতি সাধিত হইয়া থাকে। আবার উহা সংক্ষেপ করিতে গিয়া কেহ ‘মহ’ কেহ ‘মাহ’ এইরূপ লিখেন। পরিপূর্ণ বানান “মোহাম্মদ” † হইবে।

এইরূপ স্থলে ম এর উপর উকার উচ্চারণসূচক পেশ থাকে ; কোন কোন নামে উহা উকাররূপে কোনও স্থলে বা ওকাররূপেও উচ্চারিত হয়। ইংরেজীতে ‘U’ দ্বারা সর্বত্রই এই পেশ অনূদিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালার অধিকাংশস্থলেই ‘ওকার’ দ্বারা ইহার অনুবাদ হয় যথা ‘মোকদ্দমা’ ‘মোহকুমা’ ইত্যাদি।

‘মোহাম্মদ’ “মোকদ্দম” প্রভৃতিতে তৃতীয় অক্ষরটিতে তশ্দিদ্ব থাকায় উহার দ্বি-উচ্চারণ হয়, তজ্জন্ম ‘ম্ম’ ‘দ্দ’ প্রভৃতি গুদ্বই লিখা হয়। “মোজাঃফর” “মোফাঃফর” প্রভৃতিতে ‘ফ’ ও ‘স’ এর দ্বিত্ব হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সচরাচর ‘বিসর্গাদি ফ’ ও ‘স’ লিখা হয়। আমার বোধ হয় এইরূপস্থলে ‘ঃফ’ ‘ঃস’ এইরূপ লিখিতে দেওয়াই উচিত। ‘ফ’ এর দ্বিত্ব বঙ্গভাষায় প্রচলিত দেখা যায় না, এই নিমিত্ত “বিসর্গাদি” করিয়া উচ্চারণ রাখা মন্দ নয়। “মোজাঃফর” না লিখিয়া প্রচলিতানুরূপ “মোজাঃফর” লিখিলেই চিহ্ন অর্থাৎ যে সকল বর্ণের দ্বিত্ব বঙ্গভাষায় সচরাচর অপ্রচলিত, সেইসকল বর্ণের উপর তশ্দিদ্ব থাকিলে “ঃ” পূর্বের প্রয়োগ করিয়া উচ্চারণ বজায় রাখিতে হইবে। ‡

আমরা যে ভাবে ‘ম্ম’ উচ্চারণ করি (অর্থাৎ “মহ”) তাহাতে “মাহ্ মদ” লিখিতে “আব্” ঠিক নয়। এইরূপস্থলে হ ও ম পৃথক রাখিয়া দেওয়াই ভাল, ‘হ’ এ হসন্ত চিহ্ন প্রয়োগ করিবে।

* ইহার উচ্চারণ স্থলবিশেষে ‘আল্’ ‘ইল্’ ও ‘উল্’ এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে।

† অনেকে “মোহম্মদও” লিখেন ; আবার কেহ কেহ “মুহাম্মদ”ই গরিপূর্ণ বানান বলিয়া মার্ক করেন।

‡ যেখানে “আল্” এর ‘ল’ পররূপ প্রাপ্ত হয়, সেইখানেও এই বিধি খাটিবে যথা—“আব্দুল্ সোবহ্” ইত্যাদি।

ঠিক হইবে। “মাহমুদ” প্রভৃতিও এই নিয়মে লিখাই উচিত। ঠিক এই কারণে “আশ-রফ” লিখা উচিত, কেননা “শ্র” লিখিলে উচ্চারণ ঠিক হইবে না। “সোবহান্” “মজহর” প্রভৃতি স্থলে “সোভান” “মজর” ইত্যাদি লিখিলে যদিও বিশেষ কোন হানি নাই, তথাপি আরব্য বর্ণমালায় যখন ভাষা প্রভৃতি “বয্” নাট, তখন এই অক্ষরগুলি বাঙ্গালার অল্পবাদেও পরিত্যাগ করাই সঙ্গত।

অনেক সময় সংস্কৃতশব্দের অনুকরণে আরব্য শব্দ অন্তর্ভুক্ত করিয়া লিখা হয়। কেহ কেহ মোসলমান লিখিতে গিয়া “মুসলমান” লিখেন * ; ঈদৃশ ব্যক্তিরাই ম্যাক্স মুলার (Max Muller) কে “মোক্ষমুলার” করিয়া ভট্টাচার্য্যের পদবী প্রদান করিয়াছেন। আবার বোধ হয় ইংরেজী বক্স box শব্দের নমুনার “রহিম বক্স” “করিম বক্স” প্রভৃতি নাম লিখা হয়। বক্স না হইয়া “বখ্শ্” হইবে। এইরূপে মধো মধো মধুওর আলির পরিবর্তে মনোহরআলি, খিরদবখ্শ্ ত এর পরিবর্তে ক্ষীরোদ ভক্ প্রভৃতি পাওয়া যায়।†

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ‘প’ অক্ষরটি আরব্যতে নাই, যদিও পারস্তে আছে ; এবং কদাচিৎ ছই একটি পারস্ত শব্দ (যথা পির পয়গম্বর) মোসলমানের নামে ব্যবহৃত হয়। এই অবস্থায় ‘প’ ব্যবহার করিতে সাবধান হওয়া উচিত। “সিপাৎ” বা “ইর্পাৎ” না লিখিয়া “শিফাৎ” “ইরফান্” লিখা উচিত।

মোসলমানের নামের পাছে প্রায়শঃ “উল্লাহ্” ‡ শব্দটি দেখা যায় ; ইহা সচরাচর “উল্লা” এইরূপ লিখা হয়। আমরা ‘শাহ্’ লিখিতে কখনই ‘হ’ পরিত্যাগ করি না ; এতদবস্থায় “উল্লাহ্” লিখিতেও ‘হ’ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয় ; ইহা অনেকটা সংস্কৃত বিনর্গের মত।

সচরাচর যে সকল নাম লিখিতে গোলযোগ দেখা যায়, এইরূপ কতকগুলি নামের তালিকা দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল

* “মুঘল” শব্দটির দৃষ্ট্য স ঘারাও বানান হইতে পারে ; যাহা ইউক মুঘল শব্দের পর “মতুপ্” ‘বতুপ্’ হইয়া যাইবে, ইহাও ভাষা উচিত ছিল।

† মোসলমান ও হিন্দু পরস্পর একপভাবে মিশ্রিত হইয়াছেন যে অনেক সময়ে কৌলিক উপাধি একই রূপ দেখা যায়। যথা চৌধুরী, মজুমদার, খাঁ, বিশ্বাস প্রভৃতি। “ফকির বিশ্বাস” বলিলে হিন্দু কি মোসলমান ঠিক করা কঠিন ; কেননা ফকির শব্দটি আরব্য হইলেও হিন্দু নামে ব্যবহৃত হইতেছে। মোসলমানদের মধো ডাক নাম অনেক সময় হিন্দুর অনুরূপ হইয়া থাকে যথা “লালমিয়া” “চাঁদমিয়া” “সোনামিয়া” ইত্যাদি। তবে মোসলমানের আসল নামে কখনও হিন্দুর শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই বিষয়ে হিন্দুরা সর্বদাই উদার। তাই ফকিরচাঁদ, ছনিয়া লাল, গোলাবচ্ছ প্রভৃতির নাম হিন্দুর মধ্যে দেখা যায়। বর্তমানে আবার ইংরেজী নামও শুনা যাইতেছে যথা, লাডুলি মোহন (বোধ হয় Lordly এর অনুকরণে এবং রিপনচ্ছ রোমোলা ইত্যাদি।

* অর্থ “ঈশ্বরের” “মুহ্ উল্লাহ্” ঈশ্বরের জ্যোতিঃ [মুহ্ স্থানে অনেকে “নুহ্” দাঁড়কার দিয়া লিখেন। পরষত্তী তালিকা-দ্রষ্টব্য।]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অলিমহম্মদ	ওলিমোহাম্মদ	উজির মিয়া	ওজির মিয়া
অহিদবক্স	অহিদবখ্শ	করিমউদ্দিন	করিমউদ্দিন *
আহান	আহ্‌সান	জোয়াছ্‌লা	জাদউল্লাহ্
আজ্জগর	আস্‌গর	নৈমুদ্দিন	নায়িমউদ্দিন
আজরহমান	এজ্‌হারহোসেন	ফৈজুল্লা	ফয়েজউল্লাহ্
আবুল্‌ছতর	আব্‌ঃসত্তার	মবশ্বির	মোবাঃশির
আস্ত্রবালি	আস্‌রফ্‌ আলি	মস্তাপা	মোস্তাফা
আহম্মদবক্ত	আহ্‌মদ বখ্‌ৎ	মাংগঝার	মাংমজ্‌হর
ইনাৎ	ইনায়েৎ	মুদিন	মোহসিন
ইয়ুব	ইউসুফ্	লতিবর রহেমান	লুৎফ্‌ রহমান
ইসন্	এহ্‌সান	সেক্‌ সরিপ্	শেখ শরিফ্
ইসাক্‌ খা	ইস্‌হাক্‌ খা	সেকায়ৎ	সাখাওৎ
উছমান্	ওস্‌মান্		

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা :

* কেহ কেহ এস্থলে “করীমউদ্দীন” এইরূপ দীর্ঘদ্বিকার প্রয়োগ করেন। ফলতঃ ই বর্ণের ও উ বর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করিয়া মোসলমান্ নাম লিখা বড় ভ্রমকর ব্যাপার। তাই সর্বত্র হ্রস্ব ব্যবহৃত হইল। ইহাতে বিশেষ কিছু আইসে যায় বলিয়া বোধ হয় না।

+ “করিমউদ্দিন” “জাদউল্লাহ্” “নায়িমউদ্দিন” “ফয়েজউল্লাহ্” প্রভৃতি স্থলে “করিমুদ্দিন” “জাদুল্লাহ্” “নায়িমুদ্দিন” “ফয়েজুল্লাহ্” এইরূপও লিখা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যবহারতঃ প্রায়শঃ এইগুলি যিহুত ই দেখা যায়।